ভূত কি আজও আছে !

সুভাষ সমাজদার

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

BHUT KI AJO ACHAE !

By

Subhas Samajder

প্রথম প্রকাশ : পৌষ, ১৩৭১

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর : দিপালী নাহারায় : বাবা তারকনাথ প্রেস

১৪, নরেশ সেন স্কোয়ার : কলিকাতা-৯

কৈফিয়ৎ

মানুষের সভ্যতার একেবারে গোড়া থেকে 'ভূত' নিয়ে যেমন দুর্নিবার কৌতূহল তেমনি আছে তাচ্ছিল্য—ওঃ ভূতপ্রেতের কথা মানেই তো কতগুলো নির্জলা মিথ্যা আর আজগুবী কথা। তাই মনে হয়, ভূতসংক্রান্ত বই লেখার জন্য কৈফিয়ৎটা খুবই জরুরী।

রাত বোধহয় তিনটে সাড়ে তিনটে হবে। কেরাসিনের জন্য লাইন দিয়ে বসে আছি। দেখলাম দারুণ শীতের রাতের ঠাণ্ডা, কনকনে বাতাস সব তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে এক বৃদ্ধ আমার অনেক আগে এসে বসে রয়েছে। বয়স আশীর বেশিই হবে। কিন্তু বেশ শক্তপোক্ত চেহারা।

কথায় কথায় জানা গেল ভদ্রলোক পঞ্চানন্দের পুজারী। দেবদ্বিজে যেমন ভক্তি তেমনি ভূতপ্রেতে তার গভীর বিশ্বাস।

—আপনি নিজে কখনো ভূত দেখেছেন ?

কোন কথা বললেন না বৃদ্ধ। তার কোঁচকানো চোখদুটোর দৃষ্টি গভীর হয়ে উঠল। নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে যেন অনেক—অনেক দূর থেকে ঝাপসা গলায় বললেন, প্রত্যেক অমাবস্যাতেই তো তাঁদের দেখতে পাই। আমি আমার ঠাকুরের পুজো করি—তাঁরা আশেপাশে ঘোরাফেরা করেন—

রাস্তার জোরালো আলোয় দেখলাম গভীর বিশ্বাসের আলোয় তাঁর চোখদুটো জ্বল জ্বল করছে। তারপরেও পরলোক আর আত্মা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বললেন। সব শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে বললেন, আসলে ব্যাপার কি জানেন, ইহলোক আর পরলোকের ভেতরে কোন পার্থক্যই নেই—দুই লোকেই জীবনের ধারা সমানে বয়ে চলেছে···

ব্রহ্মমুহূর্তের সেই প্রগাঢ় স্তব্ধতায় তাঁর স্থির বিশ্বাসের কথাগুলো আমার মনে আলোড়ন তুলল। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি আর প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে মানুষ যখন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন দেখছে তখনও কিন্তু এই বৃদ্ধের মত ভূত প্রেতে বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা নেহাত কম নয়। আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি উত্তরবাংলার শিলিগুড়ি, মালদহ, বালুরঘাট ইত্যাদি বড় বড় জেলাশহর থেকে দূরে দূরে এক একটা গণ্ডগ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনই নিয়ন্ত্রিত হয় ভূত-প্রেত আর ডাইনীদের প্রভাবে। সেখানে সন্ধে হতে হতে গভীর রাতের অন্ধকার নেমে আসে। আর ধুধু মাঠে দপ করে জ্বলে ওঠে আলেয়ার আলো। এই আলো তাদের হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে নাকি গলাটিপে মারে। নিশিভূত ঘুমন্ত মানুষের নাম ধরে ডাকে। বাঁশঝাড়ের সাঁ সাঁ বাতাসে নাকি ঝারুভূতের ক্রুদ্ধ চিৎকার শোনা যায়। বেলগাছে থাকে ব্রহ্মদৈত্য। রাতের অন্ধকারে গায়ে সাদা ধবধবে কাপড় জড়িয়ে আর খড়ম পায়ে দিয়ে খট—খট—শব্দ তুলে হাটে—হাজারো রকমের সংস্কার

আর অন্ধবিশ্বাস নিয়ে তারা বেঁচে আছে। কিন্তু এইসব বিশ্বাস আর কুসংস্কারের উৎস কি—অরিজিন কি? আর শুধু দূর অজপাড়াগাঁর নিরক্ষর গরীব মানুষ কেন, আমাদের বেদে, তন্ত্রশাস্ত্রে অন্নদামঙ্গলে এবং পুরাণেও তো নানারকমের প্রেতের কথা বলেছে। তাহলে কি প্রেতের অস্তিত্ব সত্যিই আছে—সত্যি বলতে কি সেইদিনই শেষরাতের ঝাপসা অন্ধকারে সেই বৃদ্ধের কথাগুলো শুনতে শুনতেই বইটির পরিকল্পনা মনে এসেছিল।

আত্মা বা soul বস্তুটি কি? পৃথিবীর দেশে দেশেবিভিন্ন জাতির মানুষের আত্মা সম্বন্ধে ধ্যানধারণার শুধু নীরস আলোচনাই নয়, আছে আত্মতত্ত্ববিশেষজ্ঞদের প্রত্যক্ষ এক একটি চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার কথা—কেমন করে একটি মানুষের দুটো চেহারা double Version দেখা যায়। তুষারঝরা শীতার্ত রাত্রে যে তরুণী ভাবছে বাড়ি ফিরে গিয়েই উনানে হাত পা সেঁকে নেবে, সঙ্গে সঙ্গে তারই চিন্তার প্রতিচ্ছবি তার বাড়ির রান্নাঘরে ভেসে ওঠে কেন? লণ্ডনে হাউস অফ কমনস বিল্ডিং-এর কেয়ারটেকারের স্ত্রী সেদিন বাজারে যায়ই নি, যায় নি লণ্ড্রীতে কিন্তু লোকে তাকে এসে বলে—ম্যাডাম আপনাকে একটু বাজারে দেখলাম যে; কিম্বা কেউ এসে বলবে—আপনাকে লণ্ড্রীতে মনে হল দেখলাম—এই অলৌকিক ঘটনার কি কোন ব্যাখ্যা আছে? বলা দরকার, সাধারণত যেসব অন্ধবিশ্বাস আর সংস্কার আজও সাধারণ মানুষের সমাজে যথেষ্ঠ প্রচলিত—যেমন ভূতে ধরা ব্যাপারটা কি; আর ভূতে ধরলেই যে ওঝা আসে—সেই ওঝা কোন শ্রেণীর মানুষ, সত্যিই তাদের কোন মন্ত্রশক্তি আছে কিনা আর তাদের ঝাড়ফুক এবং তুকতাকের রহস্যটাই বা কি এবং ইউরোপের জার্মানীতে ইটালীতেও ওঝাদের বা উইচ ডক্টরদের অ্যাক্টিভিটি কি—এসব সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব তথ্যভিত্তিক আলোচনা আছে।

লণ্ডনের এক ডাকসাইটে সুন্দরী স্টুডিওতে ছবি তুলতে গেল। ক্যামেরাম্যান তাকে বেশ একেবারে 'পোজ' করিয়েই বসিয়ে দিল। হাসি হাসি মুখ করতে বলল। তারপরে একবার রেডী বলতেই দপ করে জ্বলে উঠল ফ্ল্যাশ। কোন ত্রুটিই ছিল না—

কিন্তু আশ্চর্য—ছবি হল না। যতবারই তার ছবি নেওয়া হচ্ছে তত বারই মেয়েটির সুডৌল মুখের পাশে আর একটা ঝাপসা মুখের আদল ফুটে উঠছে। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় মেয়েটি। শির শির করে ওঠে তার বুকের ভেতরটা—পরলোকের অশরীরি আত্মার ছবি উঠল কি করে? এই স্পিরিটফটোগ্রাফি, বিগত শতকের শেষপাদে ইউরোপে দারুণ চাঞ্চল্য জাগিয়েছিল আত্মার কি প্রতিকৃতি কখনো তোলা যায়? এবং আর তার আড়ালে রহস্যটাই বা কি। এই আলোচনা এবং তার সঙ্গে এক একটি সত্য ঘটনারও ইতিবৃত্ত আছে।

প্রায়ই দেখা যায় একজন যেটা চিন্তা করল, আর একজন কেমন করে যেন ঠিক সেই কথাটা বলে উঠল। তার চিন্তাটা কি করে আর একজনের মনে এল

—এই চিন্তাচালন বা টেলিপ্যাথি জিনিসটা কি আর ক্লেয়ারভয়্যান্স বা দিব্যদৃষ্টিই বা কি। শত শত মাইল দূরে বসে একজন স্পষ্ট দেখল, তার স্ত্রী পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে যাচ্ছে। সে হাত তুলে বাঁচাও বাঁচাও বলে আর্তনাদ করছে। ঝাঁ ঝাঁ দুপুর কাকপক্ষী কোথাও নেই। সে ডুবে গেল।

এইরকম দৃশ্য তার মনের চোখে দেখে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বাড়িতে এসে দেখল—সে যা দেখছে হুবহু তাই ঘটেছে। কি করে হয়, অনাগত ভবিষ্যতের ছবিটা যে আগাম দেখা যায় তার কি কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে—এই প্রসঙ্গে দেশী-বিদেশী পরলোকবিদ অধ্যাত্মবাদীদের আলোচনাও স্বল্পপরিসরে যতখানি সম্ভব করা হয়েছে।

সবশেষে, বুদ্ধিজীবি ও সংস্কারমুক্ত আধুনিকমনা পাঠকদের অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলি—স্মরণরাখা দরকার, লক্ষ লক্ষ বছর আগে আদিপ্রস্তরযুগের মানুষ মৃতের সমাধিতে রাশি রাশি মূল্যবান সামগ্রীর অর্ঘ রেখে দিত যাতে তার (মৃতের) প্রেতাত্মা তাদের ওপরে কুপিত না হয়। আজও পৃথিবীর দেশে দেশে বিভিন্ন জাতির মানুষের ভেতরে পারলৌকিক—ক্রিয়াবিধির বিবিধ অনুষ্ঠানের ভেতরে পরলোকের প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ স্তব স্তুতির ঐতিহ্য প্রবহমান। তাই প্রেততত্ত্বটি একেবারে ভিত্তিহীন বলা যায় না। বিদেশী এক বিখ্যাত স্পিরিচুয়্যালিস্ট বলেছেন—It would mistake to speak disrespectfully of ghost stories utilities. জানিয়েছেন কিছু ইউটিলিটি বা কার্যকারীতাও আছে—ভৌতিক কাহিনী বা প্রেতাত্মার নানা কার্যক্রম স্মরণ করিয়ে দেয়, মৃত্যু দুঃখের নয়, কষ্টের নয়, পরলোকে ভয়ের কিছু নেই। আমাদের স্বপ্নে, আমাদের অবচেতন মনের ভেতরে মৃত প্রিয়জনের প্রতিচ্ছবি তার স্পিরিটের ছায়াদেহ দেখা দিতে পারে, দিয়ে থাকে। তারা কথাও বলতে পারে। হারিয়ে যাওয়া আত্মীয়-পরিজন-বন্ধুকে আমরা আবার ফিরে পেয়ে থাকি। অতএব মৃত্যুর রূঢ় আঘাতে দুঃখ শোকে শান্তির প্রলেপ দিতে পারে ভৌতিক কাহিনী।

বলা দরকার, আলোচ্যগ্রন্থটির বিন্যাসে অর্থাৎ কোন অধ্যায়ে থাকবে ওঝা, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, কোথায় যাবে হাজারো রকমের ভূতের প্রকৃত রহস্য—ইত্যাদি বিষয়ের প্রথম রূপকার আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবর দিলীপ মিত্র। আর সাহিত্য প্রকাশের তরুণ সত্ত্বাধিকারী অনুজপ্রতিম প্রবীর মিত্রের অকৃপণ সহযোগীতা এবং বিশেষ করে এই নিদারুণ দুর্মূল্যের বাজারে এই বিপুলায়তণ গ্রন্থটি প্রকাশের দুঃসাহস ছাড়া কোনদিনই এই বই দিনের আলোয় আসত না। এই সূত্রেই বলা প্রয়োজন পরলোকতত্ত্বে অনিসন্ধিৎসু আমার তরুণ সহকর্মী পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী জোসেফ টিরকি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। আরও যাঁরা সহযোগীতা করেছেন তাঁদের কাছে ঋণ স্বীকার করে তাদের ছোট করব না।

প্রথম প্রেতমণ্ডল

Spirit in the psychic world govern the universe Saint Martin.

আত্মাই মনের পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত করে।

ভূত কি ?

ভূত বলে কোথাও কিছু আছে কিনা ? ভূত কি একেবারেই আজগুবী আর মিথ্যা এবং শুধু অলীক কুসংস্কার মাত্র।—এসব তুমি জানতে চেয়েছ। শুধু তাই নয়—সেই প্রসঙ্গেই তুমি আরও অনেক প্রশ্ন করেছ ; যেমন মৃত্যুতেই কি জীবের তথা মানুষের আত্যন্তিক বিনাশ হয়, আত্মাও কি দেহের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

যদি বলেন আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তাহলে কোন রহস্যময় অজানা লোকে সেই অদৃশ্য বায়বীয় বস্তুটি অবস্থান করে। দেখুন, আমি বয়সে নবীন। স্বভাবতই আমার কৌতূহল বেশি। তার ওপর আবার ধর্মতত্ত্ব আর দর্শন নিয়ে পড়াশুনো করি। বিভিন্ন পুরাণ আর উপনিষদ পড়তে পড়তে দেখেছি স্বর্গ, নরক, দেবদেবীর আত্মার বিভিন্ন যোনিতে পুনর্জন্মের এবং রহস্যময় সেই অজানা পরলোকে সূক্ষ্মদেহী আত্মার নানা বিচিত্র কর্মকাণ্ডের রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্তের ছড়াছড়ি সেখানে।

আবারও বলছি, আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন—আপনি নিশ্চয়ই পড়েছেন ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম খণ্ডের (৭—১২) অধ্যায়ে ইন্দ্র-বিরোচনের উপাখ্যানে আছে—প্রজাপতি আত্মার তিনটি রূপের কথা বলেছেন—জড়দেহে নিহিত জাগ্রত অবস্থার রূপ, স্বপ্নময় অবস্থা এবং সুষুপ্তিতে অবস্থান। সহজ করে বোধহয় বলা যায়, জাগরণে, স্বপ্নে এবং এমন কি গভীর নিদ্রাতেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে।

মৃত্যু আর পরলোক রহস্যসংক্রান্ত নানা তথ্যভরাক্রান্ত তোমার সেই দীর্ঘ চিঠিটা সামনে রেখেই তোমাকে লিখছি—তুমি বেশ বিব্রত হয়েই লিখেছ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে দেখেছ মৃত্যুর পর আত্মা শুধু বর্তমানই থাকে না আরও নানা বৈচিত্রময় বর্ণাঢ্যরূপে বিরাজ করে। যেমন বলা যায় তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে আছে আত্মার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় রূপের দীর্ঘ বিবরণ—

আরও অনেক কথা লিখে শেষে বলেছ, উপনিষদে, পুরাণে আত্মার পারলৌকিক অস্তিত্বের কথা ভূরি ভূরি আছে। থাক—তাতে মন ভরে না। সংশয় যায় না। আপনি দীর্ঘদিন ধরে পরলোকতত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন।

তাই আপনাকে অনুরোধ করছি—আপনি কি বলতে পারেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সব কিছু শেষ হয়ে যায় না। দেহের মৃত্যুতে আত্মা মরে না। অশরীরি কিংবা সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে রহস্যময় আর দুর্জ্ঞেয় কোন সূক্ষ্মলোকে বাস করে—এসব তথ্যের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারেন ?

আরও বিশেষ করে বলবেন, সময় সময় নাকি পরকালের সেই অশরীরি আত্মা কোন কারণে বিক্ষুব্ধ কি বিদ্বেষের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে জড়দেহ ধারণ করে ইহলোকে আসে। আর সুখ দুঃখ, আনন্দ-বেদনায় ঘেরা চলমান জীবনটাকে মুহূর্তে বিপর্যস্ত করে দিয়ে নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে চলে যায়। আর তাকেই আমরা বলি—

প্রেত বা ভূত !

আপনি নিজে কখনো কোন রহস্যময় প্রেতাত্মার সম্মুখীন হয়েছেন ? কখনো ভূত দেখেছেন ?

না। কোন থিয়োরী নয়। পরলোক, পরকাল, প্রেতলোক, প্রেততত্ত্ব ইত্যাদি ধোঁয়াটে আর জটিল বিষয়টা নিয়ে অনেকদিন ধরে ঘাঁটাঘাঁটি করছি। তত্ত্বকথা আমি অনেক জানি। আমি চাই প্রমাণ—

প্রত্যক্ষ প্রমাণ! দয়া করে একেবারে সাদামাটা ভাষায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলবেন—

পরলোক ও প্রেততত্ত্ব নিয়ে প্রবল অনুসন্ধিৎসু এবং বয়সে নবীন সেই পত্রলেখকের দীর্ঘ চিঠি পেয়ে খুবই বিব্রত হয়েছিলাম। আত্মার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ; আমি নিজে কখনো ভূত দেখেছি কি না—এসব কখনো কি বুঝিয়ে বলা যায় ? না—তাই সম্ভব ?

অনেক ভেবেচিন্তে লিখলাম—তুমি যে প্রশ্ন করেছ, যা জানতে চেয়েছ সেই চিরযুগের রহস্যে আচ্ছন্ন পরকালতত্ত্ব নিয়ে দুর্নিবার কৌতূহল সৃষ্টির আদিকাল থেকে নদীর স্রোতের মত প্রবাহমান। আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর আগে উপনিষদের যুগে নচিকেতাও যমকে এই প্রশ্নই করেছিল—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং
বরণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ—

কঠোপনিষদ ১।২০

অর্থাৎ মৃত্যুর পরে মানুষের কি হয়—এ বিষয়ে আমার যে সংশয় আছে আপনি উপদেশ দিয়ে আমার সেই সংশয় ঘুচিয়ে দিন ; কেউ বলে আত্মা থাকে এবং কেউ বলে কিছুই থাকে না—কোনটি ঠিক বলুন—

নচিকেতার এই ব্যাকুল প্রার্থনার উত্তরে যম কি বলেছিলেন জান ? বিষয়টি বড়ই জটিল, যম বললেন, ধর্ম অর্থাৎ জগৎধারক এই আত্মা স্বভাবত

অনু ও দুর্বিজ্ঞেয়। পুরাকালে দেবতাদের মনেও এবিষয়ে সংশয় ছিল। হে নচিকেতা, তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর—এই বলে তাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন—

তোমাকে বলতে বাধা নেই, যে দুজ্ঞের্য় আর জটিল বিষয়টি নিয়ে কোন ধর্মশাস্ত্রেই স্পষ্ট এবং প্রামাণিক কিছু নেই সেই ধূমাচ্ছন্ন আর রহস্যময় পরকালতত্ত্ব প্রসঙ্গে আমি আর কি তেমন নতুন করে আলোকপাত করতে পারি?

মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কি না সেই আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার আগে আমাদের জানা দরকার সোল (soul) অথবা স্পিরিট (spirit) বা আত্মা বস্তুটি কি? উপনিষদে বলছে মানবাত্মার তিনটি সত্ত্বা বা উপাধি—জড়দেহ যার সাহায্যে আমরা ভুলোকে শক্তির আদানপ্রদান করি, বাসনাময় দেহ (Desired Body) সূক্ষ্মলোকের সঙ্গে যুক্ত এবং কাম, ক্রোধ ও বিদ্বেষ ইত্যাদি মনোভাব এইখানেই ঘণীভূত হয় এবং সেই মত কাজও সমাধা হয় আর আছে আত্মার ভাবনাময় সত্ত্বা (Thought Body) যেখানে যাবতীয় চিন্তার কাজ সম্পন্ন হয়। আত্মার এই তিনটি সত্ত্বা আবার যথাক্রমে তিনটি প্রাকৃতিক লোকের সঙ্গে সংযুক্ত—ভূলোক (Physical Plane) ভুবর্লোক (Astral Plane) এবং স্বর্লোক (Lower Metal Plane)। অবস্থা বিশেষে মানুষের আত্মার সেই তিনটি সত্ত্বাই এই তিনটি প্রাকৃতিক লোকেই বিচরণ করে।

প্রখ্যাত রুশ অধ্যাত্মবাদী এবং মনোবিজ্ঞানী ডক্টর পি. ডি উস্পেনস্কি তাঁর 'ট্যারিট্যাম অরগ্যানাম' (Taritum Organam) গ্রন্থে বলেছেন মানুষের সংবেদনা বা অনুভূতি, ভাবনা, বাসনা এবং বিভিন্ন চিন্তাপ্রবাহ যেখানে উৎপন্ন হয় তাকেই আমরা বলি 'মন'। আর মনেরই আর এক নাম—আত্মা! Human soul is to be the both spring and core of bodily life and functions and also the seat of all mental activities.

এইসব তথ্য বলে মনস্বী দার্শনিক উস্পেনস্কি জানিয়েছেন একটি ঘটনা। সেই ঘটনা যেমন বিচিত্র তেমনি বিস্ময়কর—

লোকটি অসুখে পড়েছিল। বেশ কঠিন অসুখই বলতে হবে। ভয়ানক নিষ্ঠুর সেই কালব্যাধি তাকে প্রায় বার বছর ধরে একটু একটু করে কুরে কুরে খেয়ে ফেলছিল। তার প্রায় সারা দেহ অবশ করে দিয়েছিল। শুধু হাত পা কেন, শরীরের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গই সে একটুও নড়াতে পারত না। বিছানায় এক দলা মাংস পিণ্ডের মত পড়ে থাকত।

আশ্চর্য! গোড়ার দিকে কিন্তু অসুখটা তেমন তাকে জাঁকিয়ে ধরেনি সব অসুখের যেমন নিয়ম। সামান্য আর খুব নিরিহ গোছের আক্রমণ করেই থেমে গিয়েছিল। কিন্তু—বছর যেতে না যেতেই আবার সেই রোগ মাথা চাড়া দিল। এবারের ধাক্কাটা কিন্তু আর কমল না। বরং ধীরে

ধীরে বেড়েই যেতে লাগল আর মনে হল বেশ পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে কায়েম হয়ে বসল।

একটু একটু করে সে শুকিয়ে যেতে লাগল। কয়েকমাস কাটতে না কাটতে সে একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশে গেল। তার যে খাটটি থেকে সে উঠতে পারত না সেদিকে তাকালে দেখা যেত লেপতোষক ছড়ানো শূন্য পালঙ্কে শুধু দুই টুকরো আগুনের মত জ্বলছে দুটো চোখ।

তোমার নিশ্চয় মনে হচ্ছে এই মুমূর্ষ মানুষটিকে নিয়ে আর কিছুই হবে না। আর কিছুকাল পরেই মৃত্যু এসে তার সব জ্বালা জুড়িয়ে দেবে— তাই না? তোমার পক্ষে এসব ভাবাই স্বাভাবিক।

উস্পেনস্কি সাহেবের এই লোকটির সেই অদ্ভুত ঘটনা পরে বলছি। তোমাকে মনে রাখতে হবে, আত্মা আছে কিনা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চেয়েছ তুমি। দেখ, তোমাকে বলি, স্পিরিট বা সোল অথবা আত্মার কথায় স্বভাবতই মানুষের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তুমি তো পরকালতত্ত্ব অনেকদিন থেকে নাড়াচাড়া করছ—মৃত্যুর পর মানুষের আত্মার পরিণতি নিয়ে অনুশীলন করছ। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তুমি কি কখনো ভেবেছ মানুষ কি? মানুষের ডেফিনিশান বা সংজ্ঞা কি?

কেউ বলেছেন হাড়ের কাঠামো বা স্কেলিটনের ওপরে টিস্যুস অফ ফ্লেস বা মাংসের আঁশ ছড়ানো দেহধারী জীবের নামই মানুষ। আবার কেউ বা বলেছেন কিছু পরিমানে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেনের অনুর সংমিশ্রন হল মানুষ। শরীর বিদ্যার পণ্ডিতরা জানিয়েছেন, মানুষের দেহে আছে ছয় কিলো মত হাড়, পনের কিলো সূক্ষ্ম সুতোর স্নায়ুতন্তু বা নার্ভের বাণ্ডিল আর ডিমের শ্বেত অংশের মত দেখতে অ্যালবুমেন এবং শতকরা পঞ্চাশ ভাগ জল এবার দেখা যেতে পারে স্বনামধন্য মনোবিজ্ঞানী রোনাল্ডের ডেফিনিশানটা মানুষ বোধ এবং বুদ্ধির প্রতীক। দেহের ভেতরের নানাবিধ যন্ত্র তাকে তার বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনায় সাহায্য করে। কিন্তু—

আমি কি বলি জান, মানুষ মূলত চৈতন্য বা স্পিরিট। তুমি তাকে আত্মাও বলতে পার। সে জানুক আর নাই জানুক প্রতিটিই মানুষই কি তার মনের অবচেতনায় ন্যায় অন্যায়ের বোধ, যুক্তি, বুদ্ধি, বিচারশক্তি ইত্যাদি মানসিক বৃত্তিগুলো বহন করছে না?

মনে রেখ, চৈতন্য। মানুষের চৈতন্যময় আত্মা অনির্বাণ প্রদীপের মত জ্বলতে থাকে। এই চৈতন্য বা আত্মা কখনোই অচেতন এবং নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। তাই মনে হয়, সেই অসুস্থ লোকটা অমন একটা অদ্ভুত কাণ্ড করতে পেরেছিল। অবশ্য মানুষের মন, তার আত্মা, তার চেতনা ইত্যাদি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকলে খুব একটা অস্বাভাবিক নাও মনে হতে পারে লোকটির কার্যকলাপ। কি করেছিল?

ডক্টর উস্পেনস্কির বৃত্তান্ত তাঁর জবানীতেই শোন—

লোকটা নিজেই বেশ বুঝতে পারছিল, তার আয়ু শেষ হয়ে আসছে। আর যতই বেশি করে অনুভব করছিল, পৃথিবীতে তার মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে ততই যেন যেসব সে ভালবাসত—পছন্দ করত সেইসব জিনিসের ওঁপরে বেড়ে যাচ্ছিল তার আসক্তি।

বেশ বড়লোকের ছেলে। তাই দাসদাসী, চাকর, খানসামা, নার্স, আয়া-কোন কিছুরই অভাব ছিল না। তারা অষ্টপ্রহর তার দেখাশোনা করত। একদিন সকালে তার চব্বিশ ঘণ্টার নার্স শুনতে পেল, তার বিছানার লেপের ভেতর থেকে ভেসে আসছে কুকুর ছানার মত কুঁই কুঁই শব্দ। ছুটে এল। তার মনে হল হয়ত তার মনিব কিছু বলতে চেষ্টা করছে। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, কিছু বলছেন স্যার—

কী! ক্ষীণ অস্ফুট কিন্তু কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। দুটো চোখে আগুন জ্বলতে লাগল। চিঁ চিঁ করে বলল, অনেকক্ষণ থেকে ডেকে যাচ্ছি শুনতে পাও না? কোথায় থাক—কি কর—

ক্ষমা করবেন স্যার, শুনতে পাইনি—

হুইল চেয়ার নিয়ে এস। আমাকে ড্রেস করিয়ে দাও। আমি এখুনি বাইরে যাব—

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নার্স। বোবা হয়ে গেল। কয়েকটা হাড়ের কঙ্কাল নিয়ে যে লোকটা বারটা বছর ধরে বিছানায় মিশে রয়েছে সে যাবে—

হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি, গলা চিরে একটা অমানবিক আর্তনাদ করে বলল লোকটা, যাও দেরি করছ কেন, একটু থেমে আবার ঝাপসা অস্পষ্ট গলায় বলল, কলেজে আমি যে পোশাক পরে যাই সেই স্যুটটা নিয়ে আসবে বুঝেছ?

নার্স খরচোখে তাকিয়ে রইল তার রোগা হাড় বের করা এবং শুকিয়ে আমসী হয়ে যাওয়া মুখের দিকে। শেষপর্যন্ত কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? ভয়ানক নিষ্ঠুর সেই কাল রোগ বুঝি তাকে পুরোপুরি ধ্বংস করার আগে উন্মাদ করে দিল—

কেন—কেন তুমি আমার কথার অবাধ্য হচ্ছ, তীব্র যন্ত্রণায় ককিয়ে বলল লোকটা: আমি তোমাকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দেব—নিস্ফল আক্রোশে গজরাতে লাগল।

স্যার, ডাক্তার আপনাকে বিছানা থেকে উঠতে বারণ করেছে, ভয়ে ভয়ে নার্স বলল, বাইরে যাওয়া তো ডাক্তারবাবুরা কল্পনাই করতে পারবেন না—

হ্যাঙ্গ ইয়োর ডক্টরস—অল ব্লাডিফুল, অসহ্য যন্ত্রণায় তার দুর্বল, ক্ষীণ দেহটা দুমড়ে দুমড়ে উঠতে লাগল। দুহাতে ভর দিয়ে কোনরকমে উঠে বসল। আর সেই পরিশ্রমেই হাঁপরের মত ফুলে ফুলে উঠতে লাগল হাড় জিরজিরে বুকটা। মনের সমস্ত জ্বালা মিশিয়ে খুব আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ডাক্তাররা

আমার জন্যে কি করতে পেরেছে—বার বছর ধরে তো কত রকম চেষ্টাই না করল, একটু থামল। ক্লান্ত জন্তুর মত বড় বড় নিশ্বাস পড়তে লাগল। হঠাৎ চাপা গলায় চিৎকার করে বলল মেডিকেল সায়েন্স—ভুয়ো—মিথ্যা—সব মিথ্যা—তার দুচোখ দিয়ে আগুন ঝরতে লাগল। আবার অস্ফুটস্বরে বলল। মেডিকেল সায়েন্স কখনো রোগ সারাতে পারে না—ভুল—রোগ সারে মনের—

বলুন, বলুন থামলেন কেন, ঘরে পা দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত ও বহুদর্শী ডাক্তার, মেডিকেল সায়েন্স কোন রোগ ভাল করতে পারে না—রোগ ভাল হয়ে যায় মনের জোরে—বলছিলেন না? একটু থেমে আবার বললেন, কথাটা নেহাৎ মন্দ বলেননি। মনের জোর বা স্পিরিট যদি অটুট থাকে তাহলে ব্যাধি নির্মূল না হলেও তার প্রকোপটা অনেকখানি এড়ানো যায়—

ডাক্তারবাবু, আমার অসম্ভব মনের জোর, দুরন্ত প্রেরণায় মৃত্যু পথযাত্রী মানুষটার চোখদুটো প্রদীপের মত জ্বলতে লাগল। আগ্রহের আতিশয্যে উঠে বসল। আর কাঁপা কাঁপা হাতে ডাক্তারের হাত দুটো ধরে তার মনের অসম্ভব বাসনাগুলো একটার পর একটা বলে যেতে লাগল।

ডাক্তারবাবু স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

পক্ষাঘাতে প্রায় পঙ্গু রোগীর প্রস্তাব শুনে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চোখে চিন্তার ছায়া ঘনিয়ে এল।

কি ভাবছেন এত? পারব—ডাক্তারবাবু—পারব—তীব্র উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে লোকটা বলল, বিকেলে তো আপনি আসছেন—দেখবেন—আমি অলরাইট।

ইউক্রেনের সেই ছোট মফস্বল শহরে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। রাস্তার দু'দিকে কৌতূহলী জনতার ভিড় উপচে পড়ল। বাতাসে ভাসতে লাগল তাদের টুকরো টুকরো কথা—

—বার বছর ধ'রে প্যারালিসিসে ভুগছে সেই মানুষ যাবে গাড়ি চালিয়ে—বললেই হল আর কি—

—হতে পারে—বড়লোকের ব্যাপার ভাই। হয়ত মন্ত্রতন্ত্র জড়িবুটি করেছে।

—যাই করুক। তবুও একটা সম্ভব অসম্ভব আছে তো—

তার কথা আর শেষ হল না। দূরে—বহুদূরে খোয়া বিছানো রাস্তার প্রান্তে ঝাপড়া উইলো গাছের নিচ থেকেই মনে হল যেন শোনা গেল একটা একটানা আওয়াজ—ক্যাঁচ—ক্যাঁচ—ক্যাচোর—ক্যাঁচ—

আসছে রে আসছে। দর্শকদের ভেতরে উত্তেজনার ঝড় বয়ে গেল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই যেন বাজ পড়ল। কারো মুখে একটা কথা নেই। একেবারেই অবাস্তব কল্পনার মত অসম্ভব সেই দৃশ্য যেন বিকল করে দিয়েছিল মানুষগুলোর স্নায়ু।

চারচাকার গাড়িতে বসে সাইকেলের চেন লাগানো দুটো হাত প্যাডেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আসছে সেই লোকটা পক্ষাঘাতের থাবায় যার দেহের ডানদিকটা অবশ হয়ে গিয়েছে ; এক যুগ ধরে রোগ তাকে কুরে কুরে খেয়ে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।

আশ্চর্য তো! তার পরণে সেই আকাশী রঙের দামী সার্জের স্যুটটা যেটা পরে কলেজে পড়াতে যেত। চারচাকার গাড়িও বেশ জোরেই তো চালাচ্ছে। শুধু হাত দিয়ে প্যাডেল করার পরিশ্রমে একটু হাঁপাচ্ছে। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। আর তাছাড়া কোথাও নেই এতটুকু অসঙ্গতি—নেই কোন অস্বাভাবিকতা।

কোন যাদুমন্ত্র বলে এমন অসম্ভব সম্ভব হল, শহরের বাসিন্দারা ভেবে পেল না। মনের ভেতরে ধাঁধা নিয়ে যে যার বাড়ি ফিরে গেল। আর ওদিকে একেবারেই নির্বিঘ্নে লোকটা পৌঁছে গেল কলেজ অফ পলিটেকনিকের গেটে। এখানে সে ম্যাথমেটিক্স পড়ায়! সেখানে কিছুক্ষণ অংক শিখিয়ে আবার গাড়ি চালিয়ে চলে গেল বেশ দূরে স্কুল অফ মাইনসে (খনিজবিদ্যার শিক্ষায়তন)। এখানেও তিন-চারটি ক্লাস করে পড়ন্ত বেলায় বাড়ি ফিরে এল—

সুস্থ অবস্থায় যেমন আসত।

এই পর্যন্ত বলে ডক্টর উস্পেনস্কি জানিয়েছিল অভিনব একটি তথ্য। আর তার পরিপ্রেক্ষিতে দিয়েছিলেন একটি বিচিত্র আর চমকপ্রদ উদাহরণ—

লোকটা প্রমাণ করে দিয়েছিল তার স্পিরিট বা সোল অথবা আত্মা তার সেই নিষ্ঠুর ও বর্বর ব্যাধির চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। রোগে রোগে জীর্ণ হয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ আর দুর্বল হয়ে গিয়েছিল তার দেহ। কিন্তু আশ্চর্য—তার বুদ্ধির দীপ্তি ছিল প্রদীপ্ত দীপশিখার মত উজ্জ্বল—ঠিক যেন দুর্গ। শত্রুর গোলার আঘাতে আঘাতে তার চারিদিকের দুর্গপ্রাকার (পাঁচিলগুলো) একটু একটু করে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। কিন্তু দুর্গটা কামানের গোলার চেয়েও দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে দিব্যি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মারা যাওয়ার দু'এক সপ্তাহ আগে লোকটা তার নার্সকে ডেকে বলেছিল, আমার কলেজ লাইব্রেরি থেকে খানকয়েক ম্যাথমেটিক্সের বই নিয়ে আসার ব্যবস্থা কর—

বই নিয়ে আসা হয়েছিল। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত লোকটা রাশি রাশি অংক কষেছিল। আশ্চর্য অ্যালজেব্রা কি অ্যারিথমেটিক্সের সাধারণ অংক নয়, ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাস আর ট্রিকনোমেট্রির খুব জটিল আর দুরূহ এক একটি অংক নির্ভুলভাবে করেছিল। তার সারা জীবনের ধ্যানজ্ঞান ম্যাথমেটিক্সের বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই মারা যায়—

তারপরেই উস্পেনস্কি মন্তব্য করেছেন, লোকটা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রমাণিত করে দিয়েছিল, মানুষের মন বা আত্মা যেখানে চিন্তা অথবা বাসনার

জ্ঞম হয় তার শক্তি মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি—To his last day he showed that thought is stronger than death.

মানুষের এই চিন্তাই হল চৈতন্য। এই চিন্তা হল মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত অসাধারণ মূল্যবান সম্পদ। এই চিন্তায় আছে অবাধ স্বাধীনতা আর সেই বাধাবন্ধহীন স্বাধীনতাকে কখনো আক্রমণ করা যায় না যেমন তেমনি যায় না তাকে এতটুকু সঙ্কুচিত করা। তোমার জড় দেহটার ওপরে যত খুশি তুমি অত্যাচার করতে পার; পার তাকে লোহার কারাগারে বন্দী করে রাখতে। আবার পার্থিব কোন শক্তি প্রয়োগ করে তাকে চালিয়েও নিয়ে যেতে পার যতদূর খুশি। কিন্তু—

চিন্তার অবিরাম প্রবাহের সঙ্গে তুমি কিছুই করতে পার না; কোন কিছু করেই তাকে তুমি সংযত ও বাধ্য করতে পার না। সে তোমার সাংসারিক কার্যকলাপ দেখে ভেতরে ভেতরে হাসে। সব কিছুকে বিদ্রূপ করে। কিন্তু প্রভুত্ব করে তোমার সমস্ত কাজের ওপরে। সংসারের সংকীর্ণ স্বার্থ বা ধর্মীয় কপটতা যখন কোন কিছুকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, যখন রাজনৈতিক অথবা ব্যবসায়িক উচ্চাভিলাষ তার ওপরে প্রবঞ্চনার মুখোশ পরিয়ে দেয় তখনও কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সে থাকে অবিকৃত এবং অবিচল! এই চিন্তাই কি চৈতন্যময় আত্মার (Psychic Being) অস্তিত্বের যথেষ্ঠ সুস্পষ্ট প্রমাণ নয়?

এসব কথা বলে ডক্টর উস্পেনস্কি জানিয়েছেন, ১৮৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ের এই ঘটনাটি তাকে জানিয়েছিলেন তার বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হেনরী পণকেয়ার। পণকেয়ার ছিলেন যেমন কট্টর আদর্শবাদী তেমনি নাস্তিক। ঈশ্বরের অস্তিত্বে ঘোরতর অবিশ্বাসী এই বন্ধুর সঙ্গে তার নিয়মিত চিঠিপত্র আদানপ্রদান হত আর সুদীর্ঘ এক একটা চিঠির বিস্তারিত আলোচনার বিষয়বস্তুই ছিল ঈশ্বর আত্মা, মন, চৈতন্য ইত্যাদি। কিন্তু প্রায় প্রতিটি পত্রেই পণকেয়ার ঘুরিয়ে লিখত একটা কথা—I believed only in spirit—আমি শুধু স্পিরিটে বিশ্বাস করি—

তুমি ভাবছ আমি আবোল তাবোল বকে যাচ্ছি। ধান ভানতে শিবের গীতের মত শোনা লেও আমাকে বলতে হচ্ছে তুমি ভূত বা প্রেতাত্মা আছে কিনা জানতে চেয়েছিলে। চেয়েছিলে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

দেখ, কান টানলে মাথা আসার মতই প্রেতাত্মার প্রসঙ্গেই আত্মার কথা এসে যায়। আত্মা সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকলে, আমার বিশ্বাস, প্রেতাত্মার মত জটিল কুয়াশাময়, বিষয়টা তোমার বুঝতে সুবিধে হবে—

শোন ডক্টর উস্পেনস্কির বন্ধু হেনরী পণকেয়ারের সেই 'স্পিরিট'—এই ইংরেজী কথাটার অর্থ যেমন অত্যন্ত ব্যাপক তেমনি অভিহিত বহু নামে যেমন মন, আত্মা, জীবন, চেতনা, প্রকৃতি, মেজাজ, প্রাণ, ভূত বা প্রেত ইত্যাদি!

এই স্পিরিটই (তুমি তাকে মন বল কি চেতনা বল কি আত্মা বল) কিন্তু ডাইনামোর মত বিপুল শক্তি দিয়ে মানুষকে চালনা করে। সাধারণ লোক ভাবে সে বুঝি দৈহিক শক্তিতে চলছে। তা কিন্তু নয়। সে চলছে মনের বা স্পিরিটের জোরে! তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে রেমার্কের প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা 'অল কোয়ায়েট ইন দি ওয়েষ্টার্ন ফ্রন্টের' বালক সৈনিক পলের সেই আশ্চর্য কথাগুলো—'দেখেছি কত। এমন লোক দেখেছি যাদের মাথার খুলি উড়ে গিয়েছে—তবু তখনো মরেনি। দুখানা পা-ই কাটা গিয়েছে তবুও দৌড়াচ্ছে হাঁটু ঘসটে ঘসটে। হাঁটু গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে, হাতের ওপর ভর দিয়ে বুকে হেঁটে গিয়েছে দেড় মাইল। একজনের পেট চিরে গিয়েছে, নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে—সেই নাড়িভুঁড়ি দুহাতে ধরে নিজে গিয়ে হাসপাতালে উঠতে দেখেছি—এমন মানুষ দেখেছি মুখ নেই, মুখের হাঁ নেই, মুখের চোয়াল নেই তবুও বেঁচে আছে। কথা বলার চেষ্টা করছে........'

তাই বলছি, কামানের গোলার স্প্রিন্টারস (ধাতুর টুকরো) কিম্বা যে কোন অস্ত্র দিয়ে মানুষকে শুধু ক্ষতাবক্ষত কেন, একেবারে ঝাঁঝরাও করে দেওয়া যায় কিন্তু তার স্পিরিটকে এতটুকু দমানো যায় না—

—মানুষের আত্মাটা কেমন জানেন—শ্মশানের চিতার আগুনের মত। কখনো নেভে না—

কেমন করে বলছেন একথা ?

বৃদ্ধ আর একটি কথাও বলল না। খয়েরী রঙের তুষের ভারি চাদরে মাথা মুখ গুঁজে বসে রইল। সরকারহাট থানার পুলিশ ফাঁড়ির পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। রাতের গাঢ় স্তব্ধতার বুক চিরে সেই ধাতব শব্দটা বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল দূরে।

না। কাজটা ভাল হয়নি। হয়ত না জেনে তার কোন গোপন ব্যথার জায়গায় ঘা দিয়ে দিয়েছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপের সূত্রটা একটু বলা দরকার—

তখন কেরোসিনের খুব ক্রাইসিস চলেছিল। আমার মত সেই বৃদ্ধ দুই বগলে দুটো টিন নিয়ে লাইন দিতে এসেছিল। এইখানেই কথায় কথায় তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল।

নাম শীতল সাহা। বয়স বিরাশী। ঠাকুর পঞ্চানন্দের পুজারী এবং সেবাইত। ঠাকুরের পুজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি অন্নজল গ্রহণ করেন না। সামান্য একটু আলুসেদ্ধ ভাত খান, কোনদিন বা একটা নিরামিষ তরকারি। কিন্তু যাই হোক না কেন সে স্বপাক আহার করে চলেছে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে। সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ। তাই কৌতূহলী হয়েছিলাম।

এই বয়সে আপনি এত কষ্ট করে কেরোসিন নিতে এসেছেন, আপনার বাড়িতে আর কেউ নেই ?

থাকবে না কেন ? ছেলে আছে—ছেলের বৌ আছে। দুটো নাতি আছে, একটু—থামল সে। তারপরে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু কারো সাহায্য নেওয়া আমি পছন্দ করি না—

মনে হল, তার পারিবারিক জীবনে কিছু ক্ষোভ আছে। তাই প্রশ্ন ঘুরিয়ে বললাম, আচ্ছা যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বলি, আপনি পঞ্চানন্দ ঠাকুরের পুজারী হলেন কি করে ?

সাধে কি আর হয়েছি রে ভাই, খুশিতে হাঁটু দুটো ঝাঁকাতে লাগল। ভরাট-গলায় বলল, যার পুজো সেই ঘাড় ধরে আমাকে তার কাজে লাগিয়েছে—কি রকম ?

চুপ করে থাকল সে। ভারি মাংসল মুখখানা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। কি হল, কথা বলছেন না যে ?

কি হবে এসব শুনে ? আপনারা কিছুই বিশ্বাস করবেন না, একটু থেমে কয়েকমুহূর্ত মনের ভেতরে সাবেক কোন ঘটনা নাড়াচাড়া করে বলল, একদিন মাঝরাতে আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হল, আমার বিছানা ঘেঁসে মাথার কাছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে—থেমে গেল সে। শেষরাতের ফিকে অন্ধকারে তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল তীব্র উত্তেজনায়। আবার আস্তে আস্তে বলল, ধড়মড় করে উঠে বসে দেখি একজন পুলিশ। কিন্তু তার মুখখানা আমার ঠাকুর পঞ্চানন্দের মত। বললেন, তুই কাল থেকে নিয়মিত আমার পুজো করবি—

কিন্তু পুলিশের বেশে কেন ?

দেবতা তো কখনো নিজের চেহারা নিয়ে দেখা দেন না। তিনি সবসময় ছদ্মবেশ ধরে আসেন, থেমে গেল সে। ভোরের আকাশের দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, আপনারা তো অনেক লেখাপড়া করেছেন—জানেন তো, মহারাজ কর্ণকে দেবতা দেখা দিয়েছিলেন গরীব ব্রাহ্মণের বেশে, কিশোরী মেয়ের রূপ ধরে এসেছিলেন মা কালী রামপ্রসাদের কাছে—বলতে বলতেই হঠাৎ থেমে গিয়ে নিজের চিন্তার ভেতরে তলিয়ে গেল।

দেবদ্বিজে তার গভীর ভক্তি এবং স্থিরবিশ্বাসের আগুনটাকে একটু খুঁচিয়ে দেওয়ার জন্যই বললাম, স্বপ্নের ভেতরে দেবতার আদেশ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব এসব আপনি বিশ্বাস করেন ?

কথা বলল না সে। খুব আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আর একটু একটু করে তার মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল। হঠাৎ আমার কানের একেবারে কাছে মুখ নিয়ে এসে খুব চাপা অথচ তীক্ষ্ন গলায় বলল, আপনি রেডিও শোনেন না ?

অত্যন্ত অবাক হলাম। বুড়ো বলে কিরে বাবা! বললাম—কেন বলুন তো? রেডিও তো যন্ত্র। তার সঙ্গে এসবের কি যোগ—

আছে বাবা—আছে, একটু থেমে ছাড়া ছাড়া গলায় যেন অনেক—অনেক দূর থেকে আস্তে আস্তে বলল, আপনারা কত লেখাপড়া করেছেন—আপনাকে আর কি বোঝাব বলুন, আবার থেমে গিয়ে নিজের ভেতরে ডুব দিল।

ঠুনঠান্—কেরোসিন টিনের শব্দ তুলে এক একটি ছায়ামূর্তির মত দলে দলে বহুলোক আসছে। লাইন ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। তাদের একটানা গুঞ্জনে বিঘ্নিত হচ্ছে ব্রাহ্মমুহূর্তের প্রগাঢ় স্তব্ধতা। ধীরে ধীরে ফর্সা হচ্ছে পুবের আকাশ—

শুনুন—আপনার সঙ্গে এত আলাপ হল, বৃদ্ধ মৃদু হেসে বলল, আপনাকে বলা দরকার—আমি একেবারে মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। ব্যবসা করি—

কিসের ব্যবসা?

বড়বাজারে পেঁয়াজের আড়ত আছে দুটো। আমি হোলসেল মানে পাইকারি কারবার করি—

বাব্বা ঃ তাহলে তো আপনি রীতিমত ধনী মানুষ—

ভুল-ভুল—একেবারে ভুল, যেন জ্বলে উঠল বৃদ্ধ, টাকায় কখনও ধনী হয় না মানুষ। টাকায় যন্ত্রণা বাড়ে—মানুষ অসুখী—

আচ্ছা এসব কথা থাক প্রসঙ্গ ঘুরে যাচ্ছে দেখে খেই ধরিয়ে দিয়ে বললাম আপনি দেবতার অস্তিত্ব, স্বপ্নের ভেতরে দেবতার দর্শনের সূত্রে রেডিওর কথা বলেছিলেন—

কোন কথা বলল না সেই বৃদ্ধ। দুই হাঁটুর ভেতরে মাথা ঝুলিয়ে থেকে কি যেন ভাবতে লাগল। কেমন ঝাপসা আর অস্পষ্ট গলায় বলল, মানুষের দেখার ক্ষমতা, বুঝবার ক্ষমতা একটা সীমানার ভেতরে খুঁটো দিয়ে বাঁধা আছে ভাই! শুনেছি হাইড্রোজেন নাকি আর অক্সিজেন মিশিয়ে নাকি জল হয়—জলটা দেখতে পাই, কিন্তু গ্যাস দুটো তো পাই না—অথচ তাদের অস্তিত্ব নেই, তা নিশ্চয়ই আপনি বলতে পারেন না, থেমে গেল সেই বৃদ্ধ। আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল।

আমি গ্যাস দুটোর তুলনার সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব মেলাতে চেষ্টা করছিলাম। —সেইরকম ভাই, আবার সে বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে শুরু করল আকাশের শব্দতরঙ্গ থেকে নাকি রেডিও বাজে। কিন্তু সেই শব্দের ঢেউ আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। একমাত্র ঘরে যন্ত্র (সেট) থাকলে তবেই আপনি শুনতে পান তাই না? একটু থেমে তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল দেখতে পান না—বলেই ঈশ্বর নেই বলতে পারেন না—থেমে গেল। আবার থেমে থেমে কটুগলায় বলল, আর আপনার মনে যদি ভক্তি আর বিশ্বাস থাকে তাহলে আপনিও তাঁর লীলা—

দুই দাদু খুব গপ্পো জমিয়েছে রে। পাতলা অন্ধকারের ভেতরে ছায়ার জটলার মত কতগুলো ছোকরা আমাদের লক্ষ্য করে ফিসফিসিয়ে উঠল। বুড়ো কটকট করে তাকাল তাদের দিকে।

তোমার বোধহয় স্মরণ আছে এই বৃদ্ধই মন্তব্য করেছিল, মানুষের আত্মা শ্মশানের চিতার আগুনের মত—আর সেই সূত্রেই তোমাকে তার কথা শোনাতে শুরু করেছিলাম।

যতই তার সঙ্গে আলাপ করছিলাম ততই লোকটার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সত্যি বলতে কি রেডিওর শব্দতরঙ্গ, হাইড্রোজেন অক্সিজেন ইত্যাদি অদৃশ্য গ্যাসের সঙ্গে নিরাকার ঈশ্বরের তুলনা শুনে আমি রীতিমত বিস্মিত হলাম। লেখাপড়া তেমন জানে বলে তো মনে হচ্ছে না। বড়বাজারে পেঁয়াজের আড়তদার! কিন্তু চিন্তাভাবনায় বেশ ডেপ্‌থ আছে তো!

তার কথা শুনে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল স্যার আর্থার এডিংটন সাহেবের 'Science and the unseen World' গ্রন্থে তাঁর সেই মন্তব্য—It would be wrong to condemn alleged knowledge of the unseen world because it is unnable to follow the lines of deduction laid down by science as appropriate to the seen world.

অর্থাৎ কি জান এই পরিদৃশ্যমান জগৎটা সম্বন্ধে কোন অনুমান এবং সিদ্ধান্ত করতে হলে বিজ্ঞানে যেসব নিয়মকানুন ও রীতিনীতি আছে সেসব দিয়ে অদৃশ্য জগতের বিচার করা যায় না বলেই তা ভুল তা মিথ্যা বলা খুব অন্যায়।

আমার যতদূর মনে পড়ছে তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র। তুমি তো আমার চেয়ে ভাল করে জান, বিজ্ঞানেই বরং এই পৃথিবীর বাইরে একটা অদৃশ্য সূক্ষ্মলোকের অস্তিত্বের আভাস বেশি করে পাওয়া যায় না কি? বিজ্ঞান দেখিয়ে দেয়—বায়বীর পদার্থের ভেতরে একমাত্র ক্লোরিন আর ব্রোমিন ছাড়া বেশির ভাগই অদৃশ্য চুম্বকশক্তি, তড়িৎরঙ্গ, রেডিয়াম রশ্মি ইত্যাদিও তো আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু এদের অস্তিত্বকে কি তুমি অস্বীকার করতে পার?

ব্যাপারটা কি জান আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই বিশ্বচরাচরের বা দার্শনিকদের ভাষায় পরিদৃশ্যমান জড়জগতের অতি সামান্যই মানুষ প্রত্যক্ষ করতে পারে! তুমি নিশ্চয়ই প্রফেসার চার্লস রীচেটের (Prof. Charles Richet) নাম শুনেছ। তাঁর বিখ্যাত বই 'ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়'তে (Sixth Sense) তিনি বলেছেন, এই বিশাল বিশ্বকে আমরা একটি ছোট জানলার ভেতর দিয়ে দেখি—We have but one tiny window that looks upon the vast universe··· অতএব, হয়ত নিশ্চয়ই বলা যায় আমরা যেটুকু প্রত্যক্ষ করি তার তুলনায় প্রত্যক্ষ করতে পারি না তার পরিমাণ যেমন বিপুল তেমনি সীমাহীন! কিন্তু এখন যাক এসব কথা।

আমি সেই বহুদর্শী বিচিত্র মনের বৃদ্ধকে বললাম, কোন কিছু দেখতে না পেলেও যে তার অস্তিত্ব থাকে এই ভেবে কি বলছেন ঈশ্বর আছেন ?

নিশ্চয়ই, স্থির বিশ্বাসের আলোয় জ্বলজ্বল করতে লাগল তাঁর চোখদুটো। আপনার কি মনে হয়, মানুষের আত্মাও কি মৃত্যুর পরে থাকে ?

থাকে ভাই থাকে, থেমে থেমে ছাড়া ছাড়া গলায় বলল সে, আত্মাটা হল শ্মশানের চিতার আগুনের মত। কখনো নেভে না—

এসব কি বলছেন আপনার ধারণা বা বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে।

না-না। ভুল—এসব ভুল—বৃদ্ধ যেন জ্বলেপুড়ে নিদারুণ যন্ত্রণায় কঁকিয়ে বলল, আমি বলছি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে—আমি দেখেছি বলতে বলতে আচমকা থেমে গেল সে। আর সাবেকদিনের স্মৃতির ভারে তার চোখ দুটো সুদূর আর কেমন গভীর হয়ে উঠল।

তার স্ত্রী গত হয়েছিল ত্রিশ বছর আগে। ক্যানসার হয়েছিল। প্রথমে দক্ষিণ কলকাতার কোন হাসপাতালে পরে নার্সিংহোমে রেখে হাজার হাজার টাকা খরচ করে চিকিৎসা করে জেরবার হয়ে গিয়েও তাকে বাঁচাতে পারিনি। পারা যায় না। নিশ্চিত মৃত্যুর ওয়ার্নিং বেল দেওয়া এই কালরোগ থেকে কাউকেই বাঁচানো যায় না—একথা কারো অজানা নেই, এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল সে। তারপর একটা ভারি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার অস্ফুটস্বরে বলতে শুরু করেছিল, আপনাকে বলব কি, হয়ত ঠাকুর পঞ্চানন্দের দয়াতেই আমার স্ত্রী ভাল হয়ে উঠেছিলে। আমার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের পুজোআর্চা করত আর খুব শুদ্ধাচারী ছিল বলেই বোধহয় সে যাত্রায় রোগের প্রকোপ এড়িয়ে খাড়া হয়ে উঠল—

বলেন কি! ক্যানসার ভাল হয়ে গেল।

খুক খুক করে হাসল বুড়ো। কুকুরের কান্নার মত অদ্ভুত একটা শব্দ সেই হাসির। বলল, খুব স্ফূর্তি করে নার্সিংহোম থেকে তাকে বাড়িতে নিয়ে এলাম। টুকটাক করে কাজ কম্ম করছে—খাচ্ছে—দাচ্ছে—, হঠাৎ থেমে গেল সে। নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে থেকে কয়েক মুহূর্ত পর যেন নিভু নিভু গলায় বলল, কিন্তু দিন সাতেক যেতে না যেতে আবার গলায় ব্যথা বলতে লাগল (গলার ভেতরে ক্যানসার)। খাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেল, আবার হঠাৎ থেমে গিয়েছিল সেই বৃদ্ধ!

প্রায় তিনদশক আগের সেই গভীর শোকের দুঃস্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে প্রায়ই খেই হারিয়ে ফেলছিল বুড়ো। আবার কখনো বা তীব্র আবেগের তোড়ে এলোমেলো কথাবার্তা বলছিল। তার সব অসংলগ্ন এবং একান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু তার স্ত্রীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মানুষের আত্মা বা চৈতন্য সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা এবং ধ্যান-ধারণার কথা এখানে সংক্ষেপে বলা হল—

দিনে দিনে শুকিয়ে কাঁটা হয়ে যেতে লাগল তার স্ত্রী। কোন খাবার

সামনে নিয়ে গেলেই শুধু অঝোরে কাঁদত। শুধু বলত, আর জন্মে নিশ্চয়ই কারো মুখের খাবার কেড়ে নিয়েছিলাম।

কিছুদিন পরে দুধ, হরলিক্স আর কোন তরল খাবার এমন কি জল পর্যন্ত গলা দিয়ে আর নামত না। দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতে থাকতে তার দেহটা শুকিয়ে কৃশ হয়ে আসছিল। সরু সরু প্যাঁকাটির মত হাত পা। বেশ ছিপছিপে আর লম্বা মানুষটিকে দশ-বার বছরের ছোট মেয়ের মত মনে হত। কিন্তু—আশ্চর্য কে জানে কোন মন্ত্রবলে সে ওই অবস্থাতেও ঠাকুরঘরে যেত। জলবাতাসা দিয়ে পঞ্চানন্দকে ধুপধুনো দিত। কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে পারত না।

ভদ্রলোক লক্ষ্য করত, একটা আশ্চর্য ব্যাপার—তার স্ত্রী সেই ক্ষীণ আর ছোট্ট এতটুকু দেহ। সরু সরু কাঠি কাঠি হাত পা। কিন্তু অদ্ভুত উজ্জ্বল তার চোখদুটো। সেখানে যন্ত্রণার কোন চিহ্নের লেশমাত্র নেই। নেই ভয়াবহ সেই ব্যাধির কোন গ্লানি।

প্রতিদিনের মত অভ্যস্ত আর নির্ভুল নিয়মে পুত্রবধূকে কি রান্না হবে তার নির্দেশ দিয়ে স্নান করে ঠাকুরঘরে চলে যেত। বেরিয়ে এসে আবার গরু বাছুরের তদারক করত—এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল বিরাশী বছরের বৃদ্ধ সেই শীতল সাহা। কয়েকমুহূর্ত পরে তীক্ষ্ম চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আপনারা শিক্ষিত মানুষ—কি বলবেন জানি না—আমার মনে হয়, তার দেহ অকেজো হয়ে গিয়েছিল। তাই সে এসব করত না। করত তার সত্তা—তার আত্মা—

আমি চুপ করে থাকলাম। তার সরল ও গভীর বিশ্বাসে চিড় ধরতে পারে এমন কোন কথাই বললাম না। বলতে পারলাম না।

আস্তে আস্তে সে তাদের দাম্পত্য জীবনের সাবেক দিনগুলোর কথা বলেছিল।

প্রতিদিন সকালে স্নান করে পুজোপাঠ সেরে সে বড়বাজারে তার আড়তের গদীতে যায়। কর্মচারীদের কাজটাজ দেখাশুনা করে দুপুরে দেড়টা-দুটো নাগাদ ফিরে আসে। খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করতে করতে বেলা ডুবে যায়। সন্ধের মুখে মুখে শুদ্ধ পট্টবস্ত্র পরে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে পুজোয় বসে। তার স্ত্রীও তার কাছেই আর একটা আসনে বসে এটা-ওটা এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করে।

সে নিবিড় মনযোগে পুজোর মন্ত্রপাঠ করে চলে। তার স্ত্রী ঠাকুরের উজ্জ্বল আর প্রদীপ্ত মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন হয়ে যায়। তার সারা দেহ থর থর করে কাঁপতে থাকে। তার চোখের দৃষ্টি হয়ে যায় কেমন সুন্দর আর অপার্থিব।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে ভর হয়েছে তার স্ত্রীর। স্বয়ং ঠাকুর ভর করেছেন তাকে। এইবার—এইবার—

পঞ্চানন্দের মন্দিরের সামনে একফালি উঠানের এক কোণে ঝাপড়া কাঁঠাল গাছটার নিচে ঘন অন্ধকারে ছায়ার জটলা দেখা যাবে। একটি দুটি করে গুটি গুটি আসছে নানা বয়সের মেয়েপুরুষ। তাদের কারো দীর্ঘমেয়াদী বাতের ব্যথা; আবার কারো বা বহু মানত এবং জড়িবুটি করেও ছেলেপুলে হয় না, কারোর হয়ত সংসারে ভয়ানক অশান্তি হয় ছেলের বউ আর শাশুড়ি না হয় দুই ভাইতে ভাইতে ঝগড়া—এক একটি মানুষের এক এক রকমের ঝামেলা।

তারা একে একে হাতজোড় করে বলবে তাদের সমস্যার কথা। বলবে তার স্ত্রীকে যার পার্থিব সত্ত্বা তখন প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, দেবতার ভরে যার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। সেই অবস্থায় সে তাদের প্রত্যেকের অসুবিধার কথা শুনে বিধান দেবে—কথাগুলো যখন বলে তখন তার উদভ্রান্ত চোখ দুটোর দৃষ্টি থাকে দূরে দুর্নিরিক্ষ্য আকাশের দিকে। আর ঠিক দৈববাণীর মত করে বলে যায় প্রত্যেকের প্রতিকারের ব্যবস্থার কথাগুলো।

আশ্চর্য! শোনা যায় নাকি তার সেই বিধানগুলো একেবারে অব্যর্থভাবে মিলে যায়। বহুলোক উপকৃত হয়ে এসে দেখা করে যায়। তার স্ত্রী হাতজোড় করে বলেন, আমি কিছু করিনি—আমি কিছু জানি না বাবা। ঠাকুর পঞ্চানন্দই আমাকে দিয়ে ওসব বলিয়ে নেন—

তার স্ত্রীর সেই অদ্ভুত আচরণ এবং তার সেই বিস্ময়কর ক্ষমতার জন্যেই তার ঠাকুর পঞ্চানন্দের নাম ডাক ছড়িয়ে পড়েছিল সরসুনার সীমানা ছাড়িয়ে রায়দিঘী, তেঁতুলতলা এবং আরও দূর দূর গ্রামগঞ্জের দিকে।

এই ভাবেই সাধনভজনের ভেতরে ডুবে থেকে স্বামী স্ত্রীর দিন কাটছিল। আর সেইভাবেই কাটিয়েও দিয়েছিল তিন তিনটি দশক বা ত্রিশটা বছর। হয়ত আরও অনেকদিন—অনেক বছর পেরিয়েও যেত। কিন্তু—

দেশ ভাগাভাগির ঠিক দশবছরের গোড়ায় তার স্ত্রী অসুখে পড়ল। সামান্য গলাব্যথা। সেই টুকটাক ব্যথাই যখন ক্যানসার হয়ে দেখা দিয়ে তাকে একেবারে শুষে নিয়ে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল বলাবাহুল্য তখন আর পুজোর সময় ঠাকুরঘরে অতক্ষণ বসে থাকতেও পারত না—ভরও হত না।

তাদের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন সুভাষচন্দ্র বসুর (তখনো নেতাজী হননি) খুব নামডাক। তার তখন বাইশ বছর বয়স। আর স্ত্রী এগার বছরের মেয়ে। তাদের বিয়ের বছর খানেক পরে পার্কসার্কাস ময়দানেই বোধহয় কংগ্রেসের সভা হয়েছিল, যেখানে সুভাষ বোস মিলিটারী পোশাক পরে ঘোড়ায় চেপে বিশাল মিছিল পরিচালনা করেছিলেন তা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল স্ত্রীকে। অতটুক মেয়ে হলে কি হয়। জ্ঞানের নাড়ী ছিল টনটনে। সুভাষ বসুর সেই লাল টকটকে তেজী চেহারার দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বলেছিল, সর্বনাশ! ইনি তো মানুষ নন—দেবদূত গো—দেবদূত।

একটু থেমে আবার অস্পষ্ট ঝাপসা গলায় বলেছিল, দেখ বেশিদিন বাঁচবেন না—

কেন জানি না, এই একই কথা তার মনে হত তার স্ত্রীর হাবভাব রকমসকম দেখে। ঠাকুর দেবতায় অসম্ভব ভক্তি। তীক্ষ্ম বুদ্ধি—এসব মানুষ অনেকদিন বাঁচে না। বাঁচতে পারে না। তার মনে হয়—তার বিশ্বাস এরা ঠাকুরের চৌহদ্দীর কাছাকাছি পেঁছে যায় বলেই দেবতা আর তাকে ইহলোকে রাখে না।

—এই লেফ্‌টফ্রণ্ট না ইয়ে (কুৎসিত গালাগাল) গর্ভমেণ্ট যে কী সুখেই রেখেছে—

—তবুও আপনিই আবার তাদেরই ভোট দেবেন—

—আমি এখানে ইট দিয়ে লাইন রেখে গিয়েছিলাম—আমার সেই ইট ?

—ওসব ইট-টিট দিয়ে লাইন হয় না। টিন রাখেননি কেন ?

শুরু হয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল কাজিয়া। সরীসৃপের মত আঁকাবাঁকা আর বিশাল সেই কিউতে। সকালের শান্ত স্তব্ধতা শিউরে শিউরে উঠতে লাগল।

আপনি বড্ড বেশি প্যাসন্যাল এবং এলোপাথাড়ি কথা বলে চলেছেন, আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, আপনি আত্মার কি প্রমাণ পেয়েছেন বলুন—

তবুও কেন যেন কোন কথা বলল না বন্ধু। শুধু তার কোঁচকানো চোখদুটো কেমন ছলছল করতে লাগল। আস্তে আস্তে ঝাপসা গলায় বলল, আমার স্ত্রী খুব লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে ছিল ভাই। ওর কথা বলতে গেলেই এখনও আমার সব কেমন গুলিয়ে যায়—আবার হঠাৎ থেমে গেল। বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খুব আস্তে আস্তে বলল,—সেদিনও খুব সকালেই বড়বাজারের গদীতে গিয়েছিলাম। রোজ যেমন যাই একটু থেমে আবার বলল, সকালে আড়তে অনেক কাজ থাকে—কাউকে পাঠাতে হয় পাটনায়, পেঁয়াজ কিনতে, আবার কাউকে পাঠাতে হয় তাগ দায়—খুব ব্যস্ত হয়ে এসব কাজ করছি এমন সময় ঘটে গেল একটা অদ্ভুত কাণ্ড—আচমকা আবার থেমে গেল। আর দু' চোখে ফুটে উঠল কেমন উদাস আর সুদূর দৃষ্টি। যেন মনে হল দূর কোন অজানালোকের অদৃশ্য কোন কিছু সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

কাজের ভেতরে ডুবে গিয়েছিল সেদিন। বর্ধমান থেকে হুগলী থেকে আরও দূর দূর থেকে পাইকারী খরিদ্দারও এসেছিল অনেক—তাদের মাল বিক্রি করে টাকা বুঝে নিয়ে ক্যাশবাকসে রাখছিল। এমন সময় হঠাৎ রাস্তার দিকে তাকাতেই ধক করে উঠল তার বুকের ভেতরটা। বড়বাজারের পাথর বাঁধানো সেই সরু গলিতে ঠেলাগাড়ি আর ঝাঁকামুটে এবং লোক গিসগিস ঠাসা ভিড়ের ভেতরে যেন সাদা ফটফটে কাপড় পরা এক লম্বা ছিপছিপে স্ত্রীলোকের ছায়াদেহ মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়েই ঝাঁ ঝাঁ রোদে আর ধুলোয় মিলিয়ে গেল!

তার শরীর অবশ হয়ে এল। ঝিমঝিম করতে লাগল তার মাথার ভেতরটা আর সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ একটা শূন্যতা তার বুকের ভেতরে হাহাকারের মত বেজে যেতে লাগল। নেই—অমলা আর নেই। তার সঙ্গে আর দেখা হবে না। হতে পারে না—এসব ভাবতে ভাবতে ঝড়ের গতিতে বাড়িতে ফিরে এল। আর একেবারে ভূত দেখার মত চমকে উঠল—এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল সেই বহুদর্শী বৃদ্ধ।

কি দেখেছিলেন?

বিছানায় শুয়েই ছিল—যেমন থাকে আস্তে আস্তে বলেছিল, প্রাণটা তখনো বেরিয়ে যায়নি। গলার কাছে উঠে এসে ধুক পুক করছিল—পুরানো দিনের সেই দুঃখের কথা বলতে বলতে গভীর ব্যথায় আড়ষ্ঠ হয়ে গেল তার গলার স্বর।

বিরাশী বছর বয়স হয়েছে তার। কত ঘাটের জল খেয়ে খেয়ে পোড় খাওয়া জীবন তার। তবু আজও তার কাছে রহস্য মনে হয় অমলার মৃত্যুর কয়েকমুহূর্ত আগে সেই অদ্ভুত আচরণ।

সেই অবস্থাতেই তার স্ত্রী তাকে ইসারায় ডেকেছিল। সে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলেছিল, কিছু বলছ?

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার! কোথায় কোন ঘরের কোন কোণে কুলুঙ্গীর ভেতরে সংসার খরচের থেকে বাঁচিয়ে পাঁচ হাজার টাকা রেখেছে; কোন কোন গরুর বাচ্চা হবে কোন মাসে এসব র ঠ করে বলল। একটু থামল। হাঁপাতে লাগল। তারপর বলল তোমরা খেয়ে নাও এখুনি। কিছুক্ষণ পরে আমি থাকব না—

সে তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। কী অস্বাভাবিক উজ্জ্বল আর তীক্ষ্ন তার চোখদুটো। সেখানে মৃত্যুর কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। অথচ—এসব তুমি কী বলছ, কঁকিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল সে।

তবুও খাওয়াদাওয়া শেষ করে রোগীর ঘরে ফিরে আসতেই বলেছিল, এবার ঠাকুরের প্রসাদী ফুল আর চরণামৃত নিয়ে এস—

যন্ত্রচালিতের মত ঠাকুরঘর থেকে সেসব নিয়ে এসেছিল। চরণামৃত খাইয়ে যেই প্রসাদী ফুল মাথায় স্পর্শ করালো অমনি বালিশের একদিকে মাথাটা এলিয়ে দিল। ব্যস সব শেষ হয়ে গেল। থেমে গেল বৃদ্ধ। কুঞ্চিত চোখদুটোর কোণায় কোণায় জল চিক চিক করতে লাগল।

কিন্তু এই ঘটনায় আত্মার অস্তিত্বের কি প্রমাণ পাওয়া গেল। আমার মনটা যখন ধাঁধার ভেতরে ঘুরপাক খেয়ে চলেছিল তখুনি সেই বৃদ্ধ বলেছিল, আপনি কি বলবেন জানি না। আমার বিশ্বাস অমলা মারা গিয়েছিল সেই সকালেই যখন বড়বাজারের সেই ভিড়ে ঠাসা গলিতে আমাকে দেখা দিয়েছিল, থেমে গেল সে। আর দূরে ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে যাওয়া কিউয়ের

দিকে কেমন শূন্য আর উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের ভেতরে মগ্ন থেকে বলল, তখুনি তার জড়দেহের খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল তার আত্মাটা। আবার সেই হাওড়া থেকে সরাসরি তাতে ফিরে এসে অমলার মুখ দিয়েই ওসব টাকাপয়সা গয়নাগাঁটির প্রয়োজনীয় কথাগুলো' বলেছিল। তার বলা শেষ হলে অমলার হল দৈহিক মৃত্যু—

আগে তাহলে কি মৃত্যু হয়েছিল ?

মৃত্যুও কি দুই রকমের হয় নাকি ?

যারা যারা কেরোসিন নেবেন তারা টিন হাতে নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ুন—পাড়ার কোন মস্তানের বাজখাঁই গলার আওয়াজ আর দারুণ হট্টগোলে শুনতে পেলাম না সে কি বলল।

এসব বলাবাহুল্য একজন অত্যন্ত সাধারণ লোকের সরল ও গভীর বিশ্বাসের আলোয় তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা। তার কোন কিছুই তুমি বিশ্বাস করতেও পার—নাও পার। তাতে কিছুই এসে যায় না।

তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েছ, মানুষের মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বলছি ওই অশীতিপর বৃদ্ধের সুদীর্ঘ বিবরণের ভেতর থেকে তুমি মাথায় রাখবে দুইটি অতি বিস্ময়কর ঘটনা—

(ক) সকালে সে যখন বড়বাজারে তার গদীতে বসে কাজ করছিল তখন রাস্তার ভিড়ের ভেতরে তার স্ত্রীর ছায়াদেহ হঠাৎ দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল।

(খ) মৃত্যু হয়েছিল সেই সকালেই যখন তার আত্মা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল। তারও পরে বাড়িতে তার 'দৈহিক মৃত্যু' হয়েছিল—

মৃত্যুরও কি রকমফের আছে ?

শোন—তোমাকে আর কি বলব, তুমি তো প্রেততত্ত্বের অনেক গবেষণার খবরাখবর রাখ বলেছ। তুমি কি ফরাসী স্পিরিচুয়্যালিস্ট মঁসিয়ে ফ্ল্যামারিয়নের নাম শুনেছ ? সারাটা জীবন তিনি পরলোকতত্ত্ব নিয়ে একটানা অনুশীলন করেছেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের গ্রামে-গঞ্জে জনপদেও ঘুরে ঘুরে বৃদ্ধ অভিজ্ঞ লোকদের জিজ্ঞাসা করে অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তাছাড়া তিনি প্রেততত্ত্বের খ্যাতিমান গবেষক বলেই জার্মানী, ইটালী, সুইডেন এবং আরও নানা দেশ থেকে অপরিচিত পত্রলেখকরা তাদের রোমাঞ্চকর অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে চিঠি লিখত—

আলেক্সিস আরবোসফ
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট
গভর্ণমেণ্ট অফ পেসকফ
রাশিয়া

শ্রদ্ধেয় সুধী !   ২রা অক্টোবর, ১৮৯৯

আমি আপনার অপরিচিত। আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। আপনি পৃথিবীর দিকে দিকে 'স্পিরিট বা সোল' অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধে যেসব বিচিত্র তথ্য প্রচারিত করছেন সেসব দেখেশুনে আমার বার বার মনে হয়েছে পাঁচ বছর আগে আমার জীবনে যে অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটেছে তা আপনাকে জানানো খুব উচিত ! সাইকিকফোর্স', টেলিপ্যাথি, স্পিরিট কমিউনিকেশান, হলুসিনেশান ইত্যাদি আরো অনেক বৈজ্ঞানিক টার্ম আপনার লেখায় দেখেছি। আমি জানি না—আমার জীবনের বিচিত্র এই অভিজ্ঞতাকে আপনি কি ক্যাটাগরিতে ফেলবেন। কিন্তু—

সবচেয়ে আগে জানানো দরকার—আমার পরিচয়। আমি একজন সরকারী কর্মচারী। পেসকফ প্রদেশের কম জেলার একজন জুনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটই শুধু নয়—আঞ্চলিক বিচারক বা টেরিটোরিয়্যাল জাজও বটে। চলতি সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার বয়স পঁয়ত্রিশের কোঠায় পেঁছেছে ! স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভাল। কখনো কোনদিন কোন অলৌকিক কোন ঘটনা দেখিনি ; এমন কি কোনদিন কোন দৃষ্টিবিভ্রম বা শ্রুতিবিভ্রমও হয়নি। কোনদিন দুঃস্বপ্ন দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। সত্যি বলতে কি, আপনাদের ওই ভূতপ্রেতে আমার এতটুকু বিশ্বাস নেই। আর পরলোকতত্ত্ব, জন্মান্তর মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে বিভিন্ন রকমের থিয়োরী আমার কাছে কেমন ধোঁয়াটে মনে হয়। কিন্তু—

বছর পাঁচেক আগে এমন একটা আশ্চর্য আর অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল, তারপর থেকে আমি আর কিছুই নস্যাৎ করে উড়িয়ে দিতে পারি না। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে একটু একটু ইণ্টারেস্টও হয়েছে। সেইজন্যই আপনাকে ঘটনাটা জানাতে চাইছি। কিন্তু সেই একেবারেই অতিপ্রাকৃত বা বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না গোছের ব্যাপারটা বলার আগে আপনার জানা দরকার আমার ফ্যামিলি স্ট্যাটাসটা।

যদিও যথেষ্ট দায়িত্বপূর্ণ পদে সরকারী চাকরি করি আমি, আমার সেই কাজের অবসরে নিয়মিত প্রতিদিন আমার জমির চাষবাস দেখে থাকি। তাই শহরে আমি থাকি না। আমার খুব অসুবিধা হয় সদরে থাকলে। আমি কমের হেড কোয়ার্টার টাউন কলভডেপস্ক থেকে নব্বই মাইল উত্তরে নোকভে আমার স্টেট বা জমিদারীতেই বাস

করতাম মা-কে নিয়ে। ১৮৯৪ সালের ২০শে এপ্রিল আমার মা— নিকোলোয়িআনা আরবোসফ মারা গিয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৮। স্বাস্থ্যও ছিল বেশ ভাল—অনায়াসেই তাকে 'সাউণ্ড হেলথ' বলা যায়। একেবারেই বিনা নোটিশে মারা গিয়েছিলেন। সামান্য জ্বরজ্বাড়িও ছিল না। কিন্তু থাক সে কথা—

মা যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন, সেই সপ্তাহটা ছিল ইস্টারের উৎসবের সপ্তাহ। আমাদের এই অঞ্চলের গ্রামে-গঞ্জে প্রভু যীশুর কবর থেকে পুনরুত্থানের বা ইস্টারের পর্ব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে আমার এক বন্ধু তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিল। বন্ধুর বাড়ি আমার বাড়ি থেকে দুই কিলোমিটার দূরে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাদর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারিনি। গিয়েছিলাম।

বলা দরকার তার বাড়িতে যাওয়া এই প্রথম নয়। মাঝে মধ্যেই তার ওখানে আমি যেয়ে থাকি। যেদিন যাই সেদিন রাত্রিটা থেকে পরদিন সকালে বাড়ি ফিরে যাই। কিন্তু সেদিন কি হল, কেন যেন একটা অজানা অমঙ্গলের আশংকায় কিছুতেই আমি নাইট হল্ট করতে পারলাম না। বন্ধুর বাড়ির সকলের দারুণ পীড়াপিড়ি সত্ত্বেও চলে এলাম। সেইদিনই সন্ধ্যায় বাড়িতে পেঁছে গেলাম। কিন্তু সারাটা পথ নিদারুণ একটা অস্বস্তিতে ছটফট করতে করতে এলাম। আসন্ন কোন ভয়ানক বিপদের আশংকায় আমার চেতনা কেমন আচ্ছন্ন হয়েছিল। আশ্চর্য! ফিরে এসে দেখলাম, কোথাও কিছু নেই। সব ঠিক আছে। মা বেশ বহাল তবিয়তে আমার কয়েকজন প্রতিবেশী বন্ধুর সঙ্গে তাস খেলছেন। মা প্রায়ই মাথা ধরায় দারুণ কষ্ট পান। তাই বললাম—কী ব্যাপার—তুমি কেমন আছ মা?

এক রকম আছি বাবা—তা তুই যে চলে এলি?

তোমাকে ছেড়ে থাকতে ভাল লাগল না মা—

মা চুপ করে থাকলেন। কেমন শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ঝাপসা আর অস্পষ্ট গলায় বললেন ভালই করেছিস—

আমি মা-কে আর বন্ধুদের শুভরাত্রি জানিয়ে আমার ঘরে চলে গেলাম। ক্লান্তিতে আমার শরীর ভেঙ্গে আসছিল। বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়া মাত্র গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

পরদিন সকালে (২০শে এপ্রিল) আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল নিদারুণ এক দুঃস্বপ্ন দেখে। আমার সারা শরীর ভয়ে উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। সত্যি বলতে কি—যা দেখেছি তা কিন্তু স্বপ্ন নয়—রীতিমত একটা প্রত্যক্ষ দৃশ্য!

ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘড়িতে দেখেছিলাম—সাড়ে সাতটা! আমি পরিষ্কার দেখলাম, মা ধীর পায়ে আমার খাটের কাছে এগিয়ে আসছেন। আমার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে আমাকে দেখলেন। তারপর আমার কপালে আলগোছে একটা চুমু খেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। চলে যেতে যেতে অস্পষ্ট গলায় বললেন, আমি যাচ্ছি বাবা—আমি মারা যাচ্ছি—বিদায়—

মার মূর্তিটা মিলিয়ে যেতেই ঘুম থেকে জেগে ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। এ কী দেখলাম! মা-কে তো গতকাল সন্ধ্যাতেই দিব্যি ভাল দেখেছি—না-স্বপ্ন-স্বপ্ন-স্রেফ স্বপ্ন! কখনো সত্যি হতে পারে না—এসব ভেবে মনকে শান্ত করতে করতে আমি ছুটলাম মা-র ঘরের দিকে। মা-র ঘরটা আমার কুঠুরী থেকে তিনচারটে ঘর পরে কিন্তু—

যেতে পারলাম না। পা দুটো যেন আটকে গেল। মা-র ঘর থেকে তুমুল কান্নাকাটির আওয়াজ ভেসে আসছে। আমার বুকের ভেতরে ধক করে উঠল। মা-র একান্ত পরিচারিকা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে আমাকে বলল, মঁসিয়ে ম্যাডাম এইমাত্র মারা গেলেন।

বাড়ির ভৃত্যদের কাছে শুনলাম, মা আজ সকালে সাতটাতেই ঘুম থেকে উঠেছিলেন। প্রথমেই তাঁর নাতিনাতনীদের ঘরে গিয়েছিলেন। তাঁর খুব আদরের ছোট নাতনীকে চুমু খেয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসেছিলেন। তারপরে তার প্রতিদিনের নিয়ম অনুসারে তাঁর ঘরের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে প্রভাতী প্রার্থনার শেষে যেই মাটিতে লুটিয়ে প্রভু যীশুর প্রতিকৃতিকে ভক্তিভরে প্রণতি জানাতে যাবেন অমনি কে জানে কিসের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠেছিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে বুক চেপে ধরেই মাটিতে টলে পড়ে গিয়েছিলেন। তারপরেই সব শেষ! তখন ঘড়িতে সাড়ে সাতটা—ঠিক যখন আমি মা-কে দেখেছিলাম।

ডাক্তার বলেছিলেন, হঠাৎ রক্তবাহী নালী বা ব্লাডভেসেল ফেটে মারা গিয়েছেন। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে মৃত্যুর মুহূর্তেই কি মা-র স্পিরিট আমাকে দেখা দিয়ে তাঁর মারা যাওয়ার খবর আমাকে দিয়ে যান? এও কি সম্ভব? সত্যিই কি মানুষের আত্মা তার প্রিয়জনের কাছে এইভাবে এসে দেখা দিতে পারে? অনুগ্রহ করে আমার এইসব প্রশ্নের উত্তর এবং এই আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনার ওপর আপনার মতামত দিয়ে চিঠি দিলে অত্যন্ত উপকৃত হব।

যদি মনে করেন, পরলোকতত্ত্বের সম্বন্ধে আপনার মূল্যবান ও বৈচিত্র্যময় গবেষণার জন্য আমি আরও কিছু চমকপ্রদ উপাদান দিতে পারি—ইতি—

তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, ফ্ল্যামারিয়ান সাহেবের বই থেকেরাশিয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠিটা হুবহু তুলে তোমাকে পাঠালাম। বলাবাহুল্য তিনি অত্যন্ত সৎ এবং নিষ্ঠাবান প্রেততত্ত্ববিদ তাই পত্রলেখক আরবোসফকে তাঁর সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছিলেন এবং মৃত্যুর সময়ে মা-কে দেখতে পাওয়ার সেই অতি-প্রাকৃত ঘটনার একটি অত্যন্ত সুচিন্তিত ও মূল্যবান ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। আর তুমি শুনলে যেমন অবাক তেমনি খুশি হবে জেনে তাঁর সেই ক্লনকুশান বা সিদ্ধান্ত একেবারেই 'সায়েন্টিফিক'—পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সেই আশ্চর্য স্বপ্নের কার্যকারণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন—কিন্তু তার আগে—

চল আবার আমরা সরসুনার পঞ্চানন্দের পূজারী সেই শীতল সাহার কাছে ফিরে যাই। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আরবোসফ যেমন তার মায়ের তেমনি শীতলও মৃত্যুর ঠিক আগে তার স্ত্রীর ছায়াদেহ দেখতে পেয়েছিল। চিন্তা করে দেখেছ, দেশকালের ব্যবধান এড়িয়ে দুটো একেবারে একরকমের অলৌকিক ঘটনা ঘটে কি করে?

'না মোটেই অলৌকিক কি অতিপ্রাকৃত নয়', স্পষ্টই বলেছেন পরলোকতত্ত্বের প্রখ্যাত গবেষক ফ্ল্যামারিয়ান। কেন?

It was in spirit that this mother made herself felt to her son and this psychic action of her brain was exposed by her image. অর্থাৎ এই মা (আরবোসফের) তাঁর সুতীব্র চিন্তা দিয়ে তাঁর আত্মার ভেতরে পুত্রের প্রতি গভীর মমতায় স্নেহময়ী এক জননীর মূর্তি রচনা করেছিল। তাঁর মস্তিষ্কের এই দৃঢ় মনসংযোগই বা সাইকিক অ্যাকশানই তাঁর মূর্তিকে পরিস্ফুট করে তুলেছিল ছেলের কাছে—

তুমি তো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ ঠিক এমনি করে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা ছিল না বড়বাজারের পেঁয়াজের কারবারী শীতলের। সে তার সহজাত বোধবুদ্ধি এবং মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বের প্রতি গভীর বিশ্বাস নিয়ে শুধু বলেছিল, ভাই আমি তো একটা আকাঠ মুখ্যু মানুষ। তবে আমার বাবা ছিলেন খুব গুণী লোক। বড় কবিরাজ ছিলেন। রোগীর নাড়ি দেখে নিদেন হাঁকতে পারতেন, একটু থামল বৃদ্ধ। সাবেক দিনের সুখস্মৃতির আলোয় মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আবার আস্তে আস্তে বলল, বাবা বলতেন, মানুষের আত্মা তিনরকমের—

তিনরকমের?

স্থূল দেহের আত্মা, বাসনাময় আত্মা আর ভাবনাময় আত্মা, হঠাৎ থেমে গিয়েছিল বৃদ্ধ। আবার আস্তে আস্তে বলেছিল, মৃত্যুর বেশ কিছুক্ষণ আগে ওই বাসনাময় আত্মাটাই মরদেহের খাঁচা থেকে বেরিয়ে যায় আর সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে সময় সময় প্রিয়জনকে দেখা দেয়—

—মৃত্যুও নানারকমের আছে বলেছিলেন।

—হ্যাঁ ভাই। দেহ-ই যে দু'রকমের—রক্তমাংসের এই জড়দেহ আর

প্রাণময় দেহ, আবার থেমে গিয়েছিল সে। কেন যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যেন আমার অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলেছিল, আপনি ভূত প্রেত বিশ্বাস করেন ?

বিশ্বাস করার মত কোন কারণ এখন পর্যন্ত খুঁজে পাইনি—

না—না করবেন না—করবেন না। আমার মত একদিন ঠোক্কর খেয়ে করবেন। আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে বলেছিল, ভূতপ্রেতের আসল রহস্যটা জেনে রাখুন—কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে বলেছিল—মরণ যখন ঘনিয়ে আসে তখন প্রাণময় দেহটা যার ভেতরে মানুষের আত্মা বা চৈতন্য থাকে—সেটাই জড়দেহ থেকে বেরিয়ে চলে যায়। তখন হল চৈতন্যের সাময়িক মৃত্যু, একটু থেমে আবার অস্পষ্ট কণ্ঠে বলেছিল, চৈতন্যের তো পুরোপুরি মৃত্যু কখনো হয় না—

আর একটা মৃত্যু ?

খুব সোজা—প্রাণময় দেহটা যখন বেরিয়ে যায় তখনো মানুষের হৃদপিণ্ডের ধুকধুকি থাকে, কিন্তু যেই থেমে যায়, তখুনি হল দৈহিক মৃত্যু—

এসবের ভেতরে তাহলে ভূতপ্রেতের রহস্য কি হল ?

কোন কথা বলল না বৃদ্ধ খুক খুক করে হাসল। ব্যঙ্গের হাসি। করুণার হাসি।

একটু কষ্ট করে এই কাছেই নাটোর কলোনীতে আমার পঞ্চানন্দ ঠাকুরের মন্দিরে যাবেন যে কোন অমাবস্যার রাত্রে। খুব গম্ভীর হয়ে বলেছিল আপনাকে ভূতপ্রেত বা আত্মার ব্যাপারস্যাপার দেখাবার চেষ্টা করব—

বলাবাহুল্য আমি যাইনি। যেতে মন চায়নি। তারপরে শুনেছিলাম, লোকটা নাকি সত্যিই খুব গুণী লোক। অমবস্যার রাত্রে পুজো করতে করতে কেমন সমাধিস্থ হয়ে যায়। লোকে বলে ঠাকুর পঞ্চানন্দ—স্বয়ং তার ওপর ভর করে। তখন নাকি দৈববাণীর মত করে অনেক কথা বলে। অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির ওষুধও বলে দেয়। তারপর—

রাত বাড়ে। নিশুতি হয়ে যায় চারিদিক। দর্শনার্থী ভক্তরা একে একে সবাই চলে যায় তখন নাকি শীতল তার অন্ধকার আমবাগানের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে যেন কাদের সঙ্গে কথা বলে! সে কি অজানালোকের সেই অশরীরিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ?

কিন্তু সে যাই করুক। কিন্তু তার সেই উক্তি মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে তখন আত্মার আবাসস্থল সেই প্রাণময় দেহটা জড়দেহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেয়ে সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে আপনজনকে দেখা দিতে পারে—যে কতখানি সত্যি তার আর একটা ঘটনা তোমাকে বলছি লণ্ডন স্পিরিচুয়্যালিস্ট সোসাইটির গবেষণ র প্রসিডিংস বা কার্যবিবরণী থেকে।

অসামান্য রূপসী আর অভিজাত এক ফরাসী মহিলার জীবনে এই অদ্ভুত ভয়ংকর আর অপার্থিব ঘটনা ঘটেছিল। জেনেভার লেকের ধারে সুরম্য সুদৃশ্য প্রকোষ্ঠে গভীর নিশুতি রাতে সেই ভয়াবহ দৃশ্য থেকে মর্মান্তিক

আর্তনাদ করে উঠেছিলেন। তার সেই ভয়ার্ত চিৎকারে শিউরে উঠেছিল লেকের জল আর রাত্রির স্তব্ধতা আড়ষ্ট ব্যথায় চমকে উঠেছিল।

এই তরুণী তাঁর আত্মস্মৃতিতে এই বিচিত্র ঘটনাটির বিশদ ও জীবন্ত বিবরণ দিয়েছিলেন। আর প্রেততত্ত্বের গবেষণার মূল্যবান উপাদান বলে লণ্ডনের পরলোকবাদীরা তাদের সমিতির প্রসিডিংসে সেই স্মৃতিকথাই পুরো উদ্ধৃত করে দিয়েছে। কিন্তু তার ওপরে সোসাইটি একটি ছোট্ট নোট দিয়েছে—

ঘটনাটির শিরোনাম—

'Before death, often apparitinons occur'

(ক) অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে প্রায়ই প্রেতের আবির্ভাব হয়।

(খ) যিনি এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর নাম—ডাচেস অফ অ্যাব্রানটিস (জন্ম ১৭৮৯—মৃত্যু ১৮৩৮)।

(গ) তাঁর স্বামী জুনোট ডিউক অফ' অ্যাব্রানটিস (জন্ম ১৭৭১— মৃত্যু ১৮১৩)।

জুনোট আত্মঘাতী হয়ে মারা যায়। কিন্তু আত্মহত্যা করার পরের মুহূর্তে কিন্তু মৃত্যুর আগে সে এসেছিল তার স্ত্রীর কাছে। সেই অতি অদ্ভুত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ডাচেস অফ অ্যাব্রাণ্টিস তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর স্মৃতিকথায়।

ডাচেস অফ অ্যাব্রনটিস অপরূপ—সুন্দরী লরার জবানীতেই তোমাকে বলছি সেই বিচিত্র ঘটনার বৃত্তান্তঃ—

২২শে জুলাই। নিশুতি রাত থমথম করছিল। আমার জানলার নিচেই জেনেভা লেকের জল নক্ষত্রের ছায়া বুকে নিয়ে দুলছিল। কেন যেন কিছুতেই ঘুম আসছিল না। মনের ভেতরে বার বার তার ধারাল মুখখানাই ভেসে ভেসে উঠছিল। আমার স্বামী জুনোট ফরাসী সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল। অ্যাব্রেণ্টিস নগর অধিকার করেই ডিউক উপাধি পেয়েছিল এই সম্মান তাকে দিয়েছিলেন স্বয়ং সম্রাট নেপোলিয়ন। কিন্তু যেই স্পেনের যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় হল অমনি তার ভাগ্যের চাকাও ঘুরে গেল নেপোলিয়নের আস্থা হারাল। ভাল করে কথা পর্যন্ত বলত না শুনেছি ওকে বিষনজরে দেখছেন। যে কোনদিন কোন অজুহাতে চাকরি থেকে ছাঁটাইও করে দিতে পারেন।

লরা আমি কি করব বল, উত্তেজনায় আর দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে আমাকে বলেছিলেন জুনোট। তিনি একজন পাকা যোদ্ধা হয়েও কেন—কেন বুঝতে পারছেন না—স্পেনের যুদ্ধে হেরে যাওয়ার জন্য আমি দায়ী নই—

তুমি কিছু ভেব না—সব ঠিক হয়ে যাবে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম আর কি-ই বা বলতে পারি।

শোকে দুঃখে কেমন উদভ্রান্তের মত হয়ে গিয়েছিল। চব্বিশঘণ্টা ও

একটা বিষয় নিয়ে রুড করত। রকমসকম দেখে আমার ভাল লাগল না। ওর বিপর্যস্ত মনটাকে ঠিক করার জন্যই বলেছিলাম, যাও না, তোমার বাবার কাছে মণ্টারব্যাণ্ডে কিছুদিন ঘুরে এস—

আমার প্রস্তাবে সে খুশি হল। চলে গেল মণ্টারব্যাণ্ডে। কে-ই বা জানে—কি করছে—কেমন আছে—

এসব চিন্তাই কুরে কুরে খেয়ে ফেলছিল মনটাকে। ওদিকে প্রহরে প্রহরে রাত বেড়ে চলেছিল। নিস্তব্ধ ঘরে দেওয়ালঘড়ির পেণ্ডুলাম বেজে চলেছিল একটানা-টক্-টক্-টক্-টক্-সেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওয়ান টু গুণে গুণে (ডাক্তারের নির্দেশমত) ঘুমোতে চেষ্টা করলাম। কিসের ?

মাথার ভেতরে যেন আগুনের ঝড় বয়ে চলেছে। আমার হঠাৎ মনে হল, হয়ত আমার জ্বর আসছে—খুব বেশি জ্বর। তবুও জ্বরো রোগীর মত যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতেই বিছানায় পড়ে রইলাম। বোধহয় একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। ঘুমে জড়িয়ে গিয়েছিল চোখদুটো। কিন্তু—

সেই কাল রাত্রে আমার কপালে ঘুম লেখা ছিল না। হঠাৎ কে জানে, কোথা থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া আছড়ে পড়ল আমার ঘরে। কিন্তু জানলা তো বন্ধই ছিল বাতাস এল কোথা থেকে! এসব ভাবতে ভাবতেই আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল আর নিদারুণ একটা ভয়ের শিহরণে শির শির করে উঠল আমার শরীরের ভেতরটা। আমার তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল। আমি উঠে বসলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে হিম হয়ে গেল আমার বুকের রক্ত।

এ কী! আমার বিছানা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে জুনোট! তার পরণে যেটা পরে মণ্টারব্যাণ্ডে রওনা হয়েছিল সেই ধূসর রঙের কোট। তার চোখে কেমন শান্ত বিষন্ন দৃষ্টি। আমি আতঙ্কে ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম—তুমি—তুমি কি করে এত রাত্রে এলে ? আমার ভয়ে সিটিয়ে যাওয়া গলার আওয়াজ পেয়ে আমার হেড চেম্বারমেড (শয়নকক্ষের প্রধান পরিচারিকা) ব্ল্যাণ্ডক ছুটে এল। পাশের ঘর থেকে আমার কাকীমা থমারিজ বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে ছুটে আসতে আসতে চিৎকার করে বলল, কি-কি হয়েছে লরা—

আশ্চর্য! লোকজনের সাড়া পেয়েও কিন্তু সেই রহস্যময় ছায়াদেহ যেমন ছিল, যেখানে ছিল সেইখানেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ব্লাণ্ডক এবং কাকীমা নিশ্চয়ই সেই ছায়ামূর্তি দেখতে পাচ্ছে না। নজরে পড়লে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করতো। কিন্তু—

আমি স্পষ্ট দেখছি ঘরের আবছায়া অন্ধকারের পটভূমিতে আরো এক ছোপ কালো সেই ছায়াশরীর! তার মুখখানা কেমন ম্লান বিবর্ণ। গভীর এক বিষাদের ছায়া থম থম করছে সে-মুখে। আমার বুকের ভেতরটা হঠাৎ দুলে উঠল। জুনোট কি মারা গিয়েছে?

আমার হঠাৎ মনে হল, এই মাটির পৃথিবীর জীবন থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি। না—না—জুনোট আর নেই—থাকতে পারে না। তার সঙ্গে আমার লোকান্তপারের ব্যবধান। তা নাহলে সে অশরীরি প্রেতাত্মার মত হাওয়ার ওপর পা ফেলে নিঃশব্দে আমার চারদিক বন্ধ-করা ঘরে আসবে কি করে।

উঃ মা-গো! অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলাম (জোরে চেঁচিয়ে উঠলে কাকীমারা ভয় পাবে)। জুনোটের প্রেতমূর্তি ধীর পায়ে আমার বিছানার চারিদিকে রাউণ্ড দিতে লাগল! আমার মনে হল—আমার হৃদপিণ্ডটা বুঝি এখুনি ছিটকে বেরিয়ে আসবে! সেই টালমাটাল অবস্থার ভেতরেও লক্ষ্য করলাম—জুনোটের ডান পাটা ভাঙ্গা!

আশ্চর্য ওর পা ভাঙ্গল কবে? কৈ শ্বশুরমশাই বা দেওররা কেউ তো কিছু আমাকে জানায়নি! হয়ত আমি হার্টের রোগী বলেই দুঃসংবাদটা আমাকে চেপে গিয়েছে।

সেই ভাঙ্গা পা নিয়ে নেংচে নেংচে আমার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল সেই প্রেতচ্ছায়া! চোখের দুটো অন্ধকার কোটর থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে জ্বলন্ত দৃষ্টি। আর সেই দৃষ্টি আমার দিকেই স্থির রেখে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে!

ভয়ে আমার চেতনা একেবারে অসাড় হয়ে গেল। এখুনি—এখুনি—আমার গলা টিপে ধরবে। আমি এক পা—এক পা করে পেছিয়ে যেতে লাগলাম। আমার মনে হল যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে! আর আমার দেহটা অত্যন্ত ভারি অনড় শবদেহের মত হয়ে যেন কালো জলের স্রোতে ভরা বিশাল এক গহ্বরে নেমে যাচ্ছে। আমি কিছুতেই বহু চেষ্টা করেও ইটের মত ভারি শরীরটাকে ওপরে তুলে আনতে পারছি না। আমার নিজের ওপরে এতটুকু বশ নেই! এক ফোঁটা জোরও নেই দেহে। অতএব—

সেই অন্ধকার খাদের কালো জলে ডুবে যাচ্ছি—আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আশ্চর্য তখনও দেখলাম, জুনোটের প্রেতমূর্তি আমার দিকে চোখ ঠিক রেখে এগিয়েই আসছে! আমি আর পারলাম না। সমস্ত শক্তি দিয়ে ডুবন্ত মানুষের মত ককিয়ে চিৎকার করে বললাম—আমাকে—বাঁচাও—বাঁচাও—ঘরের সব আলো জ্বালিয়ে দাও—শীগ্‌গীর আলো দাও—অনেক—অনেক আলো—বাতাস—

সেই থেকে তুই যে কেমন করছিস, কাকে দেখছিস কাকীমা থমারীজ বিড় বিড় করে বলল, কৈ আমি তো কিছুই—বলতে বলতে হয়ত আমার ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। দেওয়াল গিরির সমস্ত মোমবাতিগুলো জ্বালিয়ে দিল ব্র্যাণ্ডিক! কিন্তু—

আশ্চর্য সেই আলোয় ভেসে যাওয়া ঘরেও কিন্তু সেই রহস্যময় ছায়াশরীর অদৃশ্য হয়ে গেল না। কিন্তু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার দিকে আর

কিন্তু এগিয়ে এল না। আস্তে আস্তে ঘরের কোণের জমাট অন্ধকারে নিজেকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইল। আর কালো কালো ছায়া দিয়ে গড়া বড় বড় আঙ্গুলগুলো দুলিয়ে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। আমার মনে হল—মনে হল সে যেন আমাকে এক অজানা রাজ্যের অন্ধকারে নিয়ে যাবে বলে ডাকছে। আমার চারিদিকে মৃত্যুর কালো অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে—বন্ধ হয়ে আসছে আমার নিঃশ্বাস। আমার ফুসফুসটা ফেটে যেন বেরিয়ে এল তীক্ষ্ম একটা আর্তচিৎকার। সেই দীর্ঘায়িত করুণ আর্তনাদ আমার নিজের কাছেই কেমন নিষ্ঠুর মৃত্যুর নিদারুণ শূন্যতার মর্মান্তিক হাহাকারের মত শোনাল আর আমার মনে হয়েছিল মৃত্যুযন্ত্রণার এই গোঙানির পরেই আমার প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু—

তা হয়নি। ভয়ে উত্তেজনায় আতঙ্কে একেবারে বিকল হয়ে গিয়েও বেঁচেছিলাম। এক মুহূর্তের জন্যেও কিন্তু সেই প্রেতাত্মা আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়নি। অন্ধকারের আড়াল থেকেও আমাকে নজরবন্দী করে রেখেছিল। কিন্তু—

সবকিছুই একসময় শেষ হয়। ভয়ঙ্কর সেই বিভীষিকার সেই রাত্রিও শেষ হল। স্কাইলাইট দিয়ে ভোরের আলোর রেখা এসে পড়ল অন্ধকার ঘরে। সেই প্রেতচ্ছায়া ধূসর একটা মেঘের ধোঁয়ার মত হয়ে ধীরে ধীরে ঘরের আবছায়া অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

তার আটদিন পরে ৩০শে জুলাই মন্টারব্যান্ড থেকে আমার দেবর অ্যালবার্ট এসে জানাল নিদারুণ সেই দুর্ঘটনার খবর ২২শে জুলাই সন্ধ্যার পর জুনোট আত্মহত্যা করার জন্য তিনতলার বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়েছিল নিচে। ডান-পা-টা ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু মরে যাবে, কেউ ভাবেনি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ডাক্তাররা জানালেন মাথায় ইন্টারন্যাল হেমারেজ হয়েছে খুবই ফ্যাটাল। বাঁচার আসা খুব কম। সাতদিন সমানে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষনিঃশ্বাস ফেলেছে গতকাল। (২৯শে জুলাই)—এই কথাগুলো বলতে বলতে অ্যালবার্টের চোখদুটো ছল ছল করছিল। তারপরে কান্নায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঝাপসা গলায় বলেছিল শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তোমার কথাই বার বার বলছিল—

আর বল না—আর বল না অ্যালবার্ট, তীব্র যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠেছিলাম আমি। নিজেকে সংযত করে বলেছিলাম—আশ্চর্য জান সেদিন সে লাফিয়ে পড়ে সুসাইড করতে গিয়েছিল, সেই রাত্রেই তাকে আমি দেখেছি—সারারাত আমার ঘরেই ছিল—

কী বলছ তুমি?

অ্যালবার্ট বিশ্বাস করেনি। কেউ-ই করবে না। তাই আমার অভিজ্ঞতা —একান্ত আমারই থাক।

তারপরে প্রায় আটবছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু সেই অদ্ভুত ঘটনা আমি

কিছুতেই এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারি না। বিদেহী আত্মার দুর্নিবার আকর্ষণ থাকে তার প্রিয়জনের প্রতি। তাই মৃত্যুর অন্ধকার রাজ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার আগে সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে কখনও কখনও তার আপনজনকে দেখা দিয়ে যায়।

এসব আমি আগে বিশ্বাস করতাম না। এখন দৃঢ়ভাবেই করি—। believe this—believe it firmly.

অন্যপ্রসঙ্গে যাওয়ার আগে তোমাকে বলা দরকার, এই ডাচেস অফ অ্যাব্রানেটস—লরার এই আত্মস্মৃতি বা মেমোয়েরসের নিচে লণ্ডন স্পিরিচুয়্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের অনুসন্ধানকারী গবেষকদের ছিল একটি ছোট্ট মন্তব্য Mysteries of providence are too deep for eyes to penetrate. অর্থাৎ রহস্যের রাজ্য এত গভীর আর দুর্ভেদ্য যে আমাদের মত সাধারণ লোকের দৃষ্টি দিয়ে তা কখনো ভেদ করা যায় না।

তোমাকে আরও একটা ঘটনা বলি—

১৮৭৮ সালের মার্চ মাস। তারিখটা মনে নেই তার। রাত নিশুতি হয়ে গিয়েছিল। বোজানো—এক বিশাল কৃষি খামার বা এগ্রিকালচার্যাল ফার্মের মালিক! সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হয় তাকে। তাই অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। সেই ঘুমের ভেতরেই তার অত্যন্ত গরম মনে হতে লাগল। মার্চ মাসের শীতের শেষ রেশ থাকা সত্ত্বেও তার সারা শরীর ঘামে ভিজে উঠল। ঘুম ভেঙে গেল তার। বিছানায় উঠে বসল।

দূরে এক কোণে চুল্লী বা ফারনেসের আগুনের লালচে আভায় ঘরের জমাট অন্ধকার কেমন ফিকে হয়ে এসেছে। নাঃ—ফারনেস তো ঠিকই জ্বলছে নিভু নিভু হয়ে। যেমন জ্বলার কথা। তাহলে—তাহলে এত গরম লাগছে কেন? আশ্চর্য তো!

কে জানে হয়ত আকাশে মেঘ জমেছে। তার দোসর হয়েছে কুয়াশা। এরাই চক্রান্ত করে শীতের ঠাণ্ডা উত্তুরে বাতাসের টুঁটি চেপে ধরেছে। ওয়েদারের মাথা-মুণ্ডু বোঝা দায়। এই ঠাণ্ডা—এই কি গরম। শেষ রাতের দিকে বৃষ্টিও নেমে যেতে পারে। তাহলেই তার গমের চাষটা মাঠে মারা যাবে—এসব ভাবতে ভাবতেই তার চোখদুটো যেই আবার জড়িয়ে এসেছে অমনি চমকে উঠল সে। হিম হয়ে গেল তার বুকের রক্ত!

তার বিছানার মাথার দিকের দরজার ঠিক চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে সাদা ধবধবে একটা ছায়ামূর্তি। যেন জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া সেই মূর্তি! ধীর পায়ে এগিয়ে এল। তার বিছানার দিকেই চোখ রেখে আস্তে আস্তে ঘুরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল পায়ের দিকে।

কে—কে—তুমি। বলে চিৎকার করে উঠতে চেয়েছিল। কিন্তু পারল না।

গলা শুকিয়ে কাঠ। দারুণ ভয়ে আতঙ্কে কুঁকড়ে রইল। কিন্তু সে লক্ষ্য
রল—মূর্তির মুখ এবং সারা দেহ সাদা পর্দায় ঢাকা। হঠাৎ সেই রহস্যময়
য়াশরীর একটা হাত ওপরে তুলেই মুখের ওড়না সরিয়ে দিল আর মুহূর্তের
ন্য বিদ্যুৎচমকের মত ঝিকিয়ে উঠল একটি মুখ!

তার একান্ত প্রিয়জনের মুখ। তার আদরের ছোট বোনের মুখ!

এ—মিলি—এ—মি—লি! এ—মিলি—চিৎকার করে ডাকল—বোজানো। ন্তু সেই সাদা ফুটফুটে জ্যোৎস্নার দেহ রেখা দূরে ঘরের অন্ধকার কোণে হূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল!

ক্রা—ক্রা—ক্রা—একটা রাতচরা পাখি কর্কশ গলায় ডেকে উঠল।

বোজানোর মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করতে লাগল। তার বুকের ভেতর পিছে। এ কী স্বপ্ন? এমিলি তো তার কাছে এই বাড়িতেই আছে। বিব্য সুস্থসবল হাসিখুশি মেয়ে।

পরদিন। এমিলিকে কিছু বলল না। কিন্তু অস্বস্তিকর দুশ্চিন্তা কুরে রে খেয়ে ফেলতে লাগল তার মনটা। অশুভ আশংকায় ভার হয়ে উঠল তার কটা। শহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তারকে 'কল' দিয়ে নিয়ে এল। ডাক্তারবাবু নেকক্ষণ ধরে এমিলিকে পরীক্ষা করে বললেন—হার্টের অবস্থা খুব খারাপ— য় কোনদিন 'একসপায়ার' করতে পারে!

হলও তাই। দিন তিনেক পরেই একদিন ঘুমের ভেতরেই হার্টফেল করে রা গেল এমিলি। এ পর্যন্ত বলে বোজানো নিজে একটা মন্তব্য করেছে —"খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। আমার ছোট বোন এমিলির রীতিমত ভাল বাস্থ্য। ওর কোনদিন সামান্য অসুখবিসুখও দেখিনি। বরাবর আমাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানের কেয়ারেই ছিল। ভেতরে ভেতরে ওর এতবড় অসুখ বাসা বেঁধেছে—তিনি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেননি। তাই এমিলিকে নিয়ে মামার কোন চিন্তাই ছিল না। হয়ত তাই তাকে নিয়ে কখনো সুখস্বপ্ন ক দুঃস্বপ্ন কিছুই দেখিনি—আচ্ছা—সেদিন শেষরাতে কফিনের কাপড়ের সাদা ড়নায় মুখ ঢেকে যে আমাকে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল—সে কী আমাকে ছড়ে চলে যাবে বলেই?"

বোজানোর এই বৃত্তান্তটি নিউইয়র্কের ফিজিক্যাল সোসাইটিতে প্রেততত্ত্ববিদদের সমিতি) পাঠিয়েছিলেন ফ্রান্সের তথা ইউরোপের প্রখ্যাত বজ্ঞানিক ডক্টর জে. সি. রোমেনস। সমিতির কার্যবিবরণী বা প্রসিডিংসে (নবম ভাগের ৪৪০ পৃষ্ঠায়) এই চমকপ্রদ বিবরণটি ছাপাও হয়েছিল। •

ডক্টর রোমেনস বৈজ্ঞানিক হলেও স্পিরিচুয়ালিস্ট—অধ্যাত্মবাদী এবং প্রততত্ত্বের মস্ত পণ্ডিত। তিনি বোজানোর এই অদ্ভুত স্বপ্ন হ্যালুসিনেশানের ব্যাখ্যা করে বলেছেন—বোজানোর ছোট বোনের মৃত্যুর পূর্বাভাসকে কখনই নেছক গতানুগতিক দৃষ্টিবিভ্রম বা শ্রুতিবিভ্রম অর্থাৎ হ্যালুসিনেশান বলা

যায় না। হৃদরোগে আক্রান্ত এমিলির মনের অবচেতনায় আসন্ন মৃত্যুর চিন্তা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। স্মরণ রাখতে হবে, সুস্থ সচেতন ব্যক্তিদের (concious personality) মনে কখনই মৃত্যুর কথা উঁকিও দেয় না। এমিলি তার দাদা বোজানোকে গভীর ভাবে ভালবাসত, তার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ এবং সেই সঙ্গে অনিবার্য মৃত্যুর বেদনা মিলিয়ে সেই রাত্রে বোজানোর চোখের সামনে রহস্যময় সেই ছায়াদেহ পরিস্ফুট করে তুলেছিল। আরও বলা যায়, এমিলির তীব্র মৃত্যু চিন্তাই—তার দাদার মনের ওপরে একটা ছাপও ফেলেছিল—Produced an impression in brothers mind…তাহলে কফিনের মত সাদা ধবধবে বস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত মূর্তির কারণটা কি?

বোজানো যেটা দেখেছে সেটা এমিলির Etheric body. অর্থাৎ প্রত্যেক জড়দ্রব্যের সঙ্গেই আকাশ (Ether) ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যার সাহায্যে ওই পদার্থে শক্তির সঞ্চার হয়। মানুষেরও জড়দেহের সংলগ্ন ইথার বা আকাশ দিয়ে প্রাণময় দেহ তৈরি হয়—থিয়সফির ভাষায় তাকে Etheric double বলা হয়—দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বলেন—এই Etheric body বা প্রাণময় দেহ রূপালী সাদা চকচকে রজ্জুর মত একটা জিনিস দিয়ে জড়দেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। আর আকাশ পদার্থ বা ইথারের এই দেহ দেখতে জলের মতই স্বচ্ছ, আকাশের মেঘের মত সাদা His (Bozzano) sister, real duplicat on, borne as afluid body to her brother.

শোন, তুমি জানতে চেয়েছিলে ভূত আছে কিনা, জানতে চেয়েছিলে আত্মার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ—সেই সূত্রে আমি তোমাকে বলেছি রুশ অধ্যাত্মবাদী উস্পেনস্কির সেই অসুস্থ লোকটির কথা। মুমূর্ষু অবস্থাতেও যার স্পিরিট বা আত্মার শক্তি এতটুকু অবদমিত হয়নি, মৃত্যুর কয়েকমুহূর্ত আগেও যে সুস্থ মাথায় রাশি রাশি অংক করতে পেরেছিল। বলেছি। সরল সাধারণ মানুষ শীতল সাহার (স্ত্রীর সজ্ঞানে মৃত্যুক কেন্দ্র করে) মানুষের আত্মার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। আর মঁসিয়ে ফ্ল্যামারিয়ানের মত পৃথিবী বিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিদ, ডক্টর রোমেনসের মত প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও পরলোকবিদদের সত্যনিষ্ঠ গবেষণার আলোয় এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আরবোসোফ, ডাচেস অফ অ্যাব্রেনেটস লরা, কৃষিখামারের মালিক বোজানো প্রমুখদের কারো মা, কারো স্বামী এবং ছোট বোনের স্পিরিট বা প্রেতচ্ছায়া দেখার অলৌকিক ঘটনাও বলেছি তোমাকে। এসবই কি মানুষের আত্মায় অস্তিত্বের যথেষ্ঠ প্রমাণ নয়?

তোমাকে আর কি বলব, স্পিরিটের আবির্ভাব সম্বন্ধেও প্রেততত্ত্ববিদরা এমন সব চমকপ্রদ অনুশীলন করেছেন, তুমি শুনলে অবাক হবে। আবির্ভাব কথাটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। লক্ষ্য করলে দেখবে শীতল তার স্ত্রীর ছায়াদেহ বা স্পিরিট দেখেছিল তার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে। অবশ্য

শীতলের ভাষায় প্রাণময় দেহটা (আত্মা) জড় দেহের খাঁচা থেকে তখুনি বেরিয়ে গিয়েছিল। আরবোসোফ তার মা-র প্রেতাত্মা দেখেছিল ঠিক তার মৃত্যুর মুহূর্তে; লরা তার স্বামী জুনোটের প্রেতচ্ছায়া দেখেছিল মারা যাওয়ার এক সপ্তাহ আগে। মৃত্যুর কতক্ষণ আগে—কয়দিন, কয় সপ্তাহ আগে, যদি মারা যাওয়ার মুহূর্তে হয় তাহলে কয় সেকেণ্ড বা মিনিটের ব্যবধানে অশরীরি আত্মার ছায়ামূর্তি উপস্থিত হয়—এসব নিয়ে পরলোকবিদ বৈজ্ঞানিক এবং অধ্যাত্মবাদীরা অনেক ইকোয়েশান, পারমিউটেশান, কমবিনেশান অর্থাৎ বিস্তর জটিল আর বড় বড় অঙ্ক কষে স্থির করেছেন—If just at the moment of death, apparitions appear only after twelve seconds, অর্থাৎ মৃত্যুর মুহূর্তে যদি হয় মাত্র বার সেকেণ্ড পরে তার প্রেতাত্মা দেখা যায়। কিন্তু মৃত্যুর আগে এবং পরের কোন নির্দিষ্ট সময়ের বাঁধাবাঁধি নেই। সাতদিন কি দশদিন কি একমাস পরেও যেমন তেমনি আগেও স্পিরিট দেখা দিতে পারে। কিন্তু টাইমিং-এর এসব জটিল কচকচি থাক।

মারা যাওয়ার পরে তার প্রেতাত্মাকে দেখার ঘটনা নিশ্চয়ই তুমি অনেক জান আর সেটাই তো ন্যাচারাল কি না! তবুও তোমাকে একটা আশ্চর্য রোমাঞ্চকর ঘটনা না বলে থাকতে পারছি না—

ঘটনা ঘটেছিল সুদূর উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলায় বর্তমান শতকের একেবারে গোড়ার দিকে (১৯০২-০৩ সালে)—তখনকার দিনের কাগজ বঙ্গবাসীতে এবং বেঙ্গলীতে ছাপাও হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ। প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছিল তখনকার মানুষের মনে।

গুরুচরণ সরকার। ডাকসাইটে কবিরাজ। বাড়ি দিনাজপুরের মহকুমা বালুরঘাটের খুব কাছে সোদপুর গ্রামে। কিন্তু কবিরাজমশায় গ্রামে থাকেন না। থাকতে পারেন না। দিনাজপুর টাউনে তাঁর জমজমাট প্র্যাকটিশ। তাই তাঁকে সদরেই থাকতে হয়! তাঁর কাছে থাকেন স্ত্রী-কুমুদিনী। আর দুই ছেলে রমা আর সতীশ। তারা দিনাজপুর মহারাজা হাইস্কুলে পড়ে।

গ্রামের বাড়িতে থাকে তাঁর তিন মেয়ে। তাঁর বড়দা সখীচরণের তত্ত্বাবধানে। আর নিশ্চিন্ত হয়ে প্রাকটিশ করে গুরুচরণ। সকাল হতে না হতে দূরদূরান্তর থেকে পালকি করে ডুলি করে গরুর গাড়িতে করে রোগীরা আসে তার কাছে তার বাড়ির সামনে ছোট মাঠটায় গাড়ির ভিড় লেগে যায়। চারজন কমপাউণ্ডার ওষুধ দিয়ে শেষ করতে পারে না। রাধামাধব ঔষুধালয়ের আছে আরও চারজন সহকারী। তারা কেউ গ্রামে-গঞ্জে বনে বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে গাছগাছড়ার শিকড় বাকড় সংগ্রহ করে নিয়ে আসে, কেউ বা সেগুলো হামামদিস্তায় ফেলে পেষাই করে আবার কেউ বা ছোট ছোট খলে মেড়ে নানারকমের কবিরাজী ওষুধ তৈরি করে। গুরুচরণের ডিসপিনসারী

হামামদিস্তার আওয়াজে কমপাউণ্ডার আর কর্মীদের টুকরো কথায় অহোরাত্র মুখর হয়ে থাকে।

গুরুচরণ সরকার।

সাধারণ কবিরাজ নয়। বিস্ময়কর তাঁর নাড়ীজ্ঞান। অব্যর্থ তাঁর রোগনির্ণয়ের ক্ষমতা। রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করার সময় তাঁকে দেখে মনে হয়, যেন চোখ বুজে ধ্যান করছেন। তারপরে চোখদুটো খুলেই এমন নির্ভুল দিনে হাঁকেন যে সেই দিনক্ষণ আর পেরোয় না। রোগী মারা যায়।

সোদপুরের গা ঘেসে আর একটা ছোট গ্রাম কাশীপুকুর। কাশীপুকুরের মস্ত জোতদার সর্বেশ্বর ঘোষের মেয়ের বিয়ে। বাজনা বাজছে। পেট্রোম্যাক্সের আলোয় ঝলমল করছে সর্বেশ্বরের চকমিলানো বাড়ি। ভিয়েন থেকে রান্নার সুগন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে!

গুরুচরণ আশপাশের দশটা গাঁয়ের মাথা। তাই বিয়েবাড়িতে দেখাশোনা করতে এসেছেন। চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখছেন—বরযাত্রীদের থাকার জায়গা, নিমন্ত্রিতদের খাওয়ার জায়গা ইত্যাদি। কিন্তু কেন যেন ভিয়েনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ত্রিশ বত্রিশ বছরের একটা জওয়ান ছেলে একটা মস্ত বড় পরাতে করে হাঁই হাঁই করে ময়দা মাখছে। গা বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। কবিরাজমশায় খর চোখে তার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ডাকলেন—ছোকরা-শোন এদিকে—

ময়দা মাখা হাতেই ছেলেটা এল।

তুমি এখুনি বাড়ি চলে যাও—

ছেলেটি ভ্যাবাচাকা খেয়ে আমতা আমতা করে বলতে চেষ্টা করল, সর্বেশ্বর কাকার খুব অনুরোধ—মেয়ের বিয়ে—আমি—আমার তো শরীর ভাল—

এদিকে যা খুশি তাই হোক—আমি বলছি তুমি বাড়ি চলে যাও—বলেই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছেলেটির কপালের বিন্দু বিন্দু ঘামের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ছেলেটি চলে গেল।

ক্ষুণ্ণ মনে আস্তে আস্তে পা ফেলে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। আর বাড়িতে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে কম্প দিয়ে জ্বর এল। সেই জ্বর আর কোন ওষুধেই ছাড়ল না। তিনদিনের দিন সে মারা গেল।

পরে কবিরাজমশাই বলেছিলেন, আমি ওর ভেতরে সান্নিপাতিকের লক্ষণ দেখেছিলাম—তার সেই আশ্চর্য ক্ষমতা আর নির্ভুল অন্তদৃষ্টির আরো কত টুকরো টুকরো ঘটনা কিংবদন্তী হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল উত্তরবাংলার গ্রামে জনপদে।

কবিরাজী বা আয়ুর্বেদের সাধনা ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। আয়ুর্বেদ

শাস্ত্রের ওপরে খান তিনেক বইও লিখেছিলেন। বই তিনটি আজও রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির লাইব্রেরিতে (বাংলাদেশ) সযত্নে রক্ষিত আছে।

শুধু তাই নয়। তাঁর ছিল বহুমুখী প্রতিভা। কবিরাজী শাস্ত্রের অনুশীলনের ফাঁকে ফাঁকে পরলোকতত্ত্বের বইটই নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। শোনা যায়, নিজেই মিডিয়াম হয়ে অজানা এবং রহস্যময় পরকাল থেকে অশরীরি আত্মাদের আহবান করে নিয়ে এসে তাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলতেন।

কঠিন অসুখবিসুখ হলেই লোকে তার কাছে আসত। আর কেন যেন ওষুধ হাতে পেয়েও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত।

কি ব্যাপার? গুরুচরণের রক্তাভ বড় বড় দুটো চোখে প্রশ্ন ঘনিয়ে আসে—

আজ্ঞে দয়া করে আপনি যদি একবার পরী নামাতেন—

না—না—যখন তখন ওসব হয় নাকি? তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে গুরুচরণ।

আজ্ঞে—আমার একমাত্র ছেলে, বলতে বলতেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে লোকটা।

গুরুচরণকে রাজি হতে হয়। ঘরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে জানলা দরজা বন্ধ করে দেয়। ধূপধুনো জ্বালিয়ে ফুল বেলপাতা নিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকে গুরুচরণ। বাইরে বারান্দায় রোগা ছেলের বাবা এবং পাড়ার কৌতূহলী দর্শকরা জানলায় কান পেতে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

খট-খট-খট—অন্ধকার নিস্তব্ধ ঘরে পায়ের শব্দ শোনা যায়।

এসেছ? গুরুচরণ বলে, দেখ নিবারণের ছেলের কালাজ্বর বলেই ত মনে হচ্ছে—কালাজ্বরের ওষুধই দিয়েছি—সারবে ত?

ঠিক—ঠিক ওষুধ দিয়েছ—অস্পষ্ট আর ঝাপসা কথাগুলো কে যেন দূর থেকে বলল, সেরে যাবে—

কতদিন লাগবে?

মাসখানেক—বলেই সেই মৃদু কণ্ঠস্বর গাঢ় নিস্তব্ধতার ভেতরে তলিয়ে যায়।

এখানে তোমাকে বলা দরকার। গুরুচরণ সরকারের সেই প্রত্যক্ষ এবং রোমাঞ্চকর অলৌকিক ঘটনার সূত্রে তাঁর প্রেতচর্চার প্রসঙ্গে স্টাফ রিপোর্টার জানিয়েছে "—প্রেতাত্মা বা স্পিরিটের সঙ্গে কমিউনিকেশান করাকে উত্তরবঙ্গের গ্রাম্যভাষায় বলে পরী নামানো; কিন্তু গুরুচরণ কোন মন্ত্রবলে অশরীরি আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করে; কার আত্মা আসে এসব বিষয়ে কখনো মুখ খোলে না সে।"

গুরুচরণ মুখ না খুলুক। তুমি তো পরলোকতত্ত্বের অনেক কিছু খোঁজখবর রাখ। নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয় গত শতকের ছয়ের দশকে যখন নতুন চিন্তা, নতুন ভাবধারার জোয়ার এসেছিল তখন আমাদের দেশেও স্পিরিচুয়্যালিজম বা পারলৌকিক চর্চা শুরু হয়েছিল। ১৮৮০

সালে 'আলালের ঘরে দুলালের' লেখক—প্রথম বাংলা উপন্যাসের জনক এবং সুবিখ্যাত পরলোকবাদী প্যারীচাঁদ মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ চিন্তানায়কদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল ইউনাইটেড অ্যাসোসিয়েশান অফ স্পিরিচুয়্যালিষ্ট। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন এক ইংরেজ অধ্যাত্মবাদী জে. জি. মিউগেনস (Meugens)। মিউগেনস এবং প্যারীচাঁদ ও অন্যান্য সভ্যরা নিয়মিত প্রেতচক্রে বসতেন এবং অশরীরি আত্মার সঙ্গে শুধু যোগা-যোগ নয়—পরলোকতত্ত্ব নিয়ে রীতিমত দীর্ঘ সময় ধরে কথাবার্তাও বলতেন। তাঁদের প্রতিটি বৈঠকেরই রেকর্ড আছে—এখন থাক সেসব কথা। সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত তোমাকে প্রেততত্ত্বেরই অন্য কোন প্রসঙ্গে বলার বাসনা রইল।

এখন চল গুরুচরণের সেই বিচিত্র ঘটনার রহস্যে। গুরুচরণ আয়ুর্বেদবিশেষজ্ঞ। কবিরাজ। পরলোকবিদ। এহেন গুরুচরণই একদিন প্রেত নয়, প্রেতিনীর কবলে পড়ল। হ্যাঁ এবিষয়ে কোন ভুল নেই সে স্ত্রীলোক। পরনে ধবধবে সাদা শাড়ি। পাড় একটা আছে, লাল না হয় কালো অন্ধকার ঘরে ঠাহর করা যায়নি। মোটের ওপর সধবা। ভূতের কুলুজীতে শাঁখচুন্নী। আর তন্ত্রমতে শঙ্খী। তন্ত্রশাস্ত্রে আছে আরও অনেকরকম প্রেতাত্মার কথা। কিন্তু সেসব এখানে অপ্রাসঙ্গিক—

শোন এই শঙ্খী গুরুচরণকে দেখা দিয়ে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল, না একটুকরো ছায়ার মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল—সে সব কিছুই গুরুচরণ কাউকে বলেনি। না বললেও বাড়ির লোকের কাছে জানা যায় পরদিন প্রায় সারাটা দিনই গুরুচরণ কেমন আনমনা আর গম্ভীর হয়েছিল। ডিসপেনসারীতেও যায়নি। রোগীদের ফিরিয়ে দিয়েছিল। রাত্রে কুমুদিনীকে বলেছিল, দেখ—আমি একবার গ্রামে যাব—বুঝেছ?

এখন—এই পৌষ মাসে—এখন তোমার কত রোগী—

সব জানি, তোমার কিছু আর্থিক ক্ষতি হবে কুমুদ, গম্ভীর হয়ে বলল গুরুচরণ, তবুও যেতে হবে গাঁয়ে দাদা আছে—তিনটা মেয়ে আছে—আমার তো একটা কর্তব্য আছে—

গ্রামে গেল গুরুচরণ।

দাদা-বৌদি এবং মেয়েরা খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তিনমেয়ে তিনদিক থেকে ঘিরে ধরে আদুরে গলায় বলল, এবার আমাদের দিনাজপুর নিয়ে চল বাবা—কতদিন মা-কে দেখিনি—

কোন কথাই বলল না গুরুচরণ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বড়মেয়ে টুলুর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখতে লাগল। কে জানে, কয়েকদিন আগেই রাত্রির শেষ যামে স্বচক্ষে দেখা সেই সাদা ধবধবে শাড়ি পরা স্ত্রীলোকের আবছায়া মূর্তির সঙ্গে কোন মিল খুঁজছিল কি না।

কি দেখছ বাবা অমন করে?

গুরুচরণ যেন শুনতেই পেল না। দু'চোখ ভরে বড়মেয়েকে দেখতে

লাগল। যেন কখনো দেখেনি। আগুনের মত কী রূপ। কতই বা বয়স হবে ওর। চোদ্দও পেরোয়নি। এক্ষুনি—নিতান্ত কিশোরী মেয়েটির সুডৌল বাড়ন্ত দেহে সেই উদ্দাম আর সর্বনাশা যৌবনের হাতছানি।

গুরুচরণের বুকের ভেতরটা শির শির করে উঠল। ভোরের আকাশের মত স্নিগ্ধ শ্যামল গায়ের রঙে দেবীপ্রতিমার মত অনিন্দ্যসুন্দর মুখে কেমন সুদূর অপার্থিব সৌন্দর্য—না—না—লক্ষণ ভাল নয়—বুকের ভেতরটা যেন যন্ত্রণায় পুড়ে যেতে লাগল। ছুটে গেল দাদা সখীচরণের কাছে। দুইভাইতে অনেকক্ষণ কি যেন পরামর্শ হল। শেষে সখীচরণ বলল, তুই অত ভাবিস না তো গুরুচরণ—আমি তো—

দাদা যা বললাম মনে রেখ খুব সাবধানে রাখবে টুলুকে। কখনো ওকে কোথাও যেতে দেবে না—.

চলে গেল গুরুচরণ। চিন্তিত হল সখীচরণ। সে কি অমন বাড়বাড়ন্ত মেয়েটার ভেতরে মৃত্যুর লক্ষণ দেখতে পেয়েছে? না কি রিষ্টিযোগের মত কোন সর্বনাশা যোগ বা ফাঁড়া আছে—জানতে পেরেছে গণনা করে। ওর কথা তো কখনও ভুল হয় না। খুব সতর্ক হয়ে দিন কাটাতে লাগলেন সখীচরণ।

গুরুচরণ ফিরে গেল দিনাজপুরে বেশ পরিতৃপ্ত মন নিয়ে। নিজের চোখে দেখে এসেছে, মেয়েরা ভাল আছে। কিন্তু—

কয়েকদিন পরে কে জানে কিসের একটা অস্বস্তি কাঁটার মত বিঁধতে লাগল তার মনে। কুমুদিনীর আড়ালে ডিসপেনসারীতে বসে পাঁজি দেখে—অগ্রহায়ণ শেষ হতে আর সাতদিন বাকি। যদি পৌষ মাসটা ভালোয় ভালোয় পেরিয়ে যায় তাহলে টুলুমা-র দীর্ঘ পরমায়ু হবে।

কিন্তু তা হল না। নির্ভুল নিদেন হেঁকে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর সঠিক দিন যে বলে দিতে পারে, সে একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল নিজের ক্ষেত্রে। সে ডাকসাইটে কবিরাজ। পরলোকবাদী। জ্যোতিষী। তবু দুর্বার নিয়তির কাছে অসহায় হয়ে গিয়েছিল। শুধু বুকফাটা একটা নিঃশব্দ—হাহাকার মনের ভেতরে চেপে শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিল। শুধু তার গভীর বেদনার্ত মনের ভেতরে দাঁড়িয়ে কে যেন তর্জনী তুলে বারে বারে বলছিল, তোমার আয়ুর্বেদ, তোমার জ্যোতিষশাস্ত্র, পরলোকতত্ত্ব যত কিছুই জান না কেন, জানবে সবচেয়ে বড় হল অদৃষ্ট। বিধিলিপির রহস্য কিছুতেই জানা যায় না।

গুরুচরণের মনের সেই অস্বস্তি আরও তীব্র হয়ে উঠছিল। বাধ্য হয়ে কুমুদিনীকে বলতেই হল। সব শুনে বুদ্ধিমতী কুমুদিনী বলল, আমিই বরং যাই সোদপুরে—মেয়েদের কাছে থাকি গোটা পৌষ মাসটা—

গুরুচরণ খুশি হল। কুমুদিনী চলে গেল। আর সেই হল কাল।

স্ত্রী চলে যাওয়ার পরদিন থেকেই কেন যেন গুরুচরণ সধবা লবণের

উগ্র গন্ধ পেতে লাগল। তার মনে হল, কমপাউন্ডার পাঁচু নিশ্চয়ই কোন ওষুধ বিষুধ তৈরি করতে গিয়ে ফেলে দিয়েছে কিছু লবণ? গিয়ে দেখল, পাঁচু ভাস্কর লবণ তৈরি করার জন্য সামান্য কিছু নুন নিয়ে বসেছে সবে। কোথাও লবণ পড়ে নেই। চেম্বারে ফিরে এল। সেখানেও উত্তুরে বাতাস বয়ে নিয়ে আসতে লাগল উগ্র লবণাক্ত গন্ধ!

মৃত্যুর গন্ধ!

না-না-কোন ভুল নেই। অনিবার্য নিয়তির মত মৃত্যু আসছে লবণের তীব্র গন্ধ বহন করে। কিন্তু—কিন্তু নুনের গন্ধের সঙ্গে মরণের যোগাযোগ কি করে সম্ভব। মর্মের গভীরে ডুব দিয়ে ভাবে গুরুচরণ, বিদেহী আত্মা সময় সময় তার প্রিয় সুগন্ধ বহন করে নিয়ে আসে ইহলোকে। কিন্তু তার চেনাশোনা কারো লবণের গন্ধের প্রতি আসক্তি ছিল কিনা, চিন্তা করে বের করতে পারল না। তার আর দরকার ছিল না। কয়েকদিন বাদেই সব রহস্যের সমাধান হয়ে গেল।

সেদিন ডিসপেনসারীতে খুব ভিড় ছিল। সন্ধ্যে উতরে গেলেও রোগীদের অভিভাবক আত্মীয়-স্বজনে গম গম করছিল 'রাধামাধব ঔষধালয়'। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গিয়েছিল গুরুচরণ। বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্নার আলো বুকে নিয়ে স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল পৃথিবী।

প্রহরে প্রহরে রাত বেড়ে চলেছিল। এক সময় রাত্রি শেষের নিশানা দিয়ে পান্ডুর চাঁদ পশ্চিমের আকাশে হেলে পড়ল।

খুট্—ঘরের দরজা খুলে গেল। নিঃশব্দে পা টিপে টিপে সে এল। সেই দীঘল তন্বী সুঠাম কিশোরী। পেঁচিয়ে পরেছে লাল পাড় সাদা শাড়ি। কিন্তু—ওকি! শাড়ির আঁচলটা অমন করে গাছ-কোমরে বাঁধা কেন?

সে আরও এগিয়ে এল। এল গুরুচরণের একেবারে মাথার কাছে। স্থির হয়ে সেখানে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল গুরুচরণের। একী! কে—কে—তুমি? চিৎকার করে উঠল সে। আর সেই অন্ধকারেই লক্ষ্য করে দেখল, মেয়েটির পিঠের নিচে পর্যন্ত ছাপিয়ে পড়া এলোচুল দিয়ে টপ টপ করে জল ঝরছে। শাড়ি ভিজে শপ শপ করছে।

কে—কে—তুমি? চেঁচিয়ে বলতেই সেই ছায়ামূর্তি যেন কেঁপে উঠল। আর বিদ্যুতচমকের মত টুলুর মুখখানা একবার ঝলসে উঠেই ঘরের ঘন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আর সেই প্রেতচ্ছায়া অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে যেতে বহু—বহু দূর থেকে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, বাবা আমি যাচ্ছি—

বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে লণ্ঠন জ্বালল গুরুচরণ। কেউ কোথাও নেই। দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি আছে।

গুরুচরণের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। তার চোখের মণি—তার স্নেহপুত্তলী টুলু আর নেই। মনটাকে তৈরি করে নিয়ে বিয়াল্লিশ মাইল দূরে সোদপুর গ্রামে রওনা হল গুরু

গাড়িতে। যেতে পাক্কা দু-দুটো দিন কেটে যায়। গুরুচরণের মনে হল, গরুগুলো যেন পায়ে ভারি পাথর বেঁধে চলছে। কখন—কখন—কতক্ষণ পরে পৌঁছাবে। তার বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে।

গাড়ি চলছে।

উত্তর বাংলার মেটে রাস্তার দু'পাশে ধু ধু দিগন্তবিসারী মাঠে লাল ধুলোর ঘূর্ণি উড়ছে। আর এই ঘূর্ণিগুলো এক একটা প্রেতচ্ছায়ার মত অবয়ব নিয়ে উঠতে গিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। দূরে—বহুদূরে কাশিয়াড়ীর খাড়ির ধারে সাঁড়াশীর মত লম্বা ঠোঁট দিয়ে শকুনেরা কোন মরা গরুর নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করে খাচ্ছে মহা উল্লাসে। গুরুচরণ ভাবছে।

ভাবছে, টুলুর লাশটা এখন কোথায়? সত্যিই যদি অপঘাত মৃত্যুই হয় তাহলে তো ওর দেহটা কাটা ছেঁড়া করবে সদরের ডাক্তারবাবুরা। হয়ত দেখা যাবে—আসছে এই রাস্তা দিয়েই গরুব গাড়িতে করে তার লাশটা দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে নিয়ে—কিন্তু—

তাহলে লবণের গন্ধ পেয়েছিল কেন? শেষরাত্রে তার মেয়ে টুলুর মত যে কিশোরী মেয়েটির ছায়াদেহ দেখেছিল, তার তো ভিজে চুল বেয়ে জল পড়ছিল। মিলে গিয়েছে—পাওয়া গিয়েছে—জলে ডুবে মারা গিয়েছে টুলু। মৃতদেহটা নুন দিয়ে ঢেকে রেখেছে। নিশ্চয়ই তাই—

গুরুচরণ যা আশংকা করেছিল তাই হয়েছে। বড় গেট দিয়ে ভেতরে যেতেই দেখল, বিশাল এক লবণের স্তূপের নিচে রাখা হয়েছে টুলুর কঠিন হিমশীতল দেহ। তার আলতারাঙ্গা পা দুটো ঝিকমিক করছে!

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বঙ্গবাসীর স্টাফ রিপোর্টার লিখেছিল, আত্রাই নদীর প্রকাণ্ড দহ (অত্যন্ত গভীর আর কালো তার জল) কাষ্ঠগড়ের পাড়ে পৌষ-সংক্রান্তির দিন বারুণী স্নানের মেলায় গিয়েছিল টুলু। কুমুদিনীই নিজের দায়িত্বে নিয়ে গিয়েছিল। পৌষ মাসে মেয়ের ফাঁড়া আছে জেনেও। স্বামীর নিষেধ অমান্য করেও নিয়ে গিয়েছিল—ভেবেছিল চোখে চোখে রাখবে—কি আর এমন হবে—হতে পারে!

কুমুদিনী যখন কাষ্ঠগড়ের পাড়ে বুড়ো বটগাছের নিচে সংক্রান্তির পুজোর আয়োজন করছিল তখন তার অলক্ষ্যে গ্রামের কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে দল বেঁধে হুল্লোড় করে নদীতে নেমেছিল টুলু। দাপাদাপি করে সাঁতার কাটছিল। হঠাৎ সাঁতার কাটতে কাটতেই পড়ে গিয়েছিল রাক্ষুসে সেই দহের কালো জলের ঘূর্ণিপাকের ভেতরে। আর চোখের পলকে তলিয়ে গিয়েছিল টুলু—

গেল—গেল ডুবে গেল। চিৎকার করে উঠেছিল বহুলোক। কেউ কেউ ছুটে এসে ধুতি কি শাড়ি ছুঁড়ে দিয়েছিল—ডুবন্ত মেয়েটা যদি ওগুলো ধরে উঠে আসতে পারে—

কিন্তু পারেনি। টুলু আর উঠে আসেনি। উঠেছিল তার লাশ। বেলা গড়িয়ে গেলে পতিরামের ঘাটে পাওয়া গিয়েছিল তার মৃতদেহ।

তোমাকে বলেছিলাম, মৃত্যুর পরে বা আগে স্পিরিট তার প্রিয়জনকে কখন দেখা দেবে তার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। গুরুচরণ কিন্তু অনেক অনেক আগেই প্রেতিনীর ছায়াদেহ দেখেই মেয়ের অনিবার্য মৃত্যুর ইঙ্গিত পেয়েছিল। আবার জলে ডুবে মারা যাওয়ার প্রায় সতের ঘণ্টা পরে তার প্রেতাত্মা দেখা দিয়েছিল গুরুচরণকে। এই দুই-দুইবার বিদেহী আত্মার আবির্ভাবের কারণ মনে হয়, পিতার প্রতি মৃতার তীব্র ও অস্বাভাবিক আসক্তি। তুমি বোধহয় জান, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আসক্তি বা কোন কামনা বাসনারই শেষ হয় না। অধ্যাত্মবাদীরা বলেন, অশরীরি আত্মা সূক্ষ্মদেহ ধারণ করেও সেই দুর্বার আসক্তি নিয়েই তার আপনজনকে বারে বারে দেখা দেয়। আর গুরুচরণ পরলোকবিদ ঃ যোগসাধন এবং নিয়মিত নিবিড়ভাবে অধ্যাত্মচর্চা করত। এই ধরনের ব্যক্তিরাই সেই রহস্যময় অজানা পরলোকের সঙ্গে ইহলোকের যোগাযোগের উপযুক্ত মাধ্যম —Suitable medium for the communication between the other world and this earth. আর এদের কাছেই প্রেতাত্মারা খুব সহজে আসে। কথা বলে।

আর সম্ভব লবণের তীব্র গন্ধ সম্বন্ধেও তোমাকে দু'একটা কথা বলা দরকার। তা না হলে তোমার মনে ধাঁধা থাকবে। সেকালে গ্রামাঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস ছিল জলমগ্ন হয়ে মানুষ সংজ্ঞাহীন হয় খুব সহজে মৃত্যু হয় না। তাই লবণের স্তূপের ভেতরে রেখে দিত। লবণের উগ্র জারক রসের প্রভাবে যদি জ্ঞান ফিরে আসে—এই আশায়।

টুলুর স্পিরিট তার ইহলৌকিক জীবনের সম্ভাব্য করুণ পরিণতির কথা অনেক আগেই জানতে পেরেছিল। ভূবর্লোকের* সঙ্গে যুক্ত বাসনাময় আত্মাই (Desirous soul) লবণের গন্ধের মাধ্যমে তার পিতাকে পাঠিয়েছিল মৃত্যুর সংকেত!

এই গন্ধের কথায় মনে পড়ে যাচ্ছে ইটালীর সুবিখ্যাত পরলোকবিদ এবং ঘোস্টহণ্টেড হাউস বা প্রেতঅধ্যুষিত গৃহের বিশেষজ্ঞ ডক্টর লোমব্রোসার একটি রোমাঞ্চকর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিচিত্র ইতিবৃত্ত।

ইটালীর প্রাচীন শহর মিলানের উপকণ্ঠে পুরানো আমলের বাড়ি। বাড়ি না বলে তাকে ক্যাসেল বা দুর্গ বললেই ভাল হয়। চারিদিকে বিশাল উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের পরেই নানা রঙের ফুলের আর ইউক্যালিপটাশ ফার্ণ এবং আরও অনেক বাহারি গাছের সমারোহে ভরা এক বিশাল বাগান।

---

* ভূবর্লোক অর্থাৎ Astral plane. বাসনায় আত্মা যেমন ভূবর্লোকে, তেমনি স্থূল বা জড়দেহ থেকে ভূর্লোকে (Physical plane) আর ভাবনাময় দেহ (Thought body) যুক্ত থাকে স্বর্লোকে অর্থাৎ Lower mental plane-এ—'মরণের পর'—তুলসীদাস কর—ব্রহ্মবিদ্যা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

অনেক—অনেকদিনের অযত্নে আর অবহেলায় সেই বাগানের এখানে সেখানে আগাছার ঘন জঙ্গল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ঝোপঝাড় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এখনও লাল সুরকি বিছানো একটা পথের চিহ্ন দেখা যায়। এই পথেরই শেষপ্রান্তে কালো পাথরে তৈরি সেই ক্যাসেল।

ভরদুপুরে এই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন ডক্টর লোমব্রোসা। তারপরে লোমব্রোসার জবানীতেই শোন—

ঝাপড়া গাছপালায় ঘেরা ক্যাসেলের সামনে এসে দাঁড়াতেই হুহু বাতাসে নাকে এসে ধাক্কা দিল আতরের ঝাঝাঁলো মিষ্টি গন্ধ। এত তীব্র আর উগ্র সেই সুগন্ধ যে বেশিক্ষণ সহ্য করা যায় না! আমার স্নায়ুগুলো ধীরে ধীরে কেমন অবশ হয়ে এল। অবসন্ন আর শিথিল হয়ে এল চেতনা—

এ কী স্যার। আপনি পড়ে যাবেন যে? সেই বাড়ির বর্তমান বাসিন্দা মঁসিয়ে লুবিন ছুটে এসে আমাকে ধরে ফেলল। বলল, এখানে আপনি থাকতে পারবেন না—চলুন আমার আর একটা বাড়িতে। সেখানে বসেই কথাবার্তা হবে—বলেই লুবিন আমাকে নিয়ে এল শহরের আর একপ্রান্তে একটি হাল ফ্যাশানের বাংলো প্যাটার্নের বাড়িতে।

মঁসিয়ে লুবিন সেই ঘোস্টহণ্টেড ক্যাসেল সম্বন্ধে যা বলেছিল তার সারমর্ম হল—মাত্র দুই বছর আগে সে এই বাড়িটা কিনেছিল কোন খোঁজখবর না করেই। অত্যন্ত সস্তায় বলতে গেলে জলের দামে পেয়েছিল এত বড় ক্যাসেল, তক্ষুনি সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল—থাক সেসব কথা। সে এই বাড়ি কেনার অনেক পরে শুনেছিল, তার আগে যারা এই বাড়ি কিনেছিল তারা কেউই টিকতে পারেনি।

না। আতরের উগ্র গন্ধ কিন্তু সবসময় পাওয়া যায় না। শুধু যখন এই ভুতুড়ে বাড়ি সম্বন্ধে কেউ খোঁজ খবর নিতে আসে, তখুনি কোথায় থেকে যে ভুর ভুর করে আতরের মাতাল করা সুগন্ধ বেরিয়ে আসে বুঝতে পারে না।

হ্যাঁ। আরও এক সময়ে এই পারফিউমের উগ্র গন্ধের মাতামাতি শুরু হয়। যখন—এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল মঁসিয়ে লুবিন। সংকোচের ছায়া পড়েছিল তার চোখে। মাথা নিচু করে বসেছিল।

আরে কী আশ্চর্য বলুন, আমি বলেছিলাম, আপনি ডিটেল হিস্ট্রি না বললে আমি এনকোয়ারী করব কি করে—রেমিডিই বা কি করে বের করব?

থেমে থেমে লুবিন আর বারকয়েক ঢোক গিলে অস্পষ্ট গলায় বলেছিল, রাত্রে সে আর তার স্ত্রী ঘুমোতে যায়, যখন চাপা গলায় ফিস ফিস গল্পে তারা মুখর হয়ে ওঠে আর খরযৌবনবতী মাদাম দ্য লুজির কবোষ্ণ সান্নিধ্যে সে মাতাল হয়ে ওঠে তখুনি—

বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও—বিকট এক মর্মভেদী আর্তনাদ শোনা যায়। তারপরেই সব চুপ। শুধু সেই আর্ত চিৎকারের আওয়াজটা ভুতুড়ে বাড়ির

পাথুরে দেওয়ালে ঠোক্কর খেতে খেতে বাতাসে পাক খেয়ে দূরে মিলিয়ে যায়।

লুবিন সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ান এবং খানসামা বাবুর্চিদের সঙ্গে করে লাঠি সোটা নিয়ে খুঁজে দেখেছে। কোথাও জনমনিষ্যির কোন চিহ্ন দেখতে পায়নি। পেয়েছে শুধু বাড়িময় আতরের সেই উগ্র গন্ধ। মনে হয় যেন গোটা বাড়িটাকে কে আতর দিয়ে ধুইয়ে দিয়েছে! এত ভয়ানক উগ্র সেই গন্ধ যে নাকে রীতিমত ঝাঁঝ লাগে। মাথার ভেতরটা টলতে থাকে। মনে হয় তাকে বুঝি কেউ অ্যানেসথেসীয়া করছে। তখন এই বাড়ি ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এই পর্যন্ত বলেই থেমে গিয়েছিল লুবিন। বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার অস্পষ্ট গলায় বলেছিল, স্ত্রীকে নিয়ে একটা রাত্রিও কাটাতে পারিনি ডক্টর লোমব্রোসা—

ক্যাসেলের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল যদিও তার কালো পাথরের দেওয়ালের এখানে সেখানে সবুজ শ্যাওলার আস্তরণ পড়েছে, কোথাও বা পাথর ফুঁড়ে দু'একটা গাছের চারা উঁকি দিচ্ছে—সেসবই নিতান্ত অবহেলা আর অযত্নের চিহ্ন—বাড়িটার বয়স বেশি নয়—বড় জোর ষাট কি সত্তর হবে! অতএব লোকাল কাউন্টির (প্রদেশ) সদর দপ্তরের নথিপত্রে কি মিলানের মিউনিসিপ্যাল অফিসের রেকর্ডে এই বাড়িটার কিছু হিস্ট্রি পাওয়া যেতে পারে—দেখতে হবে, এই ক্যাসেলের জমিটাতে আগেই বা কি ছিল!

বেশিদূরে যেতে হল না। মিলান শহরের মিউনিসিপ্যাল অফিসে যেয়ে খোঁজ খবর করতেই চব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডের রেকর্ড থেকে জানা গেল এই ভুতুড়ে বাড়িটার বৃত্তান্ত—১৮৬১ সালে এই ক্যাসেল তৈরি করেছিল এক ধনী বিলাসী রাজপুরুষ—থিয়োডোর জেলডিন। জেলডিন ছিল ফ্রান্সের তখনকার রাজা তৃতীয় নেপোলিয়নের (১৮৫২-১৮৭০) ঘনিষ্ঠ অনুচর। অবশ্যই তার আরও একটা পরিচয় ছিল। লুইস নেপোলিয়ন বা তৃতীয় নেপোলিয়নের এক মিসট্রেস বা প্রেমিকার বড় ভাই হল জেলডিন। লুইস তাকে একটু বেশি খাতির যত্ন করত। বলাবাহুল্য, সেইজন্যেই জেলডিনের প্রতাপপ্রতিপত্তি ছিল খুব বেশি।

ইতিহাস বলে, লুইসের আমলে ফ্রান্সের চারিদিকে নবজাগরণের স্পন্দন জেগেছিল। আর একেবারে ক্ষয়িষ্ণু এবং দীন অবস্থা থেকে ইউরোপীয় রাজনীতিতে সর্বোচ্চ শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল ফ্রান্স। তৃতীয় নেপোলিয়নের বিচক্ষণতায় ইটালী এবং জার্মানী ফ্রান্সের সীমানাভুক্ত হয়েছিল। লুইস বন্ধু ও অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর থিয়োডোরকে ইটালীর শাসনকর্তা করে পাঠিয়েছিল রোমে। সরকারী কাজে তাকে রোমে থাকতে হত। তাই থাকত বাধ্য হয়ে। তার মন পড়ে থাকত মিলানের এই প্রমোদ ভবনে! কেন?

ভুবনবিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক ভিক্টর হিউগোর রেমিনিসেন্স অফ

নেপোলিয়ন দি থার্ডে বা তৃতীয় নেপোলিয়নের স্মৃতিকথার ভেতরে আছে থিয়োডোর জেলডিনকে শুধু ইটালীর শাসনকর্তার শিরোপাই দেয়নি লুইস, সবরকমের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে যতগুলি সম্ভব উপপত্নী কি প্রেমিকা নিয়ে বাস করার ঢালাও অনুমতিও দিয়েছিল। থিয়োডোরের মিসট্রেসরা প্রত্যেকেই ছিল সুন্দরী এবং খরযৌবনবতী। তাদের ভেতরে একজন—

ম্যাটিলডা। দীর্ঘ পুরুষালী চেহারা। হঠাৎ দেখলে মনে হয় গ্রীক ভাস্কর্যের নিখুঁত রমণী মূর্তি বুঝি। তার ধারালো মুখের গড়নে কঠোর ব্যক্তিত্বের আভাস কিন্তু তার উগ্র রমণীয় রূপরাশিকে এতটুকু ম্লান করতে পারেনি। বাইরে থেকে বুঝতে পারা যেত না, তার ওই আগুনের মত ঝাঁঝালো সর্বনাশা রূপের আড়ালে ছিল বন্য হিংস্রতা! কিন্তু এখন থাক সে-কথা—

রোমের রাজভবনে থাকত থিয়োডোরের শ'খানেক সুখসহচরী। আর মিলানের এই ক্যাসেল আলো করে থাকত ম্যাটিলডা। সে এখানে একাই সম্রাজ্ঞীর মহিমায় বিরাজ করত। প্রায়ই জেলডিনকে সরকারী কাজে রোমে যেতে হত। আবার দিনসাতেক পরে ফিরে আসত। তাদের দিন কাটছিল ভালই। কিন্তু—

ম্যাটিলডার কপালে সুখ সহ্য হল না। তাকে সেই বিশাল দৈত্যের মত দুর্গপ্রাসাদে একা থাকতে হত বলে কোন অনুযোগ করেছিল কিনা ম্যাটিলডা, কিম্বা তাকে বিয়ে করে পত্নীর সম্মান আর মর্যাদা দিতে পীড়াপীড়ি করেছিল কিনা জানা যায় না। তবে জানা যায় থিয়োডোর জেলডিন যখন রোমে যেত তখন ম্যাটিলডাও সতীসাধ্বী মেয়ের মত নিরামিষ জীবন কাটাত না। যেই সেই নির্জন ক্যাসেলের চারিদিকে রাত ঘন হয়ে নামত অমনি অভিসারে আসত এক যুবক। সুপুরুষ। রূপবান। মঁসিয়ে মিউরসল্ট। ইটালীর গভর্ণর থিয়োডোর জেলডিনের সেক্রেটারি। ম্যাটিলডার প্রমোদবাসরে সে মত্ত উল্লাসে নিশিযাপন করত। আর বাইরে গভীর নিশীথের স্তব্ধ পৃথিবী যেন মধুর এক অনুভবের সুখে আবিষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু—

একদিন—একদিন আগুন জ্বলল। যেদিন থিয়োডোর রোম থেকে ফেরার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এল আরও চারজন বিলাসের সহচরী। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল ম্যাটিলডা, রেগে কেঁদে কেটে মাথার চুল ছিঁড়ে অনর্থ করেছিল অর্থাৎ মেয়েরা সচরাচর যা করে থাকে, তা করেছিল কিনা কিছু জানা যায় না। ভিক্টর হিউগো শুধু বলেছেন—'The fire of the bitter conflict broke out··· তিক্ত সংঘর্ষের আগুন জ্বলে উঠেছিল। তারপরে—

তারপরে যা হয়, তাই হয়েছিল। একদিন তুমুল বর্ষার রাত্রে যখন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছিল, ক্যাসেলের বাগানের বুড়ো বুড়ো সাবেককালের ঝাপড়া গাছগুলো ঝড়ো বাতাসে হিংস্র আর কুটিল ডাইনীর মত মাথা দোলাচ্ছিল— একটানা উদ্দাম হাওয়ার ক্রুদ্ধ গর্জনে মেঘের হুঙ্কারে যেন মহাপ্রলয় নেমে

এসেছিল, ঠিক সেই সময়—

সেই সময়—সেই ঘনঘোর দুর্যোগের রাত্রেই ঘটে গিয়েছিল সেই ভয়ংকর দুর্ঘটনা।

না। সেদিনও বিলাসী রাজপুরুষ থিয়োডোর জেলডিনের দুর্গপ্রাসাদের জীবন ছন্দে এতটুকু ব্যতিক্রম ছিল না। ছিল না কোন অসঙ্গতি। অতবড় একটা বিপদ যে আসন্ন তার কোন আভাসই ছিল না।

প্রতিদিনের মত সেদিনও সেই বিশাল প্রাসাদের প্রতিটি অলিন্দ প্রতিটি কক্ষ উগ্র সুগন্ধী বসোরাই* আতর দিয়ে ধোয়া মোছা হয়েছিল। আর পারস্যের (১) অগুরুর সুবাস ছড়িয়ে প্রমোদকক্ষে এসেছিল থিয়োডোর জেলডিন। এখানে উদগ্র প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিল ম্যাটিলডা। রোম থেকে আজ সুখ-সহচরীদের ছেড়ে জেলডিন আসছে তার কাছে নিশিযাপন করতে। তাই মনের মত করে সেজেছিল সে। গোলাপী রঙের স্কার্টের আবরণে তার দীর্ঘতন্বী দেহ আগুনের মত জ্বলছিল। তার রক্তবর্ণ জামার আড়ালে তার উত্তুঙ্গ বক্ষোসম্ভারের আভাসের ছায়াময় লোভানি। আর তার দেহবল্লরীতে থরে থরে সাজানো যৌবনের ঐশ্বর্যগুলোকে আরও রমণীয়—আরও রহস্যময় করে তুলেছিল তার ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত আবৃত আবরোয়ান (স্বচ্ছ) মসলিনের তৈরি সুদীর্ঘ গাউন। এই ভুবনবিখ্যাত ভারতীয় বস্ত্রাভরণে(২) তাকে মনে হচ্ছিল যেন কোন অজানা স্বপ্নলোক থেকে নেমে এসেছে এক পরী। কেমন সুন্দর আর অপার্থিব তার সেই আশ্চর্য সৌন্দর্য। তারপরে—

তারপরের ঘটনার স্রোত গড়িয়ে গিয়েছিল চিরাচরিত পথ ধরে। ভিক্টর হিউগো তৃতীয় নেপোলিয়ন বা লুইসের স্মৃতিকথার ভেতরে থিয়োডোরের ব্যক্তিগত জীবনের প্রসঙ্গে শুধু লিখেছেন—At that night his mistress Matilda behaved very cold. এখন অনায়াসেই কল্পনা করা যায় হয়ত লোলুপ উল্লাসে মত্ত পশুর মত থিয়োডোর এগিয়ে গিয়েছিল ম্যাটিলডার দিকে। তার দু'চোখে কামনার আগুন জ্বলছিল। তাকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরে চুমুতে চুমুতে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল ম্যাটিলডার মুখখানা। কিন্তু ম্যাটিলডা একেবারে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চোখমুখ ভাবলেশহীন। নির্বিকার!

কি হয়েছে তোমার?

কথা বলে না ম্যাটিলডা। কিন্তু মনের ভেতরে যেন ঝড় বয়ে যায়।

ও, অনেকদিন পরে এসেছি বলে অভিমান? হো হো করে ক্যাসেলটা কাঁপিয়ে হেসে ওঠে ফরাসী সম্রাটের বিশ্বস্ত অনুচর এবং ইটালীর শাসনকর্তা থিয়োডোর।

---

* ষোড়শ শতাব্দীর আগে থেকেই পারস্যের সঙ্গে ইটালীর বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল।

(১) পারস্য থেকে সুগন্ধী জিনিস আমদানী হত ইটালীতে।

(২) খ্রীস্টের জন্মের আগে থেকে ভারতের মসলিন যেত ইউরোপে।

হাসির রেশ টেনে টেনে হাল্কা গলায় বলল, সুন্দরী, তুমি কি করে আশা কর—একমাত্র তোমাকে নিয়েই আমি মত্ত থাকব? বলেই ম্যাটিলডার পিঠে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ঠিক যেন তার বাড়ির পোষা কুকুরকে আদর করছে। আবার বিপুল খুশিতে গর গরে গলায় বলে, আর দেখ ম্যাটিলডা—তোমার মত মিসট্রেস আমার সঙ্গে তিনশ'জন—আমি রোজ রোজ এক খাবার খেতে যাব কোন দুঃখে—। আমার বুঝি মুখ পাল্টাতে ইচ্ছে করে না।

হ্যাঁ সে তো নিশ্চয়ই—মঁসিয়ে আপনার ভোগের সামগ্রী থরে থরে সাজানো আছে—কেমন নিরুত্তাপ বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেছিল ম্যাটিলডা, আপনি কেন কষ্ট করবেন? তার মনের ভেতরটা চিন চিন করে জ্বলে যাচ্ছিল। একটা কটু বিস্বাদ তিক্ততা একটু একটু করে থিকথিকে কাদার মত জমে উঠছিল তার চেতনার ভেতরে—এই কামুক পশুটা সাত সাতটা বছর ধরে তাকে নিয়ে লোফালুফি করেছে। খুবলে খুবলে খেয়েছে তার মাংস। ডাহা মিথ্যা আর অসম্ভব কতগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে লোভ দেখিয়ে বন্দী করে রেখেছে দৈত্যের মত ওই বাড়িটাতে। আর সে বাইরে বাইরে মনের সুখে নিত্যি নতুন ফুলের মধু খেয়ে বেড়াচ্ছে। একেবারে পিশাচ নরাধম নারীমাংসলোভী—

ডার্লিং ম্যাটিলডা, তুমি যে কী বেরসিক মাইরী, বলতে বলতেই ভারি দেহটা টেনে টেনে কাছে এল। তীব্র লালসা দু'চোখে দগদগে ঘায়ের মত জ্বলছে। চাপা গলায় বলল, অযথা দেরি করছ কেন বিছানায় চল, বলেই টেনে নামিয়ে দিল প্রায় স্বচ্ছ আবরোয়ানের সুদৃশ্য গাউন। ক্ষিপ্র হাতে খুলে ফেলল তার রক্তবর্ণ ব্লাউজ আর সবুজ কাঁচুলি। অবারিত করে দিল তার দৃঢ় কঠিন আর উদ্ধত দুইটি স্তনভাণ্ডের অপরূপ শোভা। কিন্তু—

তখনও তার দেহের অধোভুবনে এসে পৌঁছতে পারেনি থিয়োডোর। গোলাপী স্কার্টের আবরণে আবৃত ছিল তার সুপুষ্ট নিতম্বদেশ, ছিল তার নিটোল জঙ্ঘাযুগলের ছায়াময় হাতছানি। ম্যাটিলডা তাই স্কার্টটা দু'হাতে চেপে ধরে রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করছিল—আজ কিছুতেই না—কিছুতেই না—আপনি—আপনি আর এক পা এগোবেন না বলছি—

খস্—বাইরে শুকনো পাতার ওপর কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। আর চোখের পলকে একটা ছায়াদেহ যেন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কিন্তু কামনান্মোত্ত থিয়োডোর সেসব দিকে ভ্রূক্ষেপই করল না। সে ত্রস্ত হাতে ম্যাটিলডার স্কার্ট খুলে ফেলে তাকে সম্পূর্ণ নগ্ন আর নিরাবরণ করে ভোগের নৈবদ্যের মত করে সাজিয়ে নিয়ে এল—নিয়ে এল আতর মাখানো আর অগুরুর সুবাসে আমোদিত শয্যায়। কিন্তু—

যেই ম্যাটিলডার নগ্ন বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে গ্রাস করতে চাইল অমনি—

গুড়ুম—দুম—দুম—বন্দুকের গুলির শব্দে চারিদিকের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। কেঁপে উঠল দুর্গপ্রাসাদ।

বন্দুকের শব্দে ছুটে এসেছিল নৈশপ্রহরীরা, এসেছিল সশস্ত্র রক্ষীরা। তারা এসে দেখল তিনচারটে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে ইটালীর গভর্ণর থিয়োডোর জেলাডিনের লাশটা আড়াআড়ি ভাবে পড়ে আছে সেই সুদৃশ্য শয্যায়। চারিদিকে চাপ চাপ তাজা রক্ত। কিন্তু আতর আর অগুরুর মাতাল করা সুগন্ধে বুঝি চাপা পড়ে গিয়েছিল মানুষের তাজা রক্তের গন্ধ—

মৃত্যুর গন্ধ!

কে জানে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল ম্যাটিলডা। সারা ইটালীতে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাকে পাওয়া যায়নি—

এসব বলে ডক্টর লোমব্রোসা জানিয়েছেন মিলানের উপকণ্ঠে সেই রহস্যময় আতরের সুগন্ধ আচ্ছন্ন ক্যাসেল সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। মিউনিসিপ্যালিটির রেকর্ডে কি ভিক্টর হিউগোর বইতেও নেই আর কোন তথ্য—

তারপরে ভুতুড়ে বাড়ির এক্সপার্ট লোমব্রোসা যা বলেছেন সেটা শুনলে তুমি খুব আশ্চর্য হবে!

এই অভিশপ্ত ক্যাসেলের ইতিহাস যেটুক জানতে পারা গিয়েছে তা থেকে অনায়াসেই বুঝতে পারা যায়, থিয়োডোর জেলাডিনের স্পিরিট তার ইহলৌকিক জীবনের বিলাস—সেই আতর আর অগুরুর সুগন্ধের মাধ্যমে এই বাড়িতে তার অশরীরি অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়। আর কেউ এখানে বসবাস করুক, সেটাও সহ্য করতে পারে না। তাই দেখা যায় আতরের গন্ধ এত উগ্র যে মাথা ঝিম ঝিম করে। জ্বালা করে চোখ দুটো।

ভুতুড়ে বাড়ির মজা হল—সেই বাড়ির ভৌতিক কাণ্ড কারখানার কারণটা যদি বর্তমান বাসিন্দাদের জানিয়ে দেওয়া হয় তাহলে খুব সহজে আর সেইসব অলৌকিক উপদ্রব হয় না। হয়ত সেই ভুতুড়ে বাড়ির প্রেতাত্মা সতর্ক হয়ে যায়। তাই মিলান ছেড়ে চলে আসার আগে আমি মঁসিয়ে লুবিন আর মাদাম দ্য লুজিকে এই বাড়ির বৃত্তান্তটা বলেছিলাম।

কিন্তু এক একটা কত সখের সুন্দর সুন্দর বাড়ি 'ঘোস্ট হণ্টেড' হয়ে যায় কি করে? ভুতুড়ে বাড়ি বলতেই বা কি বুঝতে পারা যায়—এই একটি বিষয়ে সারা জীবন ধরে গবেষণা করে ডক্টর লোমব্রোসা জানিয়েছেন—যে কোন সুন্দর ও সুদৃশ্য বাড়িই প্রেত অধ্যুষিত আখ্যা পেয়ে পরিত্যক্ত হয়ে যেতে পারে। হয়ে যেতে পারে নির্জন, জনমানবহীন শশ্মানের মত। কিন্তু—

কেন?—কেমন করে তা সম্ভব হয়?

ধরুণ একটা বাড়ির কোন ঘরে কেউ গলায় দড়ি দিল বা অন্য কোন উপায়ে আত্মঘাতী হল। অমনি দেখবেন বাড়ির লোকেরা সেই ঘরটাকে এড়িয়ে চলবে। রাত্রে শোয়া তো দূরের কথা, দিনের বেলাও কেউ সহজে সেই ঘরে যেতে চাইবে না। There was instantiy grown up a feeling that there was something human in the very plaster and woodwork of that apartment……প্রায়ই আমাদের মনে হয় না কি,

এই ঘরটির প্রতিটি দেওয়ালের পলেস্তারার ভেতরে ভেতরে জানলা দরজার কাঠের ভাঁজে ভাঁজে মিশে রয়েছে সেই হতভাগা মানুষটির অন্তিম নিশ্বাসের অনুপরমানু। আর এই ধারণা—এই অস্বস্তিকর অনুভূতি থেকেই ঘরটি বা বাড়িটি ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়ে যায়। সেই ঘরের কড়িকাঠের এখানে সেখানে মাকড়সার ঝুল জমে। কোণে কোণে দেখা যায় আবর্জনার স্তূপ।

শুধু বাইরের চেহারাই নয়, সেই বাড়িটাকে ঘিরে আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে একটা রহস্যময় ও অলৌকিক ধ্যানধারণা। আশেপাশের বাসিন্দাদের সেই ধারণা আর বিশ্বাসই বাড়িটাকে ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত করে।

তবে মনে রাখতে হবে, যে ঘরের বাতাসে আত্মঘাতী মানুষটার নিশ্বাস প্রশ্বাস মিশে রয়েছে, সেই ঘরেই আমরাও শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছি! শুধু তাই নয়—

His or her acute distress, terrible pangs at the moment of the death under certain states of atmosphire completely impregnate anb saturate the particles of a room so that for years afterwards, it is possible for spirits to manifest themselves……

অর্থাৎ মৃতব্যক্তির তীব্র যাতনা, মৃত্যু যন্ত্রণার কাতর আর্তনাদ সব ধীরে ধীরে কোন কোন বিশেষ অবস্থায় ঘরের আবহাওয়ায় মিশে গিয়ে সেই ঘরটির অদৃশ্য কোটি কোটি অনুপরমানুর ভেতরে অনুপ্রবেশ করে এবং আস্তে আস্তে ভিজিয়ে দেয় গলিয়ে দেয় বা একেবারে দ্রবীভূত করে ফেলে। তাই—বেশ কয়েক বছর পরে সেই ঘরে তার বিদেহী আত্মার আবির্ভাব হওয়াটা মোটেই আশ্চর্যের কিছু নয়। বরং—সেটাই সম্ভব এবং খুব স্বাভাবিক!

শোন—কিছু মনে কর না। বোধহয় কিছুটা এলোমেলো হয়ে গেল। তোমাকে বলছিলাম মৃত্যুর পরে অশরীরি আত্মার আবির্ভাবের কথা—তাই না? আর তারই খেই ধরে এসে পড়ল দিনাজপুরের কবিরাজ গুরুচরণের বড়মেয়ে টুলুর অপঘাত মৃত্যুর বৃত্তান্ত এবং দেখেছ তো সেই প্রসঙ্গেই উঠল লবণের রহস্যময় গন্ধের কথা। আর সেই কোন দূর অজানা লোকের সেই অলৌকিক গন্ধ থেকেই এসে গেল মিলানের ক্যাসেল হাউসের আতর ও অগুরুর তীব্র সুগন্ধ সম্বন্ধে প্রেতঅধ্যুষিত বাড়ির বিশেষজ্ঞ ডক্টর লোমব্রোসার রিসার্চের আশ্চর্য সব তথ্য।

তোমাকে বলতে বাধা নেই মৃত্যুর পর সেই অজানা পরলোক, আত্মার অস্তিত্ব, অশরীরি আত্মার আবির্ভাব, প্রেতের বিচিত্র গতিপ্রকৃতি ইত্যাদি আলোচনা কখনো সোজা রাস্তায় চলতে পারে না। চলে না। মাঝে সাজেই এলোপাথাড়ি চলবে। অফ দি ট্র্যাক হয়ে যাবে। তার কারণ কি জান? ইহলৌকিক জীবনের রূপ রস গন্ধের সঙ্গে যেমন তেমনি তার সুখ

দুঃখ হাসিকান্নার সঙ্গেও পরকালের জীবনচর্যার শুধু অঙ্গাঙ্গি যোগাযোগই নয় তার পরস্পর বেমালুম মেশানো—ইণ্টারব্লেণ্ডেড। ডক্টর লোমব্রোসার, ভাষাতেই বলি It is well remember that human world and spirit world interblended and inseparable……

এবার আমরা মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বের—আমাদের আলোচনার সেই মূল প্রসঙ্গে ফিরে যেতে পারি—

প্রথমেই বলা দরকার অশরীরি আত্মা কখন এবং কোথায় ও কিভাবে যে এসে হাজির হবে তা কিছুই বলা যায় না। গুরুচরণের মেয়ে টুলুর অশরীরি আত্মা সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে শেষরাত্রে বাবাকে দেখা দিয়ে বলেছিল—যাচ্ছি বাবা। থিয়োডোর জেলডিনের অতৃপ্ত আত্মা তার মর্ত্যজীবনের বিলাসের সম্ভার আতর আর অগুরুর মাতাল করা সুগন্ধ ছড়িয়ে জানিয়ে দিয়েছিল তার উপস্থিতি।

এই যে তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ কোথাও নিস্তব্ধ নিশিরাতে হঠাৎ দড়াম দড়াম শব্দ করে কোন বাড়ির জানলা দরজা খুলে যায়। কি ছাদে দুপদাপ করে কাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় কিম্বা বাতাসের বুক চিরে করুণ আর মর্মান্তিক আর্তনাদ ভেসে আসে—এসব—সবই বিদেহী আত্মার অদৃশ্য হাতের কারসাজি। এবং তুমি অনায়াসে বলতে পার, এইসব রহস্যময় ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানাই হল স্পিরিটের আবির্ভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

তুমি জেনে রাখ আত্মা শুধু উপস্থিত হয় না—আবির্ভূতই হয় না শুধু কোন কোন ক্ষেত্রে তার আপনজনকে দেখা দিয়ে তাকে কোন কাজের ভার দেয়, ডিক্টেড করে রীতিমত। আর তাতেও শান্তি পায়না। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তার সেই কাজটা করিয়ে নেয়—এই অদ্ভুত ঘটনাটিকে প্রেতচর্চার বিদগ্ধ পণ্ডিত ফ্লামারিয়ন বলেছেন—A peculi ar phychic phenomenon মানুষের আত্মাসম্বন্ধীয় এক আসাধারণ এবং অসামান্য ঘটনা। এইখানেই শেষ নয়—আরও বলেছেন A supranormal faculties belonging to the soul independent of the physical senses অর্থাৎ আত্মার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা বা বৈশিষ্ট্যেরও অনেক—অনেক উর্দ্ধে এক আশ্চর্য অপার্থিব শক্তি যার সঙ্গে মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোন যোগাযোগই নেই।

সেই অদ্ভুত ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়ে শেষে মন্তব্য করেছেন ডক্টর ফ্লামারিয়ন —স্মরণ রাখতে হবে আমাদের মনের ভেতরে, আত্মার ভেতরে যেসব শক্তি নিহিত আছে সেসব নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ খুব কমই হয়েছে Our psychic perso..ality is endowed with powers that have as yet been analysed very little.

এই ভয়ংকর অলৌকিক ঘটনাটি যিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন আর সেই সর্বনাশা দুর্ঘটনা যার জীবনের মোড়ই ঘুরিয়ে দিয়েছিল তাঁর নাম—ম্যাডাম ম্যারিচেল।

ঠিকানা ২০ রু, কাস্টিন—১৮নং অ্যারন ডিসমেণ্ট ব্লক।

ম্যাডাম ম্যারিচেল প্রেততত্ত্বের গবেষক ফ্লামারিয়নকে এক দীর্ঘ চিঠিতে সেই আশ্চর্য ঘটনার বিবরণ জানিয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন। সেই চিঠির ভিত্তিতেই এখানে সংক্ষেপে বলা হল সেই সর্বনাশা বৃত্তান্ত, ফ্লামারিয়নের ভাষায় এ পিকিউলিয়ার সাইকিক ফেনোমেনন—

২৬শে এপ্রিল ১৯১৪।

বারটা বোধহয় ছিল বৃহস্পতিবার। রাত নিশুতি হয়ে গিয়েছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিল রুয়ে শহর। সেই শহরের আরও হাজারটা মানুষের মত ম্যারিচেলও ঘুমিয়ে পড়েছিল। পরম আরামের আর নিশ্চিন্তের সেই ঘুম। কিন্তু তার ছিল কপাল মন্দ—

সে কল্পনাও করতে পারেনি—চিন্তাও করতে পারেনি—নিশীথ রাত্রির পৃথিবীর প্রগাঢ় নিস্তব্ধতার ভেতরে বায়ুতরঙ্গে ভর করে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে তার জীবনের চরম সর্বনাশ—আসছে ভয়ংকর সেই বিপদ—

ঢং ঢং। ঘড়িতে দুটো বাজল। আর মিরচেলের ঘরের খিল দেওয়া দরজাও কেমন করে যেন খুলে গেল। গুটি গুটি এগিয়ে এল ঝাপসা আর অস্পষ্ট এক অশরীরিমূর্তি। প্রায় আকৃতিহীন ও নিরাবয়ব সেই প্রেতমূর্তিকে হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন ঘন কুয়াশার একটা দীর্ঘরেখা। সে এল মিরচেলের বিছানার একেবারে কাছে। কয়েকমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপরেই হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল।

শক্ত করে ধরল ঘুমন্ত ম্যারিচেলের একটা হাত। আর তার সেই ছায়াশরীরের কালো কালো ছায়ার মত আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করল তার স্বামী ও মেয়ের দিকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিস্তব্ধ ঘরে গমগম করে বেজে উঠল বিক্ষুব্ধ প্রেতের কর্কশ কণ্ঠস্বর—দুজনের ভেতরে একজনকে বেছে নাও—খুব তাড়াতাড়ি। আমার সময় নেই—একেবারে সময় নেই—

আপনি বলছেন কি! এরা দুজনেই যে আমার হৃদপিণ্ডের মত—

ওসব বললে হবে না। এদের একজনকে আমার চাই-ই চাই, প্রেতের কণ্ঠে বিরক্তির উত্তাপ ফুটে উঠল।

কোন কথা বলল না ম্যারিচেল। বলতে পারল না। শুধু নিতান্ত নিরুপায় আর অসহায় একটা মানুষের মত করুণ দৃষ্টিতে তার স্বামী আর মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

কী আশ্চর্য—দেরি করছ কেন? আবার প্রেতের অধৈর্য কণ্ঠস্বর শোনা গেল—Just choice and decide quickly. একজনকে বেছে নিয়ে সিদ্ধান্ত করে ফেল তাড়াতাড়ি—

তবুও—তবুও ম্যারিচেল চুপ করে রইল। অসহ্য যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে বুকের ভেতরটা। মাথার ভেতরে আগুনের ঝড় বয়ে চলেছে। তার মনের ভেতরে হাজব্যাণ্ডকে আর মেয়েকে পাশাপাশি রেখে অনেক-অনেক চিন্তা

করল। কিছুই ঠিক করতে পারল না। শোকে দুঃখে আর যন্ত্রণায় তার চেতনা বিকল হয়ে গেল।

এই ভয়ংকর মুহূর্তটির বর্ণনা দিতে গিয়ে ডক্টর ফ্লামারিয়ন জানিয়েছেন—What indescribable suffering gripped her soul. We can imagine it. কী অবর্ণণীয় যাতনা যে তার সমস্ত সত্ত্বাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল তা আমরা ধারণা করতে পারি—

আর কষ্ট হবেই না বা কেন? তার স্বামীর বয়স মাত্র ছেচল্লিশ বছর। অটুটস্বাস্থ্যে এখনও ভরা যৌবনের আভাস। তারই বুকের কাছে ঘেঁষে শুয়ে রয়েছে। কেমন শিশুর মত নিষ্পাপ আর সরল। ওকে ওই নিষ্ঠুর প্রেতের হাতে তুলে দিতে হবে! তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। চোখ ফেটে জল এসে পড়ে।

তার বাঁ দিকেই ঘুমিয়ে রয়েছে তার মেয়ে। মাত্র আঠার বছর বয়স। অসামান্য সুন্দরী। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন রক্তবর্ণ ডালিয়া কি একটা ক্রিসান্থিয়াম ফুলই যেন গা এলিয়ে বিছানায় পড়ে রয়েছে! এই মেয়েকে মৃত্যুর অন্ধকারে ঠেলে দিতে হবে? না—না—কিছুতেই না—কিছুতেই না—মেয়েকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরে থর থর করে কাঁপতে লাগল সে। আর কেমন উদভ্রান্তের মত তাকিয়ে রইল স্বামী আর মেয়ের মুখের দিকে। তার চোখদুটো থেকে যেন এক অদৃশ্য স্নেহের স্রোতধারা ঝরে ঝরে পড়ছে তাদের ওপরে!

কি হল তোমার? তুমি কিন্তু বড্ড দেরি করছ! এবার গাঢ় সেই অন্ধকার ঘরে মনে হল সেই প্রেতচ্ছায়া ম্যারিচেলের আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। বিদ্যুতচমকের মত তার মনে একটা সন্দেহ উঁকি দিল—লোকটা কে? সত্যিই কি কারো প্রেতাত্মা? কিন্তু জ্যান্ত মানুষও তো হতে পারে!

কে আপনি? আমি কাউকেই দেব না—না—না—কিছুতেই না—নিস্তব্ধ ঘরে ম্যারিচেলের করুণ আর্তনাদ হাহাকারের মত শোনাল।

মুখ ঘুরিয়ে সেই অস্পষ্ট কালো ছায়ার মত প্রেতমূর্তির দিকে তাকাতেই হিম হয়ে গেল ম্যারিচেলের বুকের রক্ত। সর্বনাশ! এ যে তার শ্বশুরের মত লম্বা ঢ্যাঙ্গা চেহারার—

বৌমা আমার ছেলে না হয় নাতনী—একজনকে আমি নেব, কেন যেন খুব নরম শোনাল প্রেতের কণ্ঠস্বর। তুমি তো জান ওরা আমার খুবই আদরের ছিল—বলতে বলতে কেমন ক্ষীণ আর অস্পষ্ট হয়ে এল তার কথাগুলো। বহু-বহু দূর থেকে বলল, ওদের ছেড়ে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে না—না—বাবা আমার এত বড় সর্বনাশ করবেন না, দু'হাতে বুক চেপে ধরে ককিয়ে কেঁদে উঠল ম্যারিচেল। একবার স্বামীকে আর একবার মেয়েকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

তাড়াতাড়ি ঠিক কর—কাকে দেবে, তার কান্নাকাটির দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ

না করেই সেই প্রেতকণ্ঠ এবার আদেশের মত করে বলল।

না। আর কোন উপায় নেই। শোকে দুঃখে হতাশায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। কয়েকমুহূর্ত মনের সঙ্গে যুদ্ধ করল। স্বামীর ওপরে তার গভীর ভালবাসার প্রচণ্ড টানের চেয়েও আরো আরো জোরালো মাতৃত্বের সেই স্নেহ—সেই মেটারন্যাল লাভেরই জয় হল। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে স্বামীর স্মৃতিটুকু নিয়েই বেঁচে থাকবে—

ঠিকই 'ডিসিশান' নিয়েছ, তার মনের কথা জেনে বলল সেই প্রেতাত্মা আমি খুব খুশি হয়েছি—তোমাকে আশীর্বাদ করছি—তুমি সুখী হবে—বলেই কালো ছায়ার মত দীর্ঘ হাত প্রসারিত করল ম্যারিচেলের দিকে। তারপরেই যেন ঘরের জমাট অন্ধকারে আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল সেই দীর্ঘ প্রেতমূর্তি!

ঘুম ভেঙ্গে গেল ম্যারিচেলের।

একী ভয়ঙ্কর সর্বনাশা দুঃস্বপ্ন দেখল সে! কেন—কেন দেখল এসব! ভয়ে আতঙ্কে আড়ষ্ঠ হয়ে বসে রইল কয়েকমুহূর্ত! তখনো গভীর ঘুমে অচেতন স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করল।

একথা সত্যি, তার মনে হল তার শ্বশুরমশায়ের ছেলে আর নাতনীর ওপরে দারুণ টান ছিল। দুজন যেন ছিল তার দুটো চোখের মণি। কোন বাবার আবার ছেলের জন্যে নাতনীর জন্য আকর্ষণ না থাকে। তাই বলে যে মানুষটা পাঁচ পাঁচটা বছর আগে দেহ রেখেছে তার অশরীরি আত্মা কখনো মৃত্যুর পরপার থেকে এসে অমন নির্মম নিষ্ঠুরভাবে যে কোন একজনকে চাইতে পারে? না, তাই সম্ভব? এসব—সব দুঃস্বপ্ন। এসব কখনো সত্যি হতে পারে না। ও! ক্রায়েস্ট তাই যেন হয়।

পুবের আকাশ ফরসা হয়ে গেল। আর পাঁচটা হাউসওয়াইফের মত মাদাম ম্যারিচেলেরও প্রতিদিনের জীবনচক্র চলতে শুরু করল। চা করে নিয়ে এসে ডেকে তুলল স্বামীকে। কিন্তু মুখের দিকে তাকাতে সাহস পেল না। কেমন ঢিব ঢিব করতে লাগল তার বুকের ভেতরে। আর মাথায় যেন রাশি রাশি সূঁচ বিঁধছে।

কি হল তোমার। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বস—বলেই ডুপিন—মঁসিয়ে আর্থার ডুপিন তাকে জড়িয়ে বুকের ভেতরে টেনে নিল। কিন্তু সে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু দূরে বসল। ডুপিনের হাতদুটো কেমন হিমঠাণ্ডা বলে মনে হল। অদ্ভুত আর বিচিত্র এক দৃষ্টিতে স্বামীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

কি হয়েছে তোমার?

কোন কথা বলল না ম্যারিচেল। গাঢ় অন্ধকার ঘরের দূর কোণে আরো

এক ছোপ নিকষ কালো ছায়ার মত সেই দীর্ঘ প্রেতমূর্তি, গুটি গুটি তার খাটের কাছে এগিয়ে আসা—সব—সেইসব বীভৎস দৃশ্য তার চোখের সামনে দিয়ে মিছিল করে যেতে লাগল।

তোমার শরীর খারাপ নয় তো ?

কোন কথা না বলে নিজেকে লুকানোর জন্যই তাড়াতাড়ি চলেগেল ম্যারিচেল।

ঠিক তার পাঁচদিন পরে অফিস থেকে ফিরে এল ডুপিন মাথা ধরা নিয়ে। রাত্রের দিকে মাথার যন্ত্রণা বেড়ে গেল। ডাক্তার বলল, সাইনাস্। পরদিন সেই যে জ্বর এল, সেই জ্বর আর ছাড়ল না। সাতদিনের দিন ভোর রাত্রে হঠাৎ মারা গেল। ডেথ সার্টিফিকেটে ডাক্তার লিখলেন—sudden heart failure। জ্বরের ভেতরে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াবন্ধ হয়ে মারা গিয়েছে—

মাদাম ম্যারিচেলের প্রসঙ্গে আর কিছু বলেননি ডক্টর ফ্লামারিয়ন।

কিন্তু এই আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনাটির কার্যকারণের সম্বন্ধে দিয়েছেন একটি বিচিত্র ব্যাখ্যা—পরিদৃশ্যমান এই পৃথিবীর ভেতরেই এক অদৃশ্য বিশাল জগৎ (Invisible world) আছে। তার ভেতরে যেমন আত্মা বা 'সোল' তেমনি বৈদ্যুতিক শক্তি, চুম্বক শক্তি এবং সূর্য ও বিভিন্ন গ্রহের নানা বৈচিত্রময় আকর্ষণও তো আছে এবং এইসব অদৃশ্য মহাশক্তিই বিশ্বপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করছে। স্মরণ রাখতে হবে, মানুষের আত্মা তার স্পিরিট তার চিন্তারও যেমন মৌলিক সচেতনতা আছে তেমনি চলমান জীবজগতে কি ঘটছে তা প্রত্যক্ষ করার শক্তিও আছে তার এবং অনেক ঘটনাই সময় সময় আত্মার নির্দেশে পরিচালিত হয়ে থাকে—In invisible world beings, spirits, thaughts, which may posses a rudimlntary consciousnlss as well as the power of seeing what is taking place in a living organism and making themseeves manifest……

এখানে বলা যায় সেই মহাশক্তিধর অদৃশ্য আত্মাই ম্যারিচেলের কাছে এসে তাকে বাধ্য করেছিল স্বামী এবং মেয়ের ভেতরে একজনকে বিসর্জন দেওয়ার সিদ্ধান্ত করতে—An invisible being which had become visible could so to speak and dictate………

আত্মা কি ? আদৌ তার অস্তিত্ব আছে কিনা জানতে চেয়েছিলে—জানতে চেয়েছিলে ভূত কি ! আমি কখনো প্রেতাত্মার সম্মুখীন হয়েছি কিনা, আমি যতটুকু জানি—তোমাকে যথাসাধ্য বলতে চেষ্টা করেছি।

তবে দেখ প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে এত বিস্তর কথা তোমাকে লেখার পরও উপনিষদের সেই যমরাজের মতই বলতে বাধ্য হচ্ছি—বিষয়টি বড়ই জটিল এবং দুরূহ এক কুয়াশারই মতই ঝাপসা আর অস্পষ্ট। তাই বাধ্য হয়ে প্রেততত্ত্ববিদ্যার দেশী-বিদেশী পণ্ডিতদের নিরলস গবেষণা এবং প্রেতাত্মার প্রত্যক্ষদর্শীদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হল।…

আশা করি হয়ত এতেই তোমার কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসা কিছুটা মিটবে।

প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে—

দ্বিতীয় প্রেতমণ্ডল

Spirit photography—a very
real and stupnedousfact

—Leadbeeter.

....

ঘোস্ট সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড আর একজনের চিঠি এল।

তাঁর বিষয়বস্তু অভিনব—ভূতের ফটোগ্রাফ! বা স্পিরিট ফটোগ্রাফি অর্থাৎ প্রেতাত্মার আলোকচিত্র! আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত সেই ভদ্রলোক লিখেছেন…"আপনি পরকালতত্ত্ব নিয়ে অনেকদিন ধরে নাড়াচাড়া করছেন বলেই আপনাকে জানাচ্ছি—মৃতব্যক্তির আত্মার প্রতিকৃতি বা ছবি কি তোলা যায়? অকাল্ট সায়েন্সের বিদেশী পত্রিকায় দেখা যাচ্ছে লণ্ডন এবং নিউইয়র্ক ও আরও অনেক শহরে পরকালতত্ত্বের গবেষকরা স্পিরিট ফটোগ্রাফি নিয়ে নাকি অনেক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করছেন। লণ্ডনের কোন এক প্রেততত্ত্ববিদ নাকি তাঁর দশবছর আগে মৃতা স্ত্রীর ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছেন।…ইত্যাদি—আরও অনেক কথা লিখে শেষে অনুরোধ করেছেন, আপনি যদি এ প্রসঙ্গে কিছু আলোকপাত করতে পারেন তাহলে উপকৃত হব"……

প্রথমেই সবিনয়ে আপনাকে বলি, আপনি যা জানতে চেয়েছেন সে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব সীমিত। তবে বলতে পারি, 'স্পিরিট ফটোগ্রাফি' আপাতদৃষ্টিতে একেবারেই অবিশ্বাস্য মনে হলেও কিন্তু প্রবীণ পরকালবিদ বিশপ লেডবীটার স্পষ্ট করেই বলেছেন—There cannot be more convincing proof of spirit communication than a spirit photography স্পিরিটের আলোকচিত্রের চেয়ে পরলোকের বিদেহী আত্মার সঙ্গে ইহলৌকিক জীবনের যোগাযোগের আর কোন বেশি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণই হতে পারে না!

কিন্তু মৃতব্যক্তির স্পিরিটের আলোকচিত্র বা প্রতিকৃতি কে তুলেছিল, কোথায় এবং কেমন করে কি কৌশলে তুলেছিল এসব 'ডিটেলস' বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—বলেছেন লেডবীটার—Elsewhere will be found the account of the most lucky individual in this respect—পৃথিবীর কোথাও না কোথাও এমন কোন সৌভাগ্যবানের দেখা নিশ্চয়ই মিলবে যে স্পিরিটের আলোকচিত্র পেয়েছিল বা দেখেছিল।

আরও বলেছেন আমি জানি, মৃত কন্যার একটি ছবি সংগ্রহের জন্য এক শোকার্ত পিতার আকুলিবিকুলি। এবং এও জানি এক আশ্চর্য উপায়ে সে ছবি তিনি পেয়েও ছিলেন।

সেই অলৌকিক ঘটনাটি যতই বিচিত্র এবং অসম্ভব হোক না কেন, এতটুকু

অবিশ্বাস করতে পারেননি পরলোকবিদ সেই পাদ্রী লেডবীটার। আর তিনি এতই কনভিনসড হয়ে গিয়েছিলেন যে ব্যাপারটা কতটুকু সত্যি তা খতিয়ে দেখতে যাননি—স্পষ্টই বলেছেন, I do not vouch, however for the truth of the story……

কেন ?

গোটা ব্যাপারটাই যে প্রায় তাঁর চোখের সামনে ঘটেছিল। তাঁকে প্রায় প্রত্যক্ষদর্শী বা আই উইটনেসই বলা যায়। এবার তাঁর (বিশপের) জবানীতেই শুনুন প্রেতাত্মার ছবি তোলার বৃত্তান্ত—

কয়েকবছর আগের ঘটনা। লণ্ডনের কোন একটা রাস্তা ধরে চলেছি। পিকাডেলীর কাছে আসতেই দেখা হয়ে গেল আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে। যতদূর মনে হয় তাঁর নাম রবার্ট কপারফিল্ড। মিঃ কপারফিল্ড পুস্তক ব্যবসায়ী। অকসফোর্ডে তার মস্ত বড় বইয়ের দোকান। ব্যবসায় বেশ দু'পয়সা করেছেন। লণ্ডন শহরে নিজের বাড়ি। সন্তান বলতে একটি মাত্র মেয়ে। সুন্দরী। তরুণী। শুনেছিলাম—কেমব্রিজে পড়ে। সবদিক থেকেই বেশ সুখী, সম্পন্ন আর স্বচ্ছল তিনি। কিন্তু—

একী হয়েছে তার চেহারা। উসকো খুসকো চুল। কালিমাড়া দুটো চোখ। ঠেলে ওঠা গালের হাড় দুটোর ওপর অশ্রুর বিন্দু চিক চিক করছে।

কি হয়েছে আপনার মিঃ কপারফিল্ড ?

কোন কথা বলল না সে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মুখ দেখে মনে হল ভেতরে ভেতরে যেন একটা নিদারুণ যন্ত্রণা তাকে শতমুখ দিয়ে বিদীর্ণ করছে। আর সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছে সে।

আপনার কি শরীর খারাপ ?

একটা ভাল আর্টিস্টের খোঁজ দিতে পারেন ফাদার, কেমন কান্না জড়ানো অস্পষ্ট গলায় বলল সে।

আর্টিস্ট ?

আর্টিস্ট কি পেণ্টার যাই হোক, যে আমার—বলতেই বুকের ভেতর থেকে পাক দিয়ে ঠেলে ওঠা কান্নার দমকে তার গলা বুঁজে এল। চোখ দুটো ফেটে জল এসে পড়ল।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মিঃ কপারফিল্ড। যদি একটু খোলাখুলি বলেন তাহলে হয়ত আপনাকে সাহায্য করতে পারি—

গত পরশু রাতে মেরী মারা গিয়েছে—

সে কী! বলছেন কি, আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। একটু ধাতস্থ হয়ে বললাম, কি হয়েছিল।

—সামান্য জ্বর। জ্বরের ভেতরে হঠাৎ হার্টফেল—বাদবাকি কথাগুলো আর বলতে পারল না কপারফিল্ড। তীব্র কান্নায় তার মুখখানা এঁকেবেঁকে কেমন দুমড়ে দুমড়ে কুৎসিত হয়ে উঠল।

আমি আর কিছু বললাম না। বলতে পারলাম না। একমাত্র সন্তান হারানোর শোকে সান্ত্বনার যে-কোন কথাই নিজের কাছেই অর্থহীন প্রলাপের মত মনে হয়। কিন্তু কেন আর্টিস্টের খোঁজ করছে—কারণটা মুহূর্তে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার পরিচিত তিন চারজন শিল্পীর খোঁজ দিলাম। তারপরে?

যা হয়। সাত কাজে বেমালুম ভুলে গেলাম। অন্য লোকের শোক দুঃখ সমস্যা নিয়ে আমরা কতক্ষণ মাথা ঘামাতে পারি বা ঘামানো যায়? কিন্তু মাস তিনেক পরে আবার একদিন কপারফিল্ডের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। লক্ষ্য করলাম, আরো অস্থির—আরো বিক্ষুব্ধ এবং উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাকে। আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মুখ নিচু করে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। কেমন ফ্যাসফেসে গলায় বলল, কিছুই করতে পারলাম না—পেলাম না আমার মেরীর ছবি—

মেয়ের প্রতিকৃতির জন্য কী তুলকালাম কাণ্ড করেছিল সে তা এখানে সংক্ষেপে বলছি—

লণ্ডনের ডিভনশায়ারের প্রান্তে একটি হাল ফ্যাসানের বাড়ির দরজায় দ্রুত কলিংবেল বেজে উঠল ক্রীং—ক্রীং—ক্রীং।—

গৃহস্বামী অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। এত ভোরে, এই ঘন কুয়াশা আর টিপ-টিপ বৃষ্টি মাথায় করে কেউ আসে! লোকটা পাগল নাকি?

কি চাই?

আমাকে একটা ছবি এঁকে দেবেন? আমার মেয়ের ছবি।

ভদ্রলোকের হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল কপারফিল্ড, জানেন আমার মেরী দেখতে খুব সুন্দরী ছিল, নাক, মুখ, চোখ যেন তুলি দিয়ে আঁকা—থেমে গেল সে। আবার যেন মনে মনে কোন কিছুর তুলনা খোঁজার চেষ্টা করে বলল, হঠাৎ দেখলে মনে হত যেন হেভেন থেকে নেমে এসেছে কোন ফেয়ারী—বলেই তীব্র উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল। আর বাড়ির মালিক—প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী টমাস মানের নির্বিকার মুখের দিকে ব্যাকুল-করুণ চোখে তাকিয়ে রইল।

কপারফিল্ডের অবস্থা দেখে হয়ত টমাসের মনটা নরম হল। বলল, আপনার মেয়েকে পাঠিয়ে দেবেন। আমি তাকে দেখব একবার—তারপর সিটিং দিতে বলব, তারপর একটু থেমে তার বহুমূল্য কিন্তু মলিন পোশাকের দিকে লক্ষ্য করে বলল, জানেন বোধহয় আমার রেট অত্যন্ত হাই—

না—না—রেটের জন্য একটুও চিন্তা করবেন না মিঃ মান! একেবারে হা হা করে উঠল কপারফিল্ড, ছবি যদি ঠিক হয় তাহলে যত হাজার পাউণ্ড চাইবেন দেব—

বেশ। মেয়েকে নিয়ে আপনি আসবেন—

টমাসের কথা যেন শুনতে পেল না সে। পোর্টফোলিও ব্যাগ থেকে

কতগুলো দোমড়ানো কাগজ বের করে শিল্পীর দিকে এগিয়ে দিল। শিল্পী দেখল, প্রতিটি কাগজেই পেন্সিল দিয়ে আঁকা একটি যুবতী মেয়ের মুখ। কিন্তু বেশ কষ্ট করে বুঝতে হয়—সে মুখ মানুষের। অনভ্যস্ত আর কাঁচা হাতে আঁকার অক্ষম চেষ্টা।

মিঃ মানু—আমার মেয়ের—আমার মেরীর ছবি। এটা দেখে আপনি ওর প্রতিকৃতি করে দিতে পারবেন না?

না। অসম্ভব—এসব স্কেচ থেকে কিছুই বুঝতে পারা যায় না—হঠাৎ কি মনে করে তার দিকে খরচোখে তাকিয়ে ঈষৎ উত্তপ্ত গলায় বলল, কেন—মেয়েকে এখানে পাঠাতে কি আপত্তি আছে আপনার?

তার কথা যেন শুনতেই পেল না কপারফিল্ড। নিজের ভেতরে মগ্ন থেকে যেন বহু—বহুদূর থেকে বলল, আচ্ছা মিঃ মানু আপনি কি কখনো পিক্টোরিয়াল বাইবেলে মেরী ম্যাগডালিনের সেই অনবদ্য ছবিটি দেখেছেন, একটু থেমে আবার আপন মনে ফিস ফিস করে বলল, মেরী ম্যাগডালিন—বাইবেলের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী। দি লেডী অফ দি রিমার্কেবল বিউটি। দি মোস্ট ট্যাণ্টালাইজিং ওয়োম্যান অফ দি বাইবেল। জানেন আমার মেরী আমার মেয়েও ছিল ঠিক ওই ম্যাগডালিনের মত দেখতে। ঠিক ঐরকম রূপসী—পারবেন না—পারবেন না আর্টিস্ট এঁকে দিতে?

টমাস মানু কোন কথা বলল না। অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ মনে হল। আস্তে আস্তে বলল, আমি ম্যাগডালিনের ছবি দেখিনি—আর ম্যাগডালিনকে হুবহু এঁকে দিলে তো আর আপনার মেয়ের প্রতিকৃতি হবে না—একটু থেমে তীক্ষ্ম কণ্ঠে বলল, কেন আপনার মেয়ের সিটিং দিতে অসুবিধা কি? তিনি কি এখানে নেই?

না—মিঃ টমাস মানু। সে কোথাও নেই—

মানে?

সে মারা গিয়েছে।

আবার লিভারপুলের আর এক প্রখ্যাত শিল্পী ডয়েলীর কাছে গেল কপারফিল্ড। বলল তাকেও একেবারে বদ্ধ উন্মাদের মত সেই একই কথা। একই ব্যাকুল অনুরোধ। সেই করুণ মিনতি—যেমন করেই হোক চাই তার মেয়ের একটা ছবি।

কিন্তু টমাস মানের মত ডয়েলীও বলল, আপনার মেয়েকে না দেখে কি করে ছবি আঁকব?

আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়াল না কপারফিল্ড। অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে বেরিয়ে গেল। দ্রুত অস্থির পায়ে এল হাইড পার্কের কাছে এক শিল্পীর কাছে। তিনি বয়সে তরুণ। নামডাকও খুব একটা নেই। কোন ভূমিকা না করে তার কাছে উত্তেজনায় ভেঙ্গে পড়ে বলল, আপনারা এত

ছবি আঁকেন—একটা সুন্দরী তরুণী মেয়ের ছবি এঁকে দিতে পারেন না আমাকে—

দেখুন, সুন্দরী তো অনেক রকমের হয়, শিল্পী বিনম্র কণ্ঠে বলল, তার নাক, মুখ, চোখ, চুল সব মিলিয়ে তো তার সৌন্দর্য—

সে সবের আলাদা আলাদা বর্ণনা আর কি দেব! এক কথায় বলা যায়, অপার্থিব তার সৌন্দর্য। মনে হয় যেন মুঠো মুঠো জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া তার দীঘল দেহ………

গভীর শোকে প্রায় উন্মত্ত পিতা মৃত কন্যার রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রলাপ বকার মত আরও কি সব বলেছিল জানা যায় না। তবে একথা ঠিক যৌবনধন্যা রূপসী নারীর অপরিসীম সৌন্দর্যের প্রশস্তি নিশ্চয়ই সেই তরুণ শিল্পীর মনের অবচেতনায় ফুটিয়ে তুলেছিল রূপরম্যা এক তরুণীর আলেখ্য। তা নাহলে তার কল্পনার সেই রমণী মূর্তিকে ভিত্তি করে সে ছবি আঁকতে বসবে কেন?

সাদা ধবধবে ক্যানভাসের ওপরে তুলির নিপুণ টানে টানে সবে দু'একটা রেখা ফুটে উঠতে শুরু করেছে এমন সময় ঘটে গেল একটা অদ্ভুত কাণ্ড—

কিন্তু তার আগে বলা দরকার আর একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা। কপারফিল্ড তাঁর মেয়ের রূপের বর্ণনা যতই সাতকাহন করে বলুক না কেন, ছোকরা আর্টিস্ট কিন্তু স্পষ্ট বলে দিয়েছিল—আপনার মেয়ে সিটিং না দিলে ছবি তৈরি করা সম্ভব নয়। তখন তাকেও সে জানিয়েছিল সেই মর্মান্তিক ও নিষ্ঠুর সত্য—তার মেয়ে ইহলোকেই নেই। হয়ত সেই যুবশিল্পী ব্যথিতও হয়েছিল এই কথা শুনে। কিছুক্ষণ বোকার মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গিয়েছিল কপারফিল্ড।

এই ঘটনার মাসখানেক পরেই কিন্তু কপারফিল্ড পেয়ে গিয়েছিল তার মেয়ের নিখুঁত প্রতিকৃতি। মনে প্রশ্ন জাগে কেমন করে পেয়েছিল। বলতে বাধা নেই সেই ঘটনা একেবারে অতিপ্রাকৃত এবং অলৌকিক।

অল্পবয়সী আর্টিস্ট ছবি আঁকতে শুরু করেছিল—সেকথা আগে বলেছি।

তার কল্পনা থেকে বেশ মুডে ছবি এঁকে চলেছিল। হঠাৎ বাধা পড়ল। খট্-খট্—খট্ দরজার কড়া বেজে উঠল।

আমার একটা পোরট্রেট এঁকে দেবেন প্লীজ, এক অপরিচিত তরুণীর কণ্ঠে করুণ মিনতি ফুটে উঠল। কেন যেন থর থর করে কাঁপছে সে। মনে হয় যেন তার ভেতরে উত্তেজনার ঝড় বয়ে চলেছে।

শুনুন, আমি কিন্তু একেবারে মিনিট পনের কুড়ির বেশি সিটিং দিতে পারব না বুঝলেন আর এই ছবির জন্য আপনি বেশ মোটা ফি পাবেন—

আর্টিস্ট তার কথা শুনবে কি, অপলক দুটো চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকে দেখছে। গ্রীকভাস্কর্যের কোন দেবীর মত অনিন্দ্যসুন্দর এক রমণীমূর্তি। হঠাৎ দেখলে মনে হয় রক্তমাংসের কোন নারী নয়—কেমন একটা

অপার্থিব সৌন্দর্য বহন করে এসে দাঁড়িয়েছে এক সুদূর স্বপ্নের নারীমূর্তি! তার বিদ্যুতচমকের মত মনে হল, কপারফিল্ডের মেয়ের রূপের বর্ণনার সঙ্গে কোথায় যেন সাদৃশ্য আছে।

শিল্পী পরে বলেছিল, The girl was so amazingly beautiful—a sort of unearthly beauty. I agreed.

সেদিন সেই রূপসী তরুণী যে কয় মিনিট সিটিং দিয়েছিল তাতেই ছবির কাজ অনেক এগিয়ে গেল। পরদিনও আবার ঠিক সময়ে এল সে। আর্টিস্টের মনে হল যেন ভোরের শিশিরে ভেজা একটা ডালিয়া কি ক্রিসান্থিয়ামই যেন ঘর আলো করে এসে দাঁড়াল। শিল্পী স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। মৃদু হেসে সে বলল, হাঁ করে তাকিয়ে দেখছেন কি! নিন আরম্ভ করুন—

আর একটিও কথা না বলে ছবি আঁকতে শুরু করল শিল্পী। রহস্যময়ী সেই সুন্দরী কিন্তু আগের দিন যে কয়েক মিনিট থেকেছিল আজ ঠিক সেই সময়টুকু হয়ে যেতেই কিসের যেন যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠে পড়ল। দ্রুত অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, আমি আর এক মুহূর্তও থাকতে পারব না বুঝলেন, বলেই ঝড়ের বেগে চলে যেতে যেতে দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, এক ভদ্রলোক এসে আমার এই ছবিটা চাইবে। আপনি তাকে এই পোর্ট্রেট বিক্রি করে অনেক টাকা পাবেন—

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই আবার হঠাৎ অসময়ে এসে হাজির হল কপারফিল্ড। আরো অস্থির, বিক্ষুব্ধ—প্রায় অর্ধোন্মাদ!

কৈ, আপনি আমার কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না—কেমন যন্ত্রণায় কঁকিয়ে চিৎকার করে বলল সে। আবার কি মনে করে খুব শান্ত আর সংযত হয়ে শিল্পীর হাত দুটো ধরে অনুনয় করে বলল, আমার মেয়ের চেহারার বিবরণ ডিটেলস দিয়েছি—আপনি তাকে বেস করে পারেন না—বলতে বলতেই উদ্গত কান্নার আবেগে তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল। তার সেই ব্যাকুল ও করুণ অনুরোধের কথাগুলোর ভেতরে নিদারুণ সেই হাহাকারের সুরে শিল্পী অত্যন্ত বিব্রত বোধ করল। কি করে—কেমন করে কন্যার শোকে পাগল এই ভদ্রলোককে শান্ত করবে ভেবে পেল না!

কি ভাবছেন?

কিছু না—

তাহলে চলে যাব শুধু হাতে?

তবুও শিল্পী কোন কথা বলল না। হঠাৎ তার মনে পড়ল অপরিচিত সেই সুন্দরী তরুণীর যে ছবিটা এঁকেছে সে—সেটা ওকে দেখানো যাক না। যদি তার মেয়ের চেহারার আদল তার ছবির ভেতরে পেয়ে যায়।

ঝড়ের বেগে স্টুডিওতে গিয়ে সেই 'পোর্ট্রেট'টা নিয়ে এসে বলল, দেখুন তো আপনার মেয়ের মত কিনা?

আরে করেছেন কি!—এই তো আমার মেরী—মেরী—অবিকল আমার মেরী—ছবিটাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে বদ্ধ উন্মাদের মত চিৎকার করতে লাগল। তীব্র উচ্ছাসে উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে উদভ্রান্তের মত বলল, কিন্তু এই পোট্রেট আপনি করলেন কি করে—স্পেশিমেন কোথায় পেলেন?

এই মেয়েটি নিজেই আমার কাছে এসেছিল—

কি! প্রবল উত্তেজনায় কপারফিল্ড একটি কথাও আর বলতে পারল না। তার দুটো চোখ কেমন গভীর আর উদাস হয়ে উঠল। তার মনে হল—মনে হল অত্যন্ত আকুল হয়ে তার মেয়ে—তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় মেয়ে মেরীর একটা প্রতিকৃতি চেয়েছিল বলেই কি সে পরলোক থেকে সূক্ষ্ম-দেহে এই শিল্পীর কাছে এসেছিল—As he had inccssantly and ardently prayed for a portrait of his daughter who had managed to make herself to this Painter·······

এই আশ্চর্য এবং অলৌকিক ঘটনা প্রসঙ্গে প্রেততত্ত্ববিদ লেডবীটার কি বলেছেন জানেন—কপারফিল্ড তার মৃতা কন্যার জন্য বড় বেশি ব্যাকুল হয়েছিল। এই আকুলতাতেই মেরীর বিদেহী আত্মা তার পিতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে এমন একজন শিল্পীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়েছিল যিনি তাঁর ছবি তৈরি করতে পারবেন—This done she had impressed upon her father to send for the identical Painter.

দেখলে তো স্পিরিটের শুধু অস্তিত্বই নয়। আত্মা রীতিমত আবির্ভূত হয় এবং চিত্রকরের ক্যানভাসে বা ক্যামেরার লেনসে ধরাও দেয়। তবে স্পিরিট ফটোগ্রাফির কথা যখন বাই দি বাই উঠেই গেল তখন তোমাকে এই প্রসঙ্গে আরো কিছু বলা দরকার—

জান সবচেয়ে প্রথমে বিদেহী আত্মার ছবি তুলেছিলেন ফ্রান্সের বিখ্যাত মণীষি অধ্যাত্মবাদী ফিচেট (Fichet)। অধ্যাপক ফিচেট অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের সদস্য এবং ইউরোপের বিজ্ঞানজগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। অতএব তাঁর গবেষণা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্যারিসের 'ট্রুথ' পত্রিকায় তাঁর তোলা অতিপ্রাকৃত জীবের (বিভিন্ন প্রেতাত্মাও দেবযোণীর) ছবিগুলি ছাপাও হয়েছিল। প্রেততত্ত্ববিদ লর্ড কেলভিন এবং ডক্টর হেলমোলটেজও সেই ছবিগুলো দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।

ট্রুথ পত্রিকার সংবাদদাতার দীর্ঘ বিবরণে জানতে পারা যায়, কি করে ডক্টর ফিচেটের ক্যামেরায় প্রথম স্পিরিটের ছবি ফুটে উঠেছিল—বাড়ির নির্জন কোণে এক ঘন অন্ধকার ঘরে ক্যামেরা নিয়ে বসেছিলেন ফিচেট। তাঁর একান্ত এক প্রিয়জনের আত্মাকে একাগ্র মনে স্মরণ করে সাটার টিপে চলেছিলেন—ক্লিক্-ক্লিক্-ক্লিক্—

না। কোন প্লেটেই তো সেই স্পিরিটের ছায়াদেহের অস্পষ্ট আভাসও ফুটে

উঠছে না। ডজন ডজন প্লেট ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিলেন। বলাবাহুল্য ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তাহ'লে—তাহলে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে বিদেহী আত্মাকে আকর্ষণ করে নিয়ে এলে সেই ধূসর ছায়াদেহ থেকে একটা তীব্র জ্যোতির মত (Luminous) আলো বিচ্ছুরিত হয়। সেই জ্যোতির্ময় রেখার ভেতরেই প্রেতাত্মার স্পষ্ট প্রতিকৃতি ফুটে ওঠে—ক্যামেরায়—তাঁর জীবনব্যাপী এই গবেষণা তাহলে ভিত্তিহীন—মিথ্যা!

এমন সময় একদিন তাঁর নজরে পড়ল, ক্যামেরার লেনসের ঠিক মাঝখানে একটি আলোর বিন্দু জ্বলজ্বল করছে। গুর গুর করে উঠল তার বুকের ভেতরটা। একটু একটু করে সেই বিন্দু আরো বড় আরো আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর সেই আলোর ছটার ভেতরেই একটি প্রতিকৃতির মুখাবয়ব স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে—মুখ—

তাঁর স্ত্রীর। তিনবছর আগে মারা গিয়েছিল।

শোন—স্পিরিট ফটোগ্রাফির আলোচনা যখন উঠেই গেল তখন সাগরপারের দেশে দেশে আর কোথায় কোথায় আত্মার প্রতিকৃতি তোলার মত আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা ঘটছে তাও আপনার জানা দরকার।

বর্তমান শতকের একেবারে গোড়ার দিকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত—প্রেততত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিনে স্পিরিট ফটোগ্রাফির এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ ছাপা হয়েছিল। আর এই আশ্চর্য ঘটনা সম্বন্ধে সম্পাদকীয় নোটে ছিল—

The following communication from Mr. Robert Jhonstone —102 North street, Barking street East. Jhonstone appeared in Spirit photographic venture only few years ago.

রবার্ট জনস্টন।

১০২ নর্থ স্ট্রীট—বার্কিং স্ট্রীট-ইস্ট।

জনস্টন মাত্র কয়েকবছর আগে থেকে আত্মার প্রতিকৃতি তোলার দুরূহ প্রচেষ্টায় নেমেছেন। পরলোকের বিদেহী বা অশরীরি আত্মাদের ছবি তুলতে গিয়ে তাঁর বিচিত্র ও আশ্চর্য অভিজ্ঞতার বিবরণ এখানে সংক্ষেপে তাঁর জীবনীতেই বলা হল—

আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না। একটি দুইটি নয়—আমার ক্যামেরার লেনসে কেমন করে যেন ফুটে উঠেছিল পর পর চারটি মৃত মানুষের স্পষ্ট প্রতিকৃতি—

(ক) আমার বড় বোন—'বড়দি' (খ) তাঁরই আর একটি ছবি যা আমি এবং আমার সহকর্মী বন্ধুরা স্পষ্ট চিনতে পেরেছিলাম (গ) মিসেস নেলী পাওয়ার হাস্যকৌতুকের প্রখ্যাত অভিনেত্রী। (ঘ) আর আমার স্ত্রীর ছোট বোন—

এঁরা প্রত্যেকেই প্রায় চল্লিশবছর আগে গত হয়েছেন। এঁদের চেহারা যে কি করে আমার ক্যামেরার সেন্সিটাইজড প্লেটে ধরা পড়ল, আমি বহু চেষ্টা করেও বুঝতে পারিনি। আর আরো বেশি অসম্ভব মনে হয়েছিল এই কারণে যে—আমরা মাত্র দুইটি প্রাণী—আমি আর আমার ফটোগ্রাফার বন্ধু দুজনে পালা করে ছবি তুলছিলাম। একবার সে থাকছে ক্যামেরায়, আর একবার আমি। একবার সে আর একবার আমি পোজ নিয়ে বসছিলাম। কিন্তু কি করে, কোন রহস্যময় কারণে আমাদের দুজনেরই অস্তিত্ব একেবারে নস্যাৎ করে দিয়ে প্রেতলোকের সেই বিদেহী আত্মাদের প্রতিকৃতি ফুটে উঠল—সেটাই অলৌকিক—সেটাই অতিপ্রাকৃত কোন বুদ্ধিতেই এসবের ব্যাখ্যা চলে না। সেই শুরু হল—সেই থেকে শুরু হল—স্পিরিট ফটোগ্রাফি নিয়ে আমার নিরলস গবেষণা—

তার আগে, মনে হয় বলা দরকার—আমি কেমন করে ছবি তুলতাম—স্টুডিও বলতে কিছু ছিল না। আমার ফটোগ্রাফার বন্ধুর বসার ঘর বা পারলারের মাঝখানেই ক্যামেরা বসিয়েছিলাম। সেই ঘরের একদিকে দুটো বড় বড় জানলা পর্দা দিয়ে ঢাকা ছিল। আর সেই ঘরের দরজার ঠিক বাইরে বাঁদিকে ছোট ঘরটা ছিল আমাদের ডার্করুম। সেখানে কিছু প্রয়োজনীয় কেমিক্যালস, লাল একটা আলো আর খুব শক্তিশালী ম্যাগনেসিয়ামল্যাম্প আর কতগুলো শুকনো অর্থাৎ ড্রাই সেনসিটাইজড প্লেট (সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন প্লেট—ছবি তুলতে যার প্রয়োজন হয়) ছিল।

বেশ স্পষ্ট মনে আছে, প্রথমে আমার ছবি তোলা হচ্ছিল। আমার দিকে ক্যামেরা তাক করে ফটোগ্রাফার মিঃ রীটা অনেকক্ষণ ধরে অ্যাডজাস্ট করতে করতে বলতে লাগল রেডী—রেডী! কিন্তু কিছুতেই সাটার টিপতে পারল না। হতাশ হয়ে অস্ফুট বিস্ময়ে বলল, কী আশ্চর্য বল তো ?

কি হল ?

তোমার সামনে ঝাপসা কুয়াশার মত কি যেন একটা এসে দাঁড়াচ্ছে বার বার—তোমার শরীরটাকে আড়াল করে দিচ্ছে—

আমি অবাক হলাম। সেই মুহূর্তে কোন কথা খুঁজে পেলাম না। আর প্রেতাত্মার কথা মনেব কোণেও উঁকিও দিল না। শুধু বললাম—আর একবার চেষ্টা করে দেখ—

রীটা সেই রহস্যময় কুয়াশার ছায়ার বাধা এড়িয়েই তুলে ফেলল আমার ছবি। কিন্তু নেগেটিভে দেখা গেল আমার দেহটার প্রায় অর্ধেকটাই সাদা চাদরে ঢাকা। প্রিন্ট করতেই সাদা অংশটা কালো হয়ে গেল। আমার হঠাৎ মনে হল, ডেফিনিটলি এসবই স্পিরিটের কারসাজি—It is a positive proof that spirits cover up the sitter with outstanding ability.—

আবার আমার মনে সন্দেহ উঁকি দিল—সত্যিই কি প্লেটে অশরীরি আত্মার ছবি ফুটে উঠেছে ? কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব। ক্যামেরার প্রতিটি প্লেট

শুকিয়ে 'সেনসিটাইজড' করে আমি আমার হেফাজতে রেখেছিলাম। অতএব সেখানে ফটোগ্রাফার কি আর কেউ কোন কারচুপি করতে পারবে না! দ্বিতীয়ত কোন অতি নিপুণ ক্যামেরাম্যানও অদৃশ্য কোন মানুষের (sitter) ছবি তুলতে পারে না। অতএব ক্যামেরার সামনে কুয়াশার কোন ছায়াদেহ নিশ্চয়ই এসেছিল।

এই প্রসঙ্গে আমি অনেক—অনেক ভেবে দেখেছি—আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয় প্রেততত্ত্ববিদ এবং স্পিরিট ফটোগ্রাফির বিশেষজ্ঞ প্রবীণ অধ্যাপক ডক্টর হেলমোলটেজের ব্যাখ্যা—কোন বিদেহী আত্মা আবির্ভূত হলেই মানবদেহ থেকে একটা অনুজ্জ্বল (Nonluminous) উপাদান (element) উৎপন্ন হয়ে ক্যামেরার সেনসিটাইজড প্লেটটাকে প্রভাবিত করে এবং সেটা সৌরশক্তির সংস্পর্শে আলোকে জ্জ্বল (Luminous) হয়ে ওঠে। এখন সূর্যকিরণ (Solarlight) আর মানবদেহ থেকে উদ্ভুত জীবনীশক্তির (Vital Force) একটি অদ্ভুত সমান্তরাল তৈরি হয়। প্রেতাত্মা এই জীবনদায়ী শক্তি থেকে নিজে আলোকোজ্জ্বল (Luminous) হয়ে এই দুই সমান্তরালকে সংযুক্ত করে অর্থাৎ ক্যামেরার লেনসের সামনে এসে দাঁড়ায় আর তখন প্লেটে ছবি ফুটে ওঠে। দীর্ঘকালের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে হেলমোলটেজ স্পষ্টই বলেছেন—Spirits can produce lnminous substance from the vital force of the human body and the parallel between light and this vital element is complete.

এই পর্যন্ত বলে রবার্ট জনস্টন জানিয়েছেন প্রেতাত্মার প্রতিকৃতি তুলতে হলে দরকার অপরিসীম ধৈর্য! যিনি ছবির জন্য সিটিং দেবেন তাকে শক্তিশালী 'মিডিয়াম' হতে হবে। আর বার বার সিটিং দিতে দিতেই প্রেতচ্ছায়া যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী হয়ে নিজের ছবিকে চিনতে পারার মত হয়ে ওঠে।

স্পিরিট ফটোগ্রাফির প্রসঙ্গেই যে কত অলৌকিক ঘটনা ঘটে আর তীব্র বিস্ময়ে আমাদের স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়।

মিস মাভিসমার্টিনকোর্ট!

অসামান্য রূপসী! দীঘল তম্বী দেহে উদ্দাম যৌবন। বড় বড় আর ভাসা ভাসা নীলাভ দুটো চোখ। গোলাপ রাঙা দুটো টোল ফেলা গালে কেমন হাসি হাসি সরলতা। খাড়া নাক, সুডৌল মুখ—সব মিলিয়ে আশ্চর্য একটা দীপ্তি মনে ছাপ রেখে যায়।

কিন্তু তার মৈরুমরালীর মত মৃদুমন্থর গতিতে চলা, বিনম্র কণ্ঠস্বর সুডৌল মুখে স্মিত প্রসন্ন হাসি—এসব দেখেশুনে মনে হয় তার অপর্যাপ্ত রূপের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে সে যেন তেমন সচেতন নয়। শুধু কি রূপ। গুণেও কম নয়। রীতিমত যাকে বলে বিদুষী। ইকনমিক্স বা অর্থনীতির এম.এ.। অক্সফোর্ডে কিছুকাল গবেষণাও করেছিল। লণ্ডনে একটি ব্যাংকে উঁচু পোস্টে চাকরি করে।

মিস মাভিসমার্টিনকোর্ট একদিন লণ্ডনের একটি স্টুডিওতে একটা ছবি তুলতে ফটোগ্রাফার তাকে ক্যামেরার সামনে বসিয়ে খুব সযত্নে আর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ছবি তুলল। বলল, ম্যাডাম আপনাকে ঠিক সময়ে ডেলিভারি দিয়ে দেব, একটু থেমে আবার বলল, তবে যদি সাকসেসফুল না হয়, তাহলে কষ্ট করে সেকেণ্ড সিটিং দিতে হবে—

দ্যাটস নো ম্যাটার—নো ম্যাটার, হেসে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল মাভিসমার্টিনকোর্ট।

কয়েকদিন পরেই স্টুডিও থেকে ছবি এল না। খবর এল—অনুগ্রহ করে একবার আসুন—

মার্টিনকোর্ট বুঝতে পারল সব। নিশ্চয়ই ছবি ভাল আসেনি। অতএব এতটুকু বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট না হয়ে আবার এল। ছবি তুলে চলে গেল।

কি ব্যাপার রে? একটা ছবি তুলতে কয়বার যেতে হয়? মার্টিনকোর্টের বৃদ্ধা বিধবা মা মেয়ের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

ওসব যন্ত্রপাতির ব্যাপার মা। গড়বড় হতেই পারে—

মা-কে থামিয়ে দিল। আর মনে মনে আশা করল, প্রথমবার হয়নি এবার নিশ্চয়ই হবে—কিন্তু—

এবারও হল না। স্টুডিও থেকে বেয়ারা এসে ডেকে নিয়ে গেল। এবারও হাসিখুশি, নম্র, অমায়িক মেয়ে মার্টিনকোর্ট একটুও বিরক্ত হল না। কিন্তু মনে খোঁচা দিতে লাগল একটা বিস্ময়—কেন এরকম হচ্ছে?

ঠিক প্রপার লণ্ডনেও তাদের বাড়ি নয়—তারা থাকে মেট্রোপলিসে বা শহরতলীতে। দুদিন পর পর কি এতদূর পথ পাড়ি দেওয়া যায়? তবুও—তবুও যেতে হবে। তার একটা বিসেণ্ট ফটোগ্রাফ যে চাই-ই চাই। তার মনের আয়নায় ভেসে ওঠে একটি ধারালো মুখ। আর অদ্ভুত এক খুশির শিহরণে যেন আরও রূপবতী হয়ে ওঠে—

আচ্ছা আপনার কি মাথা ধরা কি অনিদ্রা, এসব কোন উপসর্গ আছে? তিনবারের বার ক্যামেরার সামনে বসিয়ে যেন বিচক্ষণ ডাক্তারের মতই ফটোগ্রাফার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করে।

কেন বলুন তো? বিব্রত হয় মার্টিনকোর্ট।

দুই-দুইবার ফেল করেছি, ফটোগ্রাফার থেমে বলে, এবার এক্সট্রাঅর্ডিনারী প্রিকশান নিচ্ছি—।

মাথা ধরা—ইনসমনিয়া এসব আপনার ছবিতে উঠবে নাকি খিল খিল করে হেসে ওঠে মার্টিনকোর্ট। ক্যামেরাম্যানের মনে হল যেন কোন দূরের পাহাড় থেকে ঝরনা গড়িয়ে পড়ল। আর সেই হাসিতে কেমন মোহাচ্ছন্ন হয়ে উঠল স্টুডিওর ঘরটা।

মার্টিনকোর্ট ফটোগ্রাফারের কথায় বেশ কৌতুক বোধ করল। আর মধুর এক সুখের অনুভবে আবিষ্ট হয়ে ক্যামেরার সামনে 'পোজ' নিয়ে বসল।

ক্লিক্ !

এবার আর মিস হবে না ম্যাডাম—এবার একবারে প্রিণ্টেড কপিই আপনাকে পাঠিয়ে দেব—

কিন্তু না। হল না। হল না এবারও। স্টুডিও থেকে এল ভেরি আরজেণ্ট রেজিস্ট্রি চিঠি—ম্যাডাম! আপনার কোন আত্মীয় কি বন্ধু অর্থাৎ কোন সেকেণ্ড পারসন নিয়ে খুব শীগগীরই চলে আসুন—

আত্মীয় বা বন্ধু আর কাকে বলবে ?

মাকেই নেবে ঠিক করল। কিন্তু তার মা 'অ্যারিস্টোক্র্যাট কেণ্টিস জেণ্টেলম্যানের (কেণ্টের এক অভিজাত ভদ্রলোকের) স্ত্রী। যেমনি রাশভারি তেমনি প্রখর সম্মানবোধ।

কেন বার বার ভিখারীর মত আমাদের যেতে হবে! লণ্ডনে কি এই একটাই স্টুডিও? প্রচণ্ড বিক্ষোভকে সংযত করে শান্ত হওয়ার চেষ্টা করে। খুব ভারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্ফুটস্বরে বলে, এদিকে মার্চ মাস শেষ হতে চলল —কি করে যে কি করব—

কথা বলে না মার্টিনকোর্ট। অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকে। ছবি যে বার বার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার দায়িত্ব যেন তারই। বুকের ভেতরে একটা জ্বালা অনুভব করে। দূরে-বহুদূরে বার্মা মুলুকের জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের কোলে একটি মিলিটারী ক্যাম্প থেকে যে বার বার আসছে একটাই ব্যাকুল প্রার্থনা—কৈ—তোমার একটা ফটোগ্রাফ পাঠাতে পারলে না এখনও—

দুইজনকে যেতে লিখেছে কেন—কি হয়েছে ?

কি করে বলব—

মা আর মেয়ে স্টুডিওতে এল। ক্যামেরাম্যানের মুখখানা একেবারে ছাইয়ের মত সাদা। দু'চোখে কেমন ভয় বিহ্বল দৃষ্টি।

কি হয়েছে আপনার? তার স্বভাবমত মিষ্টি হেসে বলল মার্টিনকোর্ট। কিন্তু তীব্র বিস্ময়ে সে ভেতরে ছটফট করছিল—কি এমন ঘটতে পারে।

কী আর বলব ম্যাডাম ছাব্বিশ বছর ধরে ছবি তুলছি—কখনও এমন অলৌকিক ঘটনা দেখিনি, ফটোগ্রাফার ঝাপসা নিভু নিভু গলায় যেন আরও কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু—

বেশি ভনিতা শোনার সময় নেই আমাদের, ঝাঁঝি মেরে বলে উঠল মিসেস মার্টিনকোর্ট, অনেক করেছেন—এখন কী হয়েছে বলুন—

বলছি ম্যাডাম—বলতে বলতে তাড়া খাওয়া নেড়ি কুকুরের মত ডার্করুমের ভেতরে চলে গেল ফটোগ্রাফার!

বেরিয়ে এল একটি বড় কালো খাম নিয়ে। সেই খাম থেকে তিনবারের তিনটি নেগেটিভই টেবিলের ওপর রাখল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে একটা বাজ পড়ল। কারো মুখে একটা কথা নেই।

প্রতিটি নেগেটিভেই মার্টিনকোর্টের ছবি বেশ চমৎকার—যাকে বলে

'এক্সেলেণ্ট' উঠেছে—সেই হাসি হাসি বড় বড় দুটো চোখ। ধারালো মুখে শান্ত কমনীয়তা! কিন্তু—প্রত্যেক প্লেটেই দেখা যাচ্ছে মার্টিনকোর্টের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক। পরনে সামরিক পোশাক। তার উঁচু করে তুলে ধরা এক হাতে খাপখোলা তলোয়ার।

যদিও ভদ্রলোকের চেহারাটা কেমন ঝাপসা আর অস্পষ্ট—যার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ট—যার মনের কাছের মানুষ অর্থাৎ মিস মার্টিনকোর্টের চিনতে খুব বেশি অসুবিধা হয়নি—ব্রহ্মদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্ণেল-অরুণ্ডেল—তার বহুকালের প্রণয়ী এবং ভাবী স্বামী! মার্চ মাস পেরিয়ে জুন এসে পড়লেই বিয়ের বাজনা বেজে উঠবে। সব—সব ঠিক। কিন্তু—

আঁতকে উঠল বৃদ্ধা বহুদর্শী মিসেস মার্টিনকোর্ট। দুহাতে বুক চেপে ধরে অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে বিড় বিড় করে বলতে লাগল—নো—নো—ইট ইজ নট গুড—নট ফেয়ার—জীবিত মানুষের স্পিরিট দেখা ভাল নয়—

বিয়ে বাতিল হয়ে গেল। লণ্ডনের বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক টাইমসে অদ্ভুত এই অলৌকিক ঘটনাটির শিরোনাম—Astounding Freak of the camera which broke English Girl's engagement—তারপরে স্টাফ রিপোর্টার অবশ্য আরো লিখেছিল, এই আশ্চর্য ঘটনার বিবরণ (Facts) ইংল্যাণ্ডের সমগ্র বিজ্ঞানীসমাজকে আলোড়িত করে তুলেছিল…Agitating all scientific England. প্রেতবিদ্যার বিজ্ঞানী এবং গবেষকরা দীর্ঘদিন এই ঘটনাটি নিয়ে পরীক্ষানীরিক্ষা করে বলেছেন—মিস মাভিসমার্টিনকোর্টের মনে তার দূরদেশের প্রণয়ীকে নিয়ে গভীর চিন্তা, তার প্রতি আকর্ষণই তার মূর্তিকে নেগেটিভ প্লেটে ফুটিয়ে তুলেছিল! পরস্পরের প্রতি গভীর আসক্তি থাকলে কখনও কখনও এরকম ঘটতে পারে—বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যেতে পারে—Physico psychic phenomenon

স্পিরিট ফটোগ্রাফি নিয়ে তো অনেক কথাই হল। আশা করি এই জটিল ও রহস্যময় বিষয়টি সম্বন্ধে কিছুটা অলোকপাত করতে পেরেছি। তবে আমার কি মনে হয় জানেন, শোকার্ত পিতার ব্যাকুলতায় মৃত কন্যার বিদেহী আত্মা স্থূলদেহে আর্টিস্টের কাছে এসে সিটিং দেওয়া, ডক্টর ফিচেটের ক্যামেরায় পরলোকগত স্ত্রীর প্রতিকৃতি ফুটে ওঠা, লণ্ডনের রূপসী মেয়ে মিস মাভিসমার্টিনকোর্টের ছবির পাশে বারে বারেই তার প্রণয়ীর ছায়াদেহের ধূসর অস্পষ্ট দেহরেখার পরিস্কার আভাস—ইত্যাদি ঘটনাগুলো আপনার মনে ধূমায়িত করে তুলবে একটা সন্দেহ—এসব কি কখনো সম্ভব হতে পারে? মৃত মানুষের আত্মার ছবি বা প্রতিকৃতি কি কখনো তোলা যায়?

এই প্রসঙ্গে আপনাকে বলতে পারি—স্পিরিট ফটোগ্রাফির যে বিচিত্র

ঘটনাগুলো বললাম—সেসব-ই ট্রু ফ্যাক্টস (True Facts)। আর এইসব ইতিবৃত্তগুলো যাঁরা বলেছেন তাঁরা কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ বা অধ্যাত্মবাদী বা ভুবনবিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিদ। এঁদের স্পিরিট ফটোগ্রাফি নিয়ে গবেষণার সময়েই ঘটেছে এই অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলো। আমার মনে হয়, লেডবীটার ফ্লামেরিয়ান, ফিচেট প্রমুখ মণীষীদের অবিশ্বাস করা মানেই মানবমনীষাকে অগ্রাহ্য করা। যাক—শুনুন—প্রেতাত্মার ছবি তোলার ব্যাপারটা একেবারেই অসম্ভব বলে শুধু যে আপনারই মনে হতে পারে, তা নয়! ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, বোস্টন, চিকাগোতে তথা সারা আমেরিকায় গত শতকের পঞ্চাশের দশকে যখন স্পিরিট ফটোগ্রাফির একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল সেই সময় সেদেশের (আমেরিকা) এক প্রবীণ বিচারক কাগজে বিবৃতি দিলেন—স্পিরিট ফটোগ্রাফি বা মৃতের আত্মার ছবি সম্পূর্ণ 'বুজরুকি' বা ধাপ্পা—A complete fraud or Deception শুধু তাই নয় সেই সঙ্গে করলেন আরও একটা অদ্ভুত ঘোষণা—যদি কোন ব্যক্তি সত্যি সত্যি স্পিরিটের ছবি তুলতে সক্ষম হন তাহলে তিনি কি আদালতে এসে এই মর্মে শপথ (Affidavit) করতে পারবেন? সেই শপথনামার শেষে দস্তুরমত থাকবে—"আমার এই উপরোক্ত বিবৃতির কোন অংশ যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহা হলে আইন অনুযায়ী আমি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হব"—

জজসাহেবের এই স্টেটমেণ্টের সঙ্গে সঙ্গেই দেশজুড়ে বিদেহী আত্মার ছবি নিয়ে হৈ হৈ-টা একেবারে থেমে গেল। আর সেই বিশাল মহাদেশের কোন শহরের কোন প্রান্ত থেকেও খবর আসে না—কেউ ক্যামেরার প্লেটে প্রেতাত্মার চেহারা ধরে রেখেছে! অতএব স্পিরিট ফটোগ্রাফিটা যে একেবারে নির্ভেজাল চালাকি এবং প্রেততত্ত্ববিদদের একটা চমক (stunt)-এই ধারণাটাই ধীরে ধীরে লোকের মনে দানা বেঁধে উঠছিল এমন সময় যেন বাজ পড়ল।

ওয়াশিংটনের বিখ্যাত প্রভাতী কাগজ 'ওয়াশিংটনপোস্টে'র প্রথম পাতায় বড় বড় হেডিং দিয়ে বেরুল এই চাঞ্চল্য খবর—Spirit photography is a very hard fact। তারপরে কি লিখেছে জানেন। প্রেতাত্মারা ওয়াশিংটনের এক ফটোগ্রাফারের ক্যামেরার সামনে এসে শুধু ধরাই দেয়নি। বেশ পোজ করে হাসি হাসি মুখ নিয়ে ছবি তুলতেও বসেছে, তাদের হাস্যপ্রদীপ্ত মুখগুলো যেন নিঃশব্দে ঘোষণা করছে তাদের ইহলোকের জীবন্ত আত্মীয়-পরিজনদের কাছে—সুদূর পরলোকে কত সুখে শান্তিতে বাস করছে! আর মৃত্যুর পর রহস্যময় সেই রাজ্যের বাসিন্দা হয়ে তারা দেখতে কেমন হয়েছে—সেটা জানানোরও উদ্দেশ্য ছিল মনে হয়।

যাঁরা ছবি তুলতে গিয়ে তাদের মৃত আত্মীয়-পরিজনদের প্রতিকৃতি পেয়ে বিস্মিত হয়েছেন তাঁরা দুজনেই ওয়াশিংটনের বিশিষ্ট নাগরিক। তাঁরা এই প্রসঙ্গে কোর্টে এফিডেভিটও করেছেন। তাঁদের শপথ পত্রের (Affidavit) পূর্ণ

বিবরণ এখানে দেওয়া হল—

এইখানেই আপনাকে বলা দরকার, দুই খুড়ো-ভাইপো এই ঘটনার কুশীলব। তাঁরা দুইজনই অ্যাফিডেভিট্ করেছেন। তাঁদের দুইজনেরই হলপনামার বিবরণ যেমন দীর্ঘ তেমনি ক্লান্তিকর। তাই তাঁদের অ্যাফিডেভিটের মূল বিষয়বস্তুগুলো সংক্ষেপে আপনাকে জানাচ্ছি—

হার্বার্ট অ্যান্ড্রুজের অ্যাফিডেভিট্

১৩৪৩নং ইউক্লিড স্ট্রীট ওয়াশিংটনের বাসিন্দা ক্যামেরাম্যান ডবলিউ কিলারের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা নিয়ে আমি এইচ. অ্যান্ড্রুজ আদালতের মহামান্য নোটারী পাবলিকের (জজসাহেব) কাছে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি—

কয়েকমাস আগে আমি এই ফটোগ্রাফারকে চিনতাম না। কখনো কোথাও দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। কিন্তু ছবি তোলার কাজে তাঁর পাকা হাত বা খুব নামডাক শুনেছিলাম। আরও শুনেছি তিনি নাকি খুব গোপনে ভূতপ্রেতের ছবিও কখনো-সখনো তুলে থাকেন। কিন্তু এই অসম্ভব অলৌকিক ব্যাপারটায় আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না।

২রা নভেম্বর ১৯০৫ আমি আমার ভাইপো জোসেফ উইলিয়মকে নিয়ে শুধু নিছক কৌতূহল নিয়ে মজা করার জন্যই গিয়েছিলাম তাঁর স্টুডিওতে। প্রথমে আমার দুই কপি কোয়ার্টার সাইজের ছবির অর্ডার দিয়েছিলাম। আমাকে ক্যামেরার সামনে বসিয়ে ফটোগ্রাফার মিঃ কিলার হঠাৎ আমার কাছে এসে চাপা গলায় বললেন, আপনি কি আপনার মৃত আত্মীয়পরিজনদের ছবি সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড ?

হ্যাঁ—পারবেন ? উৎসাহে আমার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল।

অল্ রাইট ! বলেই স্টুডিওর আলো নিভিয়ে দিলেন। ঘন কালো নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে গেল ঘরটি। আর কয়েকমুহূর্ত পরেই সেই অন্ধকার ঘরের দূর কোণ থেকে দৈববাণীর মত ভেসে এল কিলারের ভরাট গম্ভীর কণ্ঠস্বর—যাঁদের ফটো চান তাঁদের কথা ভাবুন—ভাবুন—এক মনে ভাবুন—মনটাকে কনসেন্ট্রেট করুন—তার কথাগুলো যেন এক সুতীব্র সম্মোহনী শক্তি বহন করে কোন সুদূর পরলোক থেকে ভেসে আসছে। আস্তে আস্তে কেমন অসাড় হয়ে এল আমার স্নায়ু। স্তিমিত হয়ে এল চেতনা—

ক্লিক্—ক্লিক্—নিস্তব্ধ ঘরে ক্যামেরার সাটারের শব্দ হল।

কিলার বললেন—ডাকে আপনার ছবি পাঠিয়ে দেব—সত্যিই ঠিক দিন তিনেক বাদে আমার নামে এল একটা এনভেলপ। সেই খাম খুলতেই বেরিয়ে পড়ল দুইটি ফটো। দুটোই গ্রুপ ফটো।

সে কী ! গ্রুপ ছবি কি করে হল ? এরা কারা !

আমার ছবির পিছনে তিনটি মুখ। একটু অস্পষ্ট আর ঝাপসায় তাদের মুখের দিকে তীক্ষ্ন চোখে তাকাতেই আমার শরীরের ভেতরটা যেন শির-শির

করে উঠল। আর মনে হল, হিমশীতল একটা জলের স্রোত যেন ছুটে চলেছে হু হু করে। আমি পরিস্কার চিনতে পারলাম সেই তিনজনের ভেতরে একজন আমার বাবা—চার্লস অ্যান্ড্রুজ। ১৯০১ সালের বসন্তকালে কানসাস স্টেটের কনকর্ডিয়া শহরে তাঁকে যখন শেষ দেখেছিলাম তাঁর সেই আশী বছর বয়সের চেহারা ফুটে উঠেছে ছবিতে। ১লা নভেম্বর, ১৯০১ সালে কানসাসের-ই লিভেনওয়ার্থ শহরে মারা গিয়েছিলেন তিনি। এখানে বলা দরকার, ১৮৮১ সালের পর তাঁর কোন ছবিই তোলা হয়নি।

আর দুইটি মুখ—আমার দুই কাকার—উইলিয়াম এবং হারমন অ্যান্ড্রুজ। তাঁদের অনেক—অনেকদিন আগে শেষ দেখেছিলাম। এদের পিছনে উঁকি দিচ্ছিল আরও একটি মুখ। সে মুখ আমার মায়ের মুখের আদল। মনে হল—আমার ঠিক ওপরের ভাই মার্ভিন ছোটবেলায় কী একটা দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল। তখন আমার বয়স সাড়ে চার বছর। মা-বাবার কাছে শুনেছিলাম —তার ছবি কখনো তোলাই হয়নি!

আমি ছবিগুলো পাঠিয়ে দিলাম এমন কিছু লোকের কাছে যাঁরা ওই মৃত মানুষদের চিনতে পারবেন। শুনলে আপনি বিস্মিত হবেন যাঁদের কাছে পাঠিয়েছিলাম তাঁদের ভেতরে অন্তত সাতজন আমার পিতৃদেবকে পরিষ্কার চিনতে পেরেছেন। তাঁদের ভেতরে দুইজন—জোসেফ এল. উইলিয়ম এবং এইচ. এইচ অ্যান্ড্রুজের এই মর্মে বিবৃতিও এখানে জুড়ে দিলাম। এবার আমার ও বাবার পরিচিত বিশজনের কাছে পাঠালাম পিতৃদেবের শেষ ফটোগ্রাফ (১৮৮১ সাল) এবং সেই সঙ্গে মিঃ কিলারের তোলা গ্রুপফটোর কপি। তাঁদের ভেতরে আঠারজন পাশাপাশি দুটো ফটো রেখে অনেক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বিনাদ্বিধায় নিশ্চিত হয়ে মন্তব্য করলেন গ্রুপছবির ভেতরে আমার বাবার এবং কাকাদের ছবিগুলো তাদের প্রেতাত্মার ছবি—Spirit Picture.

আমার এই উপরোক্ত বিবৃতির প্রতিটি বিষয়, প্রতিটি অক্ষর আমার জ্ঞান মতে সত্য।

হার্বার্ট অ্যান্ড্রুজ।

তার নিচে আবার জজসাহেব নোট দিয়েছেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬ মিঃ অ্যান্ড্রুজ এই শপথনামা আমার কাছে দাখিল করেন। আমি এখানে সুপারিশ করি হলপনামাকারী বা অ্যাফিয়্যান্ট আমার বিশেষ পরিচিত। তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি।

এডুইন ডি প্রেস

(আদালতের সীলমোহর) নোটারী পাবলিক

স্পিরিট ফটোগ্রাফির আরও নজিরের প্রয়োজন আছে—মনে করি না। আশা করি প্রেতাত্মার প্রতিকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করতে পেরেছি।

নমস্কারান্তে— ইতি—

তৃতীয় প্রেতমণ্ডল

Demonical possession or Sexual Crage ?—Stead
দৈত্যসুলভ প্রেতের নিষ্ঠুর পীড়ন, না, যৌন অতৃপ্তির জ্বালা ?

আচ্ছা 'ভূতে ধরা' কথাটার মানে কি ?

এবারের পত্রলেখক লিখেছেন, আমরা প্রায়ই শুনে থাকি অমুককে ভূতে ধরেছে, কোন মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মা নাকি ভর করে জীবিত মানুষের দেহে। আর সেই প্রেত তখন তার মুখ দিয়ে কথা বলে। সে চিৎকার করে, হাসে, কাঁদে—এক কথায় উন্মত্তের মত আচরণ করে। যুগ-যুগান্তর থেকে আমাদের সমাজে প্রচলিত এই জনশ্রুতির আড়ালে কি কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে ? সত্যিই কি অশরীরি আত্মা কাউকে ভর করতে পারে ? না, সাধারণ মানুষের মনের অন্ধ বিশ্বাস, অহেতুক গোঁড়ামী এবং প্রেতাত্মা সম্বন্ধে অহেতুক ভীতি ?…

এই চিঠি লিখছেন ইছাপুর থেকে অরিন্দম সরকার। তিনি আরও লিখেছেন—আপনাকে সবিনয়ে বলি আমি প্রেততত্ত্বের ওপরে কিছু পড়াশুনা করেছি। দেখছি, 'ভূতে ধরা' ব্যাপারটা ইউরোপ, আমেরিকা তথা পৃথিবীর সব দেশে সবকালেই আছে। প্রেতবিদ্যার ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভূত ধরাকে বলেছেন —'পজেশন' (Possession) আর ভারতীয় অধ্যাত্মবাদী এবং প্রেততত্ত্ববিদরা তাকেই বলেছেন পরকায়া প্রবেশ। কোন এক বিখ্যাত বাঙ্গালী পরকালবিশেষজ্ঞ বলেছেন "একজনের আত্মা অন্যের দেহে প্রবেশ করিলে তাহাকেই বলে পরকায়া প্রবেশ"।

তারপরেও অবশ্য তিনি এই প্রসঙ্গে আরও অনেক কথাই বলেছেন, কত রকমের পরকায়া প্রবেশ আছে। জীবিত বা মৃতব্যক্তির আত্মা কি করে নিজের দেহ পরিত্যাগ করে আর একজনকে ভর করে বা প্রবেশ করে—ইত্যাদি আরও অনেক কথা—অনেক তত্ত্ব। কিন্তু আপনাকে বলতে বাধা নেই—তাঁর বক্তব্য—তাঁর প্রতিটি কথাই আমার কাছে রহস্যময় ও দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। আর সত্যি বলতে কি তাঁর লেখাটি পড়ার পর থেকেই আমি মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করছি—মৃত্যুর পরও আত্মার অস্তিত্ব থাকে; কোন কোন সময় পরলোক থেকে অশরীরি আত্মা সূক্ষ্মদেহ নিয়ে নিজের প্রিয়জনদের দেখাও দিয়ে থাকে—প্রেতবিদ্যার এসব তত্ত্ব কিছুটা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু বিদেহী আত্মা কি করে ইহলোকের জীবিত মানুষের ওপর ভর করে কি করে তার দেহমন আত্মা এবং সমস্ত সত্ত্বাকে আচ্ছন্ন করে দেয় প্রেতলোকের এই রহস্যময় বিষয়টি সম্বন্ধে যদি আপনি কিছু বলেন………

মাননীয়েষু,

অরিন্দমবাবু। গোড়াতেই বলে রাখি প্রেতলোকের যে-কোন কর্মকাণ্ডই শুধু রহস্যময় নয় অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতই বলা যায়। এই যে অন্ধকার রাত্রে কোন পুরানো বাড়ির ভাঙ্গা পাঁচিলের আড়ালে হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়—কোথায় থেকে আসে এই প্রেতচ্ছায়া—কেন আসে? এসবের কোন উত্তর নেই। দেশীবিদেশী পরকালবিদরা শুধু বলেছেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের আত্যান্তিক বিনাশ হয় না। তাঁর আত্মার অস্তিত্ব থাকে। আর সেই অশরীরি আত্মাই কখনো কখনো সাবেকজীবনের আকর্ষণে এবং আত্মীয়পরিজনের সান্নিধ্যের আশায় ইহলোকে 'আসে। এছাড়া আর কোন যুক্তি স্পিরিচুয়ালিস্টরা দিতে পারেননি। আর ব্যাখ্যা বা যুক্তি দেবেনই বা কি? মৃত্যুর পর পরলোক নামে চিররহস্যময় এক নতুন জগতের অস্তিত্ব, মানুষের আত্মার যে বিনাশ হয় না, বিলীন হয়ে যায় না পঞ্চভূতে—এসবই তো অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কল্পনা। আজ পর্যন্ত এসব কথার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি জানতে পারা যায়নি।

প্রেততত্ত্বের অন্যান্য বিষয়ের মত ভূতে ধরা বা পরকায়া প্রবেশের ব্যাপারটাও নিঃসন্দেহে বড় জটিল আব দুরূহ। তবে একমাত্র এই পজেশনের বা ভূতে ধরা অথবা ভূতে পাওয়া অর্থাৎ পরকায়া প্রবেশের ভেতরেই যেন কিছুটা সায়েন্টিফিক বেসিসের ছিটে ফোটা আভাস পাওয়া যায়। আমার এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের একটি সত্য ঘটনা বলি—

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নীলাচল আলো করে বাস করছেন। সমবেত কণ্ঠে নামগান আর সেই সঙ্গে খোল করতাল-মৃদঙ্গের ঐকতানের সুমধুর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে নীলাচলের আকাশ বাতাস।

একদিন ভক্তদের উপদেশ দিচ্ছেন আর থেকে থেকেই কেন যেন শিষ্যদে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি যেন দেখছেন। হঠা থেমে গেলেন মহাপ্রভু।

ভক্তদের ভেতর থেকে হাতছানি দিয়ে এক তরুণ শিষ্যকে কাছে ডাকলেন তার কানে কানে ফিস ফিস করে কি যেন বললেনও। অন্যান্য ভক্তর কেউ তেমন কিছু মনেও করল না। এই যুবক শিষ্য নকুল ব্রহ্মচারীকে মহাপ্রভু অত্যন্ত স্নেহ করেন। নকুল রূপবান। মহাপ্রভু আদর ক তাকে বলেন 'কনক কেতকী কুসুম গৌর।' সত্যিই কেয়াফুলের মত দীর্ঘ সুঠাম তার চেহারা। গায়ের রঙ সোনার মত। শুধু রূপ নয় তার স্বভাবটাও মিষ্টি।

মহাপ্রভু যাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসেন তার সঙ্গে তো কো শলা পরামর্শ কি গোপন কথা তো থাকতেই পারে। এতে আর আশ্চয হওয়ার কি আছে? তাই তারা চুপচাপ থাকল।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর অনবদ্য ভঙ্গিতে মৃদুকণ্ঠে আবার উপদেশ দিতে শুরু

করলেন। আর কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে নকুলের দিকে কেমন গভীর তন্ময় চোখে তাকাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরই হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল—

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের কথা শুনতে শুনতে অদ্ভুত একটা আবেশে বিভোর হয়ে আসছিল নকুল। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। আর উদভ্রান্তের মত চিৎকার করে বলল—ভাই—কৃষ্ণ বল—কৃষ্ণ বল ভাই—কৃষ্ণ বল—বলেই মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে দু'হাতে তালি বাজাতে লাগল। সারা আসরে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগল—ভাই কৃষ্ণ বল—তারপরেই হঠাৎ দুইহাত তুলে নাচতে শুরু করল। আর মুখে সেই এক বুলি—ভাই কৃষ্ণ বল—

মহাপ্রভুর মুখে একটা কথা নেই।

কিসের যেন মধুর আবেশে বিভোর হয়ে রয়েছেন তিনি।

ভক্তরা বিস্মিত।

নকুল যেন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল। কখনো হো হো করে হাসছে, কখনো গান করছে আবার কখনো কাঁদছে। তার সেই ভাবাবেশে বিহবল এবং প্রায় উন্মত্তের মত আচরণ দেখে এইবার ভক্তদের হঠাৎ বিদ্যুত চমকের মত মনে হল, নকুলের দেহে নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রবেশ হয়েছে।

চৈতন্যচরিতামৃত এবং গৌরাঙ্গের অন্যান্য লীলাগ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করে স্পষ্ট বলা হয়েছে বেশ কিছুকাল নকুলের দেহ অবলম্বন করে শ্রীগৌরাঙ্গ তার ভক্তিধর্ম প্রচার করেছিলেন।

মহাভারত রামায়ণ এবং বিভিন্ন পুরাণে পরকায়া-প্রবেশের আরও অনেক নজির আছে।

অরিন্দমবাবু! স্মরণ রাখবেন, ভূতে পাওয়া বা পরকায়া প্রবেশ আছে দুই রকমের—জীবিত মানুষের আত্মা নিজের দেহ ত্যাগ করে অন্য কোন জীবিত বা মৃতের দেহে ভর করতে পারে। যেমন দেখলেন নকুল ব্রহ্মচারীর ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত কোন পরলোকগত আত্মাও কোন জীবিত বা মৃতের দেহে আবির্ভূত হতে পারে।

মৃত মানুষের প্রেতাত্মার ভরের কথা পরে বলছি। প্রথমে দেখা যাক জীবিত ব্যক্তির আত্মা কেমন করে অন্য লোকের দেহে প্রবেশ করে থাকে। আমাদের দেশের বহুদর্শী অধ্যাত্মবাদী এবং প্রেতবিদ্যার প্রবীণ পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন সাধারণত তিনটি উপায়ে আত্মা অন্য কোন লোকের দেহে প্রবেশ করতে পারে বা ভর করতে পারে (১) ঘুমন্ত অবস্থায় (২) যোগবলে এবং (৩) বশীকরণ বিদ্যাবলে।

একেবারে সত্যি ঘটনা বলছি শুনুন। বেশিদিনের কথা নয়। ষাট কি সত্তর বছর আগেকার এই ঘটনা।

উত্তরবাংলার পশ্চিম দিনাজপুর জেলার জীবনসরণী—আত্রাই নদী। এই নদীর তীরে বড় ব্যবসা কেন্দ্র—বেশ বড় গঞ্জ পার-পতিরাম বা

পতিরাম। পতিরাম থেকে কাঁচামাটির এবড়ো খেবড়ো রাস্তা ধরে বিশ মাইল উত্তরে গেলে পাওয়া যাবে এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম উদয়পাঁচগাঁ।

দুদিকে দিগন্ত ছোঁয়া ধানের ক্ষেতের বুক চিরে চলে যাওয়া লাল মাটির রাস্তা ধরে যেতে যেতে গ্রামে পৌঁছানোর আগেই নজরে পড়বে এক বিশাল চকমিলানো টিনের বাড়ি। তার চারিদিকে আমজাম আর লিচু গাছের বাগান।

কার বাড়ি?

আপনার এই প্রশ্ন শুনেই উদয়পাঁচগাঁর যে কোন লোক অবাক হবে। আর আপনার ডাহা বোকামীর জন্য আক্ষেপ করে বলবে, হা হামার কপাল তাও জানেন না—উটাই তো হামাঘরে বাবুর বাড়ি—

'বাবু' অর্থাৎ গোপেশ্বর তালুকদার। উদয়পাঁচগাঁর ডাকসাইটে জমিদার। সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের মত একটু বেঁকে গিয়ে দুদিকে ঝুলে পড়েছে তার গোঁপ জোড়া। গলায় সোনার চেন ঝকমক করছে। বেশ লম্বা মানুষ। কিন্তু বেশ নধর আর পুষ্ট ভুঁড়ি আছে বলে একটু বেঁটে বলে মনে হয়। হাতে "পাশিংশো" সিগারেটের টিন।

বেশ হাসিখুশি দিলদরিয়া মানুষ। নিজের যাত্রার দল আছে। যাত্রার আসরে কনসার্ট পার্টির ভেতরে বসে ফ্লুট বাজায় গোপেশ্বর। চোখের ইসারায় আকারে ইঙ্গিতে বাজনদারদের পরিচালনাও করে। শুকনোর দিনে অর্থাৎ শীতের সময় তার যাত্রাদল নিয়ে গ্রাম গ্রামান্তরেও যায় সে।

যাত্রার আসর ছাড়াও একা একা বসে নিজের মনে বিভোর হয়ে ফ্লুট বাঁশী বাজানোর নেশাও আছে তার রক্তে। কোন কোনদিন নিশি রাতে যখন চাঁদের ফুটফুটে আলোয় দিগন্তবিসারী ধানের মাঠকে কুয়াশা ঘেরা এক বিশাল সমুদ্রের মত মনে হয় তখন হঠাৎ গ্রামের লোক শুনতে পায়—বাঁশীর করুণ এক মধুর সুর। সেই সুরের মুর্ছনায় চারিদিক কেমন আচ্ছন্ন আর বিবশ হয়ে যায়।

কিন্তু অরিন্দমবাবু আপনাকে মনে রাখতে হবে। গোপেশ্বর শুধু যাত্রাগান আর বাঁশী নিয়ে মাতামাতি করেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে তো এই কাহিনীর অবতারনা করতেই হত না। ঘটতো না সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। আর আমাকেও কোথাকার কোন গেঁয়ো জমিদার গোপেশ্বরের বৃত্তান্ত বিতং করে বলতেও হত না। কিন্তু—

মানুষের জীবন তো সোজা সরল রেখায় চলে না অরিন্দমবাবু। কোথায় কখন বাঁক নেয় আর পঙ্কিল হয়ে ওঠে, কেউ বলতে পারে না। যেমন হয়েছিল গোপেশ্বরের। ঘরে সুন্দরী স্ত্রী। একটি দুইটি নয়। ছয়-ছয়টি ছেলে আর এক মেয়ের ভরাভরতি সংসার নিয়ে খুশি থাকতে পারত সে। কিন্তু—

তা হয়নি। কেন হয়নি—সেটা পরে বলছি। তার আগে নিশ্চয়ই

বলা দরকার গোপেশ্বর যতই যাত্রার দল নিয়ে মেতে থাকুক, সংসারের প্রতি কর্তব্য কিন্তু ঠিক করে গিয়েছিল। মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। প্রতিটি ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। বলত, আমি মুখ্যু মানুষ বাবা। হেলাফেলা করে পড়াশুনা করিনি। তোরা পড়—যে যতদূর পারিস পড়—ছেলেদের লেখাপড়ার জন্য দু'হাতে খরচ করত সে।

বড়ছেলে যজ্ঞেশ্বর কলকাতায় রিপন কলেজে বি. এ. পড়ত থাকত হোস্টেলে। তার জন্য প্রতি মাসে মাসে টাকা পাঠাত সে।

অরিন্দমবাবু স্মরণ রাখবেন গোপেশ্বরের বয়স তখন পঞ্চাশের কোঠায়। আর যজ্ঞেশ্বর বিশবছরের স্মার্ট ছেলে। আর সময়টা—১৯২১। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারে সারা দেশ টলমল করছে। সেই সময়—

সেই সময় গোপেশ্বরের সুখের সংসারে প্রথম দেখা গেল অশনিসংকেত। প্রায়ই সে তার জমিদারীর বিভিন্ন মহল পরিদর্শন করতে যেত। সেখানকার খামার বাড়িতে দু-চারদিন থেকে ফিরে আসত। কিন্তু—

একবার এল না গোপেশ্বর। দেখতে দেখতে সাতদিন পেরিয়ে গেল। তবুও এল না। অস্থির হয়ে উঠল সুরমা। কোন গ্রামের কোন মহালে গিয়েছেন তাও বলে যাননি। তবুও বসে থাকলে তো চলবে না।

মেজছেলে কাশীশ্বরকে নিয়ে গবুর গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়ল সুরমা। এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে খুঁজতে খুঁজতে জানা গেল তিনি নাকি কুমারগঞ্জের কাছে গণ্ডগ্রাম জল্লইতে জ্বরে বেঁহুস হয়ে পড়ে আছেন।

গাড়ি ছুটিয়ে সুরমা এল জল্লইতে। কিন্তু না এলেই বোধহয় ভাল হত। জানা গেল কাতু বর্মনের বাড়িতে আছেন উনি। ছুটল সেখানে। দিনের বেলাতেই ঘুটঘুট্টি অন্ধকার একটা ঘুপচি ঘরের সামনে দাঁড়াল সুরমা। কিন্তু ভেতরে পা দিতেই কেমন ধক করে উঠল তার বুকের ভেতরটা। মাটির মেঝেতে খড় বিছানো একটা নোংরা বিছানায় শুয়ে আছে উদয়পাঁচগাঁর জমিদার গোপেশ্বব তালুকদার।

চোখ ফেটে জল এসে পড়ল সুরমার। জ্বরের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে সে। কিন্তু স্বামীর দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। দাঁড়াতে হল। ঘরের ঘন অন্ধকারে তার মনে হল কোন এক রমণী ঝুঁকে পড়ে তার মাথা টিপে দিচ্ছে। সেই আবছায়া অন্ধকারে চাদরও কিন্তু আড়াল করতে পারেনি তার যৌবনপুষ্ট উদ্ধত দেহছন্দ। তাকে দেখেই সে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল।

কি ব্যাপার তোমার—আমি কি একটা খবরও পেতে পারি না? সুরমার গলা ভার হয়ে এল।

তোমাকে জানানোর কোন উপায় ছিল না সুরো, চিঁ চিঁ করে বলল গোপেশ্বর, হঠাৎ রোদ লেগে জল্লইতে এসে অসুখে পড়ে গেলাম—

চল তোমাকে এক্ষুণি যেতে হবে, সুরমা ব্যস্ত হয়ে ওঠে, এখানে থাকলে

তুমি মরে যাবে গো—

গোপেশ্বর সুবোধ ছেলের মত স্ত্রীর সঙ্গে রওনা হচ্ছিল। এমন সময় গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক। বলল, সুরমাকে মা আমি খাসপুর স্কুলের টিচার। আপনার বড়ছেলে যজ্ঞেশ্বর আমার ছাত্র, একটু থেমে আবার বলল, আপনি আমার বাড়িতে একটু পায়ের ধুলো দেবেন? কয়েকটা কথা ছিল—

গোপেশ্বরের জ্বরতপ্ত মুখে অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। তবুও যেতে ইঙ্গিত করল। গেল সুরমা। সতীশ মাস্টার নয়—তার স্ত্রী এমন কতগুলো কুৎসিত কথা বলল সুরমার কানে কানে যে তার মনে হল সে বুঝি এখুনি টলে পড়ে যাবে। মনে মনে আকুল হয়ে বলল। হে রাধামাধব—ওই কথাগুলো যেন মিথ্যে হয়—

কিন্তু মিথ্যে হয়নি। কলঙ্কের কথা কখনো চাপা থাকে না। জানাজানি হয়ে গেল সব—কাতু বর্মনের যে বোনটাকে স্বামী ঘরে নেয় না, সেই সুনয়নী ওরফে সুনোর সঙ্গে গোপেশ্বরের অবৈধ প্রণয়ের খেলা চলছে বছর চারেক ধরে। যতবারই মহাল দেখার নাম করে বেরোয় ততবারই সোজা এসে ওঠে কাতুর বাড়ি। কাতুর জন্য নাকি একটা কোঠাঘর বানিয়ে দিয়েছে গোপেশ্বর। সুনোকে দান করেছে চার বিঘা জমি—মুখে মুখে আরও অনেক কথা পল্লবিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর—

তারপর যা হয়। তারপর সুরমার সঙ্গে শুরু হল সংঘাত—বলতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু তা তো হবার নয়। পাড়াগাঁর লেখাপড়া না জানা সাধারণ মেয়েমানুষ। তাতে আবার জমিদারের বৌ। এরা আবার কবে কোথায় স্বামীর ব্যভিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে? অতএব—

সুরমা বুক চাপড়াল। ঘরের চৌকাঠে মাথা ঠুকল। গোপেশ্বর কিন্তু তার গোঁ ছাড়ল না—তার বিলাসের সহচরী সুনোকে নিয়ে এই উদয়পাঁচগাঁতেই সকলের সামনে প্রকাশ্যে বাস করবে। কি দোষ তাতে? রাজাজমিদারদের তো দু'চারটে রক্ষিতা অমন আকছার থাকেই—

জলাই থেকে নিজের গ্রাম উদয়পাঁচগা নিয়ে এসে বাড়ি থেকে দূরে আম-জাম লিচুগাছ দিয়ে ঘেরা সেই বাগান বাড়িতেই সুনয়নীকে রাখার তোড়জোড় যখন শুরু হল তখন সুরমা বাধ্য হয়ে কলকাতায় ছেলেকে করল টেলিগ্রাম।

যজ্ঞেশ্বর এল।

গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী। পরণে হাতে কাটা খদ্দরের ধুতি। এর মাথা এলোমেলো উসখো খুসকো চুল। বড় বড় দুটো চোখে কেমন অন্যমনস্ক দৃষ্টি।

কি রে ভাল আছিস তো বাবা, নিজের ছেলের দিকেই কেমন সসম্ভ্রমে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল সুরমা।

কি হয়েছে মা—কি হয়েছে।

কোন কথাই বলতে পারল না সুরমা। অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ল। কী আশ্চর্য! আমাকে তুমি বলবে তো!

সেসব আমি কিছুই বলতে পারব না বাবা, কান্নাজড়ানো অস্পষ্ট গলায় বলল সুরমা—তুই নায়েবজ্যাঠার কাছে সব জেনে নে—

বাবা কোথায়?

ঘৃণায় সুরমার মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল। কটু গলায় বলল, জানি না বোধহয় বাগানবাড়িতে—

কৌতূহলের যন্ত্রণায় ভেতরে ভেতরে পুড়ে যেতে লাগল যজ্ঞেশ্বর। নায়েব মশায়ের কাছে সব জেনে কেমন পাথর হয়ে গেল। আর নিজেকে কেমন দুর্বল আর পঙ্গু বলে মনে হল। আর তার দুর্বার স্বপ্নের সেই জ্বলন্ত আদর্শবাদের পৃথিবীটা যেন একটু একটু করে ঝাপসা হয়ে এল।

ধীর পায়ে এল বাবার কাছে বাগানবাড়িতে। তাকে আসতে দেখেই দুপদাপ করে পা ফেলে পাশের ঘরে আত্মগোপন করল এক রমণী। তার শাড়ির আঁচল পলকে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

ইনি কে বাবা—এসব কি শুনছি—?

কিসের কি—কি! কেমন থতমত করেই হেসে পরিবেশটা হাল্কা করার জন্যই বলল গোপেশ্বর, পড়াশুনা ছেড়ে তোকে কলকাতা থেকে কে আসতে বলল।

তার কথা যেন শুনতেই পেল না যজ্ঞেশ্বর। শান্ত নম্রকণ্ঠে বলল, আপনি কি জানেন বাবা সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে। যার যা আছে সব বিলিয়ে দিয়ে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর আপনি—হঠাৎ থেমে গেল সে। আবার অস্পষ্ট গলায় সসঙ্কোচে বলল বিলাসব্যসন আর ব্যভিচার—

কী! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! হুঙ্কার দিয়ে উঠল উদয়পাঁচগাঁর জমিদার গোপেশ্বর—তোমাকে আমি মাসে মাসে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাঠাচ্ছি স্বদেশী করার জন্য? দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল, যাও দূর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে।

তারপরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত।

সেই রাত্রেই মা-কে প্রণাম করে কলকাতায় রওনা হয়ে গিয়েছিল যজ্ঞেশ্বর। আর দেশব্যাপী সেই গণআন্দোলনের ঝড়ে পাখা মেলে দিয়েছিল। ওদিকে গোপেশ্বর ঘোষণা করে বসল—যে ছেলে স্বদেশী করে তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখবে না। তা না করলে আগামী বছরে তার রায়সাহেব খেতাবটাকে বাতিল করে দেবে সরকার বাহাদুর!

সেই যে গেল যজ্ঞেশ্বর, আর ফিরল না। গ্রামে গ্রামে অহিংসার বাণী প্রচার করে। আর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে অসহযোগ আন্দোলনের।

ওদিকে আরও উদ্দাম আরও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে গোপেশ্বর। বাড়ির দিকে ভুলেও কখনো যায় না। দিনরাত বাগানবাড়িতেই সুনয়নীকে নিয়ে মত্ত সুখে বিভোর হয়ে থাকে। লুপ্ত হয়ে যায় তার বাইরের পৃথিবী। একটার পর একটা মহাল (ছোট আয়তনের জমীদারী) খাজনা বাকির দায়ে নিলাম হয়ে যায়। নায়েবমশায় কিছু বলতে এলে তাকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দেয়। ধীরে ধীরে নায়েব গোমস্তারা একে একে বিদায় নিয়ে চলে যায়।

দিন কাটে। মাস যায়। বছর ঘুরে আসে। সময়ের স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন গোপেশ্বরের সুখ-সহচরী বুদ্ধিমতী সুনয়নীর চাহিদা দ্রৌপদীর অন্তহীণ শাড়ির মত শুধু বেড়েই চলে। এক দুই বিঘে নয়, একশো বিঘে ধানী জমি নিজের নামে লিখিয়ে নেওয়ার পর মাসখানেক যেতে না যেতে আবার বায়না ধরে পাঁচহাজার টাকা দিতে হবে তার দাদা কাতু বাড়ি তুলবে—

ভেতরে ভেতবে গোপেশ্বর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছু বলে না। বলতে পাবে না। তার মনে হয় যেন কোন পাকা শিকারীর বহু দূর পর্যন্ত বিছানো জালে ধরা পড়ে গিয়েছে সে। কিছুদিন পরেই ঘটে গিয়েছিল সেই ভয়ানক দুর্ঘটনা।

কিন্তু সেকথা এখন থাক অরিন্দমবাবু। আপনাব মনে আছে হয়ত আমরা আলোচনা করছিলাম ঘুমন্ত অবস্থায় জীবিত মানুষের আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে বহু-বহু দূরে যেমন পরিভ্রমণ করে তেমনি অন্যলোকের দেহে প্রবেশও করতে পারে। কিন্তু এই তথ্যটির পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাটির বিবরণ হয়ে গেল দীর্ঘ। কি আর করা যবে বলুন—বিষয়বস্তু শক্ত হলে তার গৌরচন্দ্রিকাও একটু বড় হতেই হবে।

সারা দেশে উত্তাল হয়ে উঠেছিল স্বদেশী আন্দোলন। মিছিলে মিটিং-এ মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে মুখরিত কলকাতার আকাশ বাতাস। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিলেতী কাপড়ের স্তুপে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সেই লেলিহান আগুনের দিকে তাকিয়ে সমবেত কণ্ঠে শ্লোগান দিচ্ছে ভলান্টিয়াররা বিদেশী বস্ত্র—

বর্জন কর—বর্জন কর—সহস্রকণ্ঠে শপথ ধ্বনিত হচ্ছে।

তুলনা হয় না যজ্ঞেশ্বরের।

সেই চারিদিকের উত্তাল আগ্নেয় পরিবেশ যেন তাকে একেবারে উন্মত্ত করে দিয়েছিল। মদের দোকানের সামনে ছাত্রদের জড়ো করে পিকেটিং করবে কে?

যজ্ঞেশ্বর। শুধু বিলেতী কাপড় নয়, বিদেশে তৈরি সবরকমের পণ্য জোগাড় করে তাতে আগুন ধরিয়ে পোড়াবে কে?

যজ্ঞেশ্বর। কে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে চাঁদা আদায় করবে?

কে আবার যজ্ঞেশ্বর। দেখতে দেখতে ছাত্রদের ভেতরে সে হয়ে গেল অগ্রগন্য নেতা।

নানারঙের বহুমূল্য চীনা বা ইতালীয় সিল্কের কাপড়, আমেরিকান টেরিকট্, জাপানী টেরিলিন এবং সাগরপারের আরও বিভিন্ন দেশের মহার্ঘ বস্ত্রসম্ভারে মস্ত উল্লাসে অগ্নিসংযোগ করেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে যজ্ঞেশ্বর। প্রচণ্ড সেই উত্তেজনার আগুন নিভে যায়। তার মনে পড়ে যায়, তার বাড়িতে বাবার এক একটা বড় বড় ট্রাংক বোঝাই বিলেতী কাপড়। আজীবন বিলাসীতার ভেতরে বাস করছেন তিনি। গান্ধীজীর নাম কি বাবা শুনেছেন? শুনেছেন কি তার বিদেশী পণ্য বয়কট আন্দোলনের খবর? হয়ত তার সেই বাগানবাড়ির চৌহদ্দীর ভেতরে পেঁছায় না বাইরের পৃথিবীর কোন সংবাদ। বাবার জন্য তার কষ্ট হয়। দুঃখ হয়। হুহু করে ওঠে তার বুকের ভেতরটা—

এবার তো শ্যামবাজারে পাঁচমাথার মোড়ে যেতে হবে কাপড় পোড়াতে তার এক বন্ধু বলে, যাবি না যজ্ঞেশ্বর—

কোন কথা বলে না যজ্ঞেশ্বর। তার কথা যেন শুনতেই পায় না। তার মনের ঘন অন্ধকারে বিষধর রঙীন সাপের মত ঝিলিক দিয়ে ওঠে বাগানবাড়ির ঘরে দেখা সেই শাড়ির আঁচল। সেই মেয়েছেলেটাকে কি বাবা এখনও বাগানেই রেখেছে! ছিঃ ছিঃ ঘৃণায় দড়ির মত পাক দিয়ে ওঠে মনটা। মুখটা কেমন বিস্বাদ আর তেতো হয়ে যায়।

মার শুকনো হাড় বের করা মুখখানা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তেই সাড়ে তিনশো কিলোমিটারের দীর্ঘ ব্যবধান পেরিয়ে তার মন ভেসে যায় তার জন্মভূমি সেই উদয়পাঁচগ্রামে। সেখানকার লালমাটি, ধু ধু ধানের মাঠ পুকুর গাছপালা সব সব যেন তাদের সৌরভ দিয়ে তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল। আর তার সমস্ত চেতনার ভেতরে সত্ত্বার ভেতরে একটা নিঃশব্দ কান্না হাহাকারের মত বেজে যেতে লাগল।

আপুনি কী মনে করিছেন কন তো, সুনো বা সুনয়ণীর দাদা কাতু গোপেশ্বরের মুখের সামনে তর্জনী নাচিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, জমিদার হইছেন বলে কি যা হাউস (খুশি) হোবে তাই করমেন—

গোপেশ্বর কথা বলে না। বলতে পারে না। তার চারিদিকে ব্যূহ রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে খুব কম করে শ-তিনেক লোক। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে। তবুও অস্ফুটস্বরে বলল তুমি কি চাচ্ছো কাতু—কেন এত লোক নিয়ে চড়াও—

সোজা আঙ্গুলিতে ঘি ঘিউ (ঘি) ওঠে না বাবু—বলেই হেঁহে করে

হেসে উঠল কাতু। হায়নার মত ধূর্ত হাসি। হাসির রেশ টেনেই বলল, সুনোকে নিয়ে মজা লুটতে—

খবরদার কাতু, হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল গোপেশ্বর। চিৎকার করে বলল তোর মুখ ভেঙ্গে দেব—নিয়ে যা তোর বোনকে—

পাঁচ হাজার টাকা ফ্যালো আখুনি (এখনি) চলি যাঁচ্ছো—

পাঁচ হাজার টাকা! চোখ দুটো বড় বড় করে নিজের মনকেই যেন শুনিয়ে শুনিয়ে বলল গোপেশ্বর। আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন শান্ত হয়ে গেল। মৃদু হেসে বলল, একটু দাঁড়া—এনে দিচ্ছি—বলেই ছুটে চলে গেল ঘরের ভেতরে।

জনতার ভেতরে খুশির গুঞ্জন।

কাতুর মুখে সাফল্যের হাসি।

আয়—কে টাকা নিবি—কোন শালার হিম্মত থাকে তো হুংকার দিতে দিতে ঝড়ো বাতাসের মত ঘর থেকে বেরিয়ে এল গোপেশ্বর। তার ডবল ব্যারেলের বন্দুকটা উঁচিয়ে উন্মাদের মত চিৎকার করে বলল—এখুনি আমার বাগানবাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও—তা নাহলে কুকুরের মত গুলি করে—

তার কথা আর শেষ হল না। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। যে যেদিকে পারল, ছুটে পালাল। যেতে যেতে দূর থেকে কাতু শাসিয়ে বলল, এক মাঘোত-ই শীত্যি যায় না—বা—বু—

প্রচণ্ড উত্তেজনায় ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ঘরে এসে দেখল গোপেশ্বর সুনয়ণী নেই—কোথাও নেই!

ঠিক তার দু'দিন পরেই গভীর রাত্রে বাগানবাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেল। ব্যাংক পোস্ট অফিসের ধার ধারতো না গোপেশ্বর। তার যা কিছু সঞ্চিত ছিল তা প্রায় হাজার ত্রিশেক টাকা লুঠ করে নিয়ে গেল দুর্বৃত্তরা! একেবারে কপর্দকশূন্য হয়ে গেল উদয়পাঁচগাঁর জমিদার। সুযোগ বুঝে পাওনাদাররা আসতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে। তাদের জ্বালায় অস্থির হয়ে অনেক-অনেকদিন পরে সে চোরের মত এল নিজের বসতবাটিতে সুরমার কাছে—যদি সে কিছু গয়না বা টাকা দিয়ে তাকে সাহায্য করতে পারে! কিন্তু—

কোথায় সুরমা! তাকে দেখেই ছেলেরা মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। সেদিন রাত্রে গ্রামের চারিদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না সুরমাকে। পরদিন দেখা গেল তালপুকুরের জলে ভাসছে সুরমার দেহ! সেই মৃতদেহের দিকে তাকিয়েই তার বুকের ভেতর থেকে তীব্র একটা যন্ত্রণা যেন পাক খেয়ে উঠে এল। তার—তার পাপেই সুরমার মৃত্যু, তার জন্যই তার সংসারের এই দৈন্যদশা—কৃতকর্মের অনুশোচনার জ্বালায়, গভীর শোকে কেমন অস্থির আর উদভ্রান্ত হয়ে গেল গোপেশ্বর। পাগলের মত ছুটতে ছুটতে বাগানবাড়িতে ফিরে এল। সেই দোনলা বন্দুকটা হাতে নিয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেল খড়ের গাদার আড়ালে। কাঁপা কাঁপা হাতে টোটা ভরিয়ে

নলটা গলার দিকে চেপে ধরল—

এ কী করছ বাবা—এ আপনি—তুমি কী করছ! ঘুম ভেঙ্গে গেল যজ্ঞেশ্বরের। ধড়মড় করে উঠে বসল। তার সারা শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছে। একী ভয়ানক বীভৎস দুঃস্বপ্ন দেখল সে! তাহলে কি সত্যিই তার বাবা মা—

সেইদিনই বাড়িতে রওনা হল যজ্ঞেশ্বর। তাকে দেখেই ছোট ছোট ভাইগুলো অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। তারাই বলল সব বৃত্তান্ত মা তালপুকুরের জলে ডুবে আত্মঘাতী হয়েছে। বাবা তার পরদিন বাগানবাড়ির খড়ের গাদার আড়ালে বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করেছে—

আশ্চর্য স্বপ্নে যা দেখেছে—সব—সব ঠিক। শুধু তাই নয় যে দুঃসহ পরিস্থিতিতে পড়ে গোপেশ্বর আত্মহত্যা করেছিল ঃ সেই কাতুর সাগরেদদের তাকে ঘেরাও করে অপমান করা, ডাকাতি ইত্যাদি প্রতিটি ঘটনাই সে স্বপ্নে প্রত্যক্ষ করেছিল।

বুঝলেন অরিন্দমবাবু। এখানে ঘুমন্ত অবস্থায় যজ্ঞেশ্বরের আত্মা তার দেহ থেকে বেরিয়ে সূক্ষ্মদেহে চলে এসেছিল সাড়ে তিনশো কিলোমিটার দূরে উদয়পাঁচগাঁয়ে এবং তাদের পরিবারের শোচনীয় পরিনামের শোকাবহ ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ করেছিল। এখানে বলা দরকার, নিদ্রিত অবস্থায় আত্মা অন্য জীবিত বা মৃত মানুষের দেহে যেমন প্রবেশ করে তেমনি দূর দেশে পরিভ্রমণও করতে পারে। প্রখ্যাত প্রেততত্ত্ববিদ রাইন (Rhine) সাহেব তাঁর New Frontiers of Mind গ্রন্থে এই রকম বিস্মকর অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের আরও অনেক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। তার অন্তত একটা আপনাকে বলি—

লণ্ডন শহরের নয় মাইল দূরে একটি গ্রামের এক মাঝবয়সী মহিলা ঘুমের ভেতরে দারুণ এক আর্তনাদ করেই লাফিয়ে নেমে পড়ল বিছানা থেকে। দু'হাতে বুক চেপে ধরে চিৎকার করে বলল, আমি-আমি আব্রাহাম তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি—কাল বিকেলে মাঠ থেকে গরু নিয়ে ফিরে এসে আমি গোয়াল ঘরেই পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করব—

কি—কি হয়েছে তোমার, ডেজীর স্বামী রবার্ট চিৎকার করে উঠল। বাড়িব সব লোকজনও ছুটে এল।

ডেজীর লাল টকটকে চোখদুটো কেমন ঘোর লাগা, আচ্ছন্নের মত থেমে থেমে বলতে লাগল, তোমরা জেনে রাখ আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।

সর্বনাশ! ষাট বছরের বৃদ্ধা, বহুদর্শী চেম্বারমেড'লিলিবেট ফিস ফিস করে বলল, অ্যাব্রাহাম বলে কি কেউ আছে আপনাদের?

হ্যাঁ—ডেজীর বড়দা—

তাঁর আত্মা ম্যাডামকে ভর করেছে—তিনি নিশ্চয়ই মারা যাবেন। তার আগে—কখনও—কখনও তার স্পিরিট প্রিয়জনকে পজেস (ভর)—

আর একটু দেরি না করে সেই রাত্রেই ডাক্তার নিয়ে এল রবার্ট। খবর দিয়ে ভূতের ওঝাকেও নিয়ে আসা হল। ডাক্তার কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ এবং মর্ফিয়া ইনজেকশান দিয়ে চলে গেলেন। ওঝা তার কোন ক্রিয়াপ্রক্রিয়া করার আগেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল ডোরা। তার ক্লান্ত অবসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে ওঝা আস্তে আস্তে যেন বহুদূর থেকে বলল রবার্টকে, যদি পারেন, আপনার স্ত্রীকে তার দাদার কাছে নিয়ে যাবেন কাল বিকেলের আগেই, একটু থেমে আবার বলল, দেরি করলে দেখা নাও হতে পারে—

পরের দিন ডোরার ঘুম ভাঙ্গল একেবারে রাত নয়টার পর। সঙ্গে সঙ্গে আবছায়া দুঃস্বপ্নের মত তার মনে পড়ে গেল তার দাদার কথা। বলল, এখুনি দাদার কাছে আমাকে নিয়ে চল—

রবার্ট যাওয়ার জন্য তৈরি হতে শুরু করল। কিন্তু যাওয়া হল না—যেতে হল না। এল সেই—

দুঃসংবাদ। বিকেলে গোয়াল ঘরেই পিস্তলের গুলিতে সুইসাইড করেছে অ্যাব্রাহাম! প্রেতাবিষ্ট ডেজীর মুখ দিয়ে যেমন বলিয়েছিল—ঠিক সেই সময়—ঠিক সেইভাবেই আত্মঘাতী হয়েছে সে।

এই পর্যন্ত বলে ডক্টর রাইন মন্তব্য করেছেন, ছোটবোন ডেজীকে খুব ভালবাসত অ্যাব্রাহাম। তাই মৃত্যুর আগে তার আত্মা সূক্ষ্মদেহে নিদ্রিত ডেজীকে ভর করে জানিয়ে দিয়েছিল তার সেই ভয়াবহ এবং বীভৎস সংকল্পের কথা!

অরিন্দমবাবু, এইরকম আরও অনেক, অজস্র কাহিনী আছে—সেসব বলে আরও নজির দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি?

এবারে যোগবলে প্রেতাত্মার ভর কি করে হয়—সেই আলোচনায় যাওয়া যেতে পারে।

যোগের প্রভাবে অশরীরি আত্মার অন্য কোন জীবিত মানুষের দেহে প্রবেশ বা দূরদেশে ভ্রমণ করে কোন বিশেষ কাজ করে আসার অলৌকিক কোন কোন ঘটনা আপনার জানা থাকলে আমি মোটেই আশ্চর্য হব না। কারণ—

আমাদের দেশ—যোগীদের দেশ। এই উপমহাদেশে যোগসাধনার ঐতিহ্য গঙ্গোত্রীর নির্ঝরের মতই সেই আদিকাল থেকে প্রবহমান। আজও হিমালয়ের এখানে সেখানে পাহাড়ি পথের বাঁকে বাঁকে কি অন্ধকার কোন গুহায় এখনও এক একজন সিদ্ধপুরুষ যোগীর দেখা মেলে।

ও—হ্যাঁ যোগীপুরুষদের কথা বলতে বলতেই মনে পড়ে গেল—আপনি কি জানেন অরিন্দমবাবু, ঠিক একশো বছর আগে এই যোগীদের খোঁজেই হিমালয়ে এসেছিলেন এক বিদেশিনী। তরুণী। সুশ্রী। এবং—

রীতিমত বিদুষীও। তিনি কখনো হিমালয়ের উত্তরে, কখনো দক্ষিণে, কখনো পূর্বে—সিকিমে, নেপালে, তিব্বতে এবং আরও অনেক দুর্গম

পার্বত্যরাজ্যে পরিভ্রমণ করতে শুরু করলেন বছরের পর বছর ধরে। বহু সিদ্ধকাম যোগীর সান্নিধ্য পেলেন। তাঁদের একজনের কাছে দীক্ষা নিয়ে নিজেকে যোগসাধনার জন্য প্রস্তুত করলেন। কিছুদিনের ভেতরেই তাঁর কঠোর অধ্যাত্মসাধনা, তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, তাঁর বুদ্ধি, তাঁর গবেষণা এবং তাঁর অনেক চমকপ্রদ অলৌকিক ক্ষমতার কথা প্রচারিত হয়ে গেল পৃথিবীর দেশে দেশে। তারপর—

তাঁর গুরুর আদেশে চলে গেলেন আটলাণ্টিক পেরিয়ে সুদূর আমেরিকায়। সেইখানেই প্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন তত্ত্ববিদ্যা সমিতি বা থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি! তিনি বলেছিলেন, আমেরিকা বস্তুবাদের দেশ—বড় বেশি মেটিরিয়েলিজমের চর্চা। তাই সেই উষর, অনুর্বর ভূমিতেই ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মসাধনার বীজ বুনে দিলাম—এসব ১৮৭৫ সালের কথা।

আমেরিকা থেকে ইংল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্স, জার্মানী ইত্যাদি ইউরোপের আরও অনেক দেশ ঘুরে বিশ্বজয় করে তিনি এলেন অধ্যাত্মবাদের দেশ—এই প্রাচীন ভূখণ্ড ভারতে। বোম্বাইতে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি স্থাপন করেই এলেন কলকাতায় ১৮৮২ সালের ১৯শে মার্চ।

কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু বিশিষ্ট নাগরিকরা তাঁর কাছে ভিড় করে এল। শুরু হল তাদের একটার পর একটা প্রশ্ন—

মাদাম, আপনি কি বিশ্বাস করেন, কারো আত্মা অন্য কোন ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করতে পারে—

কোন কথা বললেন না সেই রমণী। কিন্তু তার অদ্ভুত রকমের বড় বড় চোখদুটো কেমন গভীর আর অগাধ হয়ে উঠল—

মাদাম, আপনি তো এসব কথা ইংল্যাণ্ডে প্রচার করেছেন—

ঠিকই করেছি, নিজের ভেতরে মগ্ন থেকেই মৃদুকণ্ঠে বললেন, যোগসাধনার সাহায্যে সেটা সম্ভব—

আপনি হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিতে পারেন?

পারি। কিন্তু সময় লাগবে—

গভীর স্তব্ধতা নেমে এল হলঘরে। প্রত্যেকের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এখুনি—হয়ত এই রহস্যময়ী বিদেশিনী কারো স্পিরিটকে এনে হাজির করবে কিম্বা কারো আত্মাকে তাদেরই কারো দেহে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেবে—তীব্র উত্তেজনায় ছিঁড়ে পড়ছে তাদের বুক। কিন্তু—

তিনি কিছুই করলেন না। বড় আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে বসে রইলেন। আর তার পাশেই একটা গোলটেবিলে তামাকের কৌটা থেকে একটু একটু করে তামাক নিয়ে সিগারেটের কাগজ রোল করে যেতে লাগলেন। দর্শকরা অধৈর্য হয়ে উঠল।

সব—সব ধাপ্পাবাজি—

সমস্ত মিথ্যা প্রচার।

চাপা গলায় অস্ফুট মন্তব্যগুলো বোধহয় তার কানে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মুখখানা কেমন গম্ভীর আর কঠোর হয়ে উঠল। ঘরের দরজার বাইরে কাকে যেন কিসের ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় পাশের ঘর থেকে এল অদ্ভুত ধরনের একটা লোক।

সাপের মত লম্বা হিলহিলে চেহারা। লালটকটকে গায়ের রঙ। গলায় ঝুলছে একরাশ নানারঙের কড়ির মালা। তার ভেতরে আবার দু-একটা কে জানে কিসের হাড়ও ঝকমক করছে।

ইনি জাতিতে তাতার, মাদাম বলতে শুরু করলেন, আমি তিব্বতে ওর দেখা পেয়েছিলাম। ইনি মস্তবড় একজন যোগী। ইনিই আপনাদের প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দেবেন, কেমন করে স্পিরিট দূর দেশের যে কোন প্রত্যন্ত প্রদেশে গিয়েও অন্য কোন ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে বা তার কাছে উপস্থিত হয়ে তার খবরাখবর নিয়ে আসতে পারে, একটু থামলেন মাদাম। হলঘরের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত দর্শকদের ঠাসা ভিড়ের দিকে তীক্ষ্ণ চোখদুটোর দৃষ্টি ছড়িয়ে কি যেন দেখলেন কয়েকমুহূর্ত।

কিন্তু একটা সর্ত আছে, আবার বললেন মাদাম, আমার এই বন্ধু যোগী যতক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে থাকবে ততক্ষণ কেউ কোন কথা বলবেন না—টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করবেন না—তাঁর কথা শেষ হতে না হতে গ্যাসের জোরালো আলোগুলো নিভিয়ে দেওয়া হল। শুধু মাদামের মাথার ওপরে একচক্ষু প্রেতের মত একটা সবুজ আলো জ্বলতে লাগল। কেমন রহস্যময় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল সেই বিশাল হলঘর।

শামান, তোমার যোগবিভূতি এঁদের দেখিয়ে দাও—

কে জানে কিসের ঘোরে আচ্ছন্ন সেই তাতারযোগী টলতে টলতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। জড়ানো গলায় বলল কি দেখাতে হবে মাদাম বলুন—বলুন কোথায় যেতে হবে, কার ওপরে ভর করতে হবে—

মাদাম তার কানে কানে বলল কতগুলো কথা। শামান বেশ খুশি হয়ে বলল—ও এই ব্যাপার! বলেই তার ঝুলির ভেতর থেকে বের করল একটা রক্তবর্ণ পাথরের মাদুলি। সেই মাদুলিটা মুখে দিয়ে একটু একটু করে গিলে ফেলতে চেষ্টা করতেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ একেবারে মৃত মানুষের মত পড়ে থাকল সেই যোগী।

আবছায়া অন্ধকার ঘরে দর্শকদের চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে। তাদের দৃষ্টি যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

এবার উঠে বসে ধ্যানস্থ হল সেই তাতারযোগী, শামান।

যে কোন একজন আমার কাছে। চলে আসুন এবার, দর্শকদের উদ্দেশ্যে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন মাদাম।

কিন্তু কেউ আর আসে না। কিসে থেকে কি হবে, কে জানে, সেই ভয়েই কেউ আর আসে না।

কে চলে আসুন—ভয়ের কিছু নেই, আবার বললেন মাদাম, এমন কেউ একজন আসুন—যিনি তাঁর দূরদেশে কোন আত্মীয়-পরিজনের কুশল সমাচারের জন্য খুব উদগ্রীব হয়ে আছেন—

দর্শকদের ভেতর থেকে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক গেলেন মাদামের কাছে। তাঁকে আস্তে আস্তে বললেন তাঁর সমস্যার কথা।

এবার শামানের সামনে উবু হয়ে বসলেন সেই রমণী। ভদ্রলোকের কথাগুলো তাকে বুঝিয়ে বললেন। শামান ধ্যানমগ্ন থেকেই বলল, আচ্ছা—ওঁকে অপেক্ষা করতে বলুন—আমি সব জানিয়ে দিচ্ছি বলতে বলতেই সমাধিস্থ হয়ে গেল সে। কোন দূর অজানালোকের এক নির্বেদ প্রশান্তির ভেতরে তলিয়ে গেল সেই তাতার যোগী।

কিছুক্ষণ পরে কেমন আচ্ছন্নের মত হয়ে যেন বহুদূর থেকে বলতে লাগল শামান, পাটনায় এই ভদ্রলোকের পিসিমা খুব অসুস্থ। তাঁর স্বামী বা ওনার পিশেমশায়ও খুব শক্ত অসুখ থেকে সামলে উঠেছেন। তাঁরা সম্পত্তির উইল করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বিলেতে তাদের একমাত্র ছেলেকে আসতে বলে তার করেছেন—

ভদ্রলোক পরদিনই পাটনায় গিয়ে দেখলেন সত্যিই পিসিমা মৃত্যুশয্যায়। পিশেমশায়ের 'স্ট্রোক' হয়েছিল। বিলেতে ছেলেকে খবর পাঠানো হয়েছে আর তাঁরা 'উইল' করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন—শামানের প্রত্যেকটা কথাই ঠিক—

জানেন অরিন্দমবাবু, এইরকমই বিস্ময়কর ও অলৌকিক আরও অনেক ঘটনার বিবরণ আছে হার্বার্ট হুইটির (Herbert whyte) লেখা এই অধ্যাত্মবাদী অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন এবং যোগসিদ্ধ সেই বিদেশীনি তরুণীর জীবনীতে।

আরো একবার। লণ্ডনের বিশিষ্ট নাগরিকদের তিনি দেখিয়েছিলেন তাঁর অত্যাশ্চর্য যোগবিভূতি। দেখিয়েছিলেন ঠিক নয়—দেখাতে বাধ্য হয়েছিলেন। কেন না, কলকাতার মত লণ্ডনের বাসিন্দাদের মনেও একটু একটু করে দানা বেঁধে উঠেছিল তাকে ঘিরে নানা আবিল সন্দেহ। কেউ কেউ তো মুখ ফুটে বলেই ফেলেছিল মহিলাটি মিথ্যেবাদী—তিনি প্রবঞ্চক। আবার কেউ বা বলেছিল, তিনি শঠ, ধূর্ত ইত্যাদি।

আপনার সম্বন্ধে লোকে যা তা বলছে, তাঁর শিষ্যা এবং বান্ধবী মিস টুইডেল অনুযোগ করলেন, মাদাম আপনি ওদের জানিয়ে দিন অধ্যাত্মসাধনা, যোগবিভূতি—এসব মিথ্যে নয়—

এসব তো লোককে বলে, বক্তৃতা করে বোঝানো যায় না মিস টুইডেল সিগারেটের কাগজে তামাক ভরে পেঁচিয়ে যেতে লাগলেন তিনি।

কিন্তু একটা—কিছু একটা কিছু তো করা দরকার, মিস টুইডেলের মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে ওঠে। থেমে থেমে বলে, আপনার সম্বন্ধে ওদের ভুল ধারণা—কুৎসিত ধারণা—

বেশ মিটিং অ্যারেঞ্জ কর, একটু চিন্তিত হয়ে আবার বললেন, কিন্তু কী বলব বল তো টুইডেল—থিয়োসফি বা ব্রহ্মবিদ্যার কথা—

—না—না—ওসব একেবারে না। সিম্পলি আপনার যোগবিভূতির দু-একটা ভেলকি দেখিয়ে দেবেন—

সভা শুরু হল। প্রথমেই বিদ্রূপ করে বললেন তিনি—আমি জানি—আমি খুব দুঃখের সঙ্গেই বলছি, ব্রহ্মবিদ্যা, অধ্যাত্মবাদ, আত্মানুসন্ধান ইত্যাদি সম্বন্ধে আপনাদের কোন প্রকৃত কৌতূহল নেই। আপনারা এখানে এসেছেন যাকে বলে 'ইদ্ধি সিদ্ধি' (Phenomenon) দেখতে—

হ্যাঁ—যা বলেছেন মাদাম—

আপনার যোগবিভূতির দৌড়টাই দেখতে এসেছি, অডিয়েন্সের ভেতরে গুঞ্জন উঠল।

বেশ বলুন, কি দেখতে চান—

আপনার পাশের টেবিল থেকে ওই তামাকের কৌটটা অদৃশ্য করে দিতে পারেন? এক ধনী অভিজ্ঞ মহিলা বললেন।

ম্যাডাম কোন কথা বললেন না। কিন্তু মুহূর্তে তাঁর মুখখানা এক অপার্থিব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর বড় বড় সেই চোখদুটোর দৃষ্টি যেন কোন সুদূর অজানালোকে প্রসারিত হয়ে গেল।

টোব্যাকো বক্স অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্তম্ভিত হয়ে গেল দর্শকরা।

আপনি আপনার গাউনের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছেন, সেই মহিলা চেঁচিয়ে বললেন।

বেশ আপনি আমার কাছে এসে দেখে যান, গম্ভীর হয়ে মাদাম বললেন।

ভদ্রমহিলা গিয়ে তাঁর গাউন ঝেড়েঝুড়ে কোথাও পেলেন না সেই কৌট। অবাক হয়ে মাদামের দিকে তাকিয়ে রইলেন সেই ভদ্রমহিলা। মাথা নিচু করে মঞ্চ থেকে নামতে না নামতেই কিন্তু দেখা গেল কৌটটা ঠিক টেবিলের যেখানে ছিল সেইখানেই শোভা পাচ্ছে—

কী আশ্চর্য! আপনি—আপনি কি মায়াবিনী না যাদুকরী?

কোন কথাই বললেন না মাদাম। গভীর একটা ভাবের আবেশে বিভোর হয়ে রইলেন। কয়েকমুহূর্ত পরে খুব বিনীতভাবে বললেন, আমি খুব সামান্য মেয়েমানুষ। শুধু যোগবিভূতির একটু ছিটে-ফোটা—যৎসামান্য প্রভাব শুধু দেখিয়ে দিলাম আপনাদের—

আপনি না কি অশরীরি আত্মাদের পরিচালনা করে থাকেন, অডিয়েন্সের ভেতর থেকে এক বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন, সময় সময় স্পিরিটকে দূরে পাঠিয়ে অন্য ব্যক্তির ওপর সব ভর করিয়ে দিতে পারেন; তার যাবতীয় খবরাখবরও নিয়ে আসতে পারেন—

হ্যাঁ—পারি, ঠিকই শুনেছেন—

এখুনি আমাদের দেখিয়ে দিতে পারেন—এইখানে—

তার কথা শেষ হতে না হতেই মাদাম যেন কোন সুদূরে এক অজানা জগতে চলে গেলেন। দুটো বড় বড় চোখে কেমন আচ্ছন্নের মত দৃষ্টি। হঠাৎ বাইরে যেন কাকে কি ইঙ্গিত করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কে জানে কোন দিক দিয়ে মঞ্চে এল এক দীর্ঘ ছায়ামূর্তি। মনে হল, তার মাথায় পাগড়ি আছে, আছে বুক পর্যন্ত লুটিয়ে পড়া কালো কুচকুচে দাড়ি।

মাদাম তাকে হিন্দীতে কি সব বলে দিলেন। অদৃশ্য হয়ে গেল সেই ছায়াদেহ। অদ্ভুত একটা স্তব্ধতায় থমথম করতে লাগল বিশাল হলঘরটা। ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন ম্যাডাম।

দর্শকদের চোখে সম্মোহিত দৃষ্টি।

অভিভূত একটা আচ্ছন্নতার ভেতরে যেন তলিয়ে গিয়েছে ওরা!

কিন্তু—

হঠাৎ দমকা একটা বাতাসের ঝাপটা আছড়ে পড়ল ঘরে। সেই ছায়ামূর্তি আবার যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল। আর বেশ কিছুক্ষণ ধরে হিন্দীতে মাদামকে কি সব বলে থেমে গেল। আর আস্তে আস্তে মাদামের পিছনে চেয়ার ধরে দাঁড়াল!

লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টলমেনঃ দর্শকদের উদ্দেশ্যে বললেন মাদাম, আমি এই স্পিরিটকে রুমানিয়াতে আমার এক খুব ঘনিষ্ঠ বান্ধবী লিজার কাছে পাঠিয়েছিলাম। তার ওপরে এই স্পিরিট ভর করে তার যেসব খবরাখবর জেনে এসেছেন তা তাঁর মুখে লিজার কণ্ঠেই শুনুন—

কয়েকমুহূর্ত পরেই অডিয়েন্সকে একেবারে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিয়ে সেই ছায়ামূর্তির মুখে ধ্বনিত হল রোমানিয়ানদের পরিস্কার রোমানস্ ভাষায় এক মিষ্টি স্ত্রী কণ্ঠস্বর। কথা শেষ হলেই অদৃশ্য হয়ে গেল সেই স্পিরিট।

বলাবাহুল্য রোমানস্ ল্যাঙ্গুয়েজ একবর্ণ বুঝতে পারল না ইংরেজ দর্শকরা। মাদাম স্পিরিটের মাধ্যমে লিজার কথাগুলো হুবহু ইংরেজী তর্জমা করে বললেন—তোমার প্রেরিত সেই বিদেহী আত্মা যখন আমার কাছে এল, তখন আমি বাগানে বসে তোমাকেই ইণ্ডিয়াতে চিঠি লিখছিলাম। কিন্তু তুমি কখন যে কোথায় থাক বুঝতে পারি না। হয়ত আমার চিঠি তোমার হাতে পেঁছায় না। আমার শরীর খুব খারাপ—সবসময় তোমার কথা মনে হয়। তুমি কবে আসবে—

ঠিক পনেরদিন পরে লিজার চিঠি এসেছিল মাদামের কাছে। সেই চিঠি যিনি স্পিরিটের অন্যলোকের ওপরে ভর করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন লণ্ডনের সেই ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিয়েছিলেন মাদাম। তিনি পড়ে দেখলেন। স্পিরিটের মুখে সেদিন লিজা যা বলেছিলেন, হুবহু সেই কথাগুলোই লেখা আছে চিঠিতে।

বিস্ময়ে থ হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। সিদ্ধযোগী, অসামান্য শক্তির

অধিকারী মাদামের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেলেন।

তাঁর সুযোগ্য শিষ্যা ইংরেজ মহিলা মিস টুইডেল এই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন রমণী সম্বন্ধে লিখেছেন—তাঁর অদ্ভুত রকমের চোখদুটোর জ্যোতি, আকর্ষণী শক্তি অনন্যসাধারণ ছিল। প্রথম দৃষ্টিতেই আমার ভেতরে কৌতূহলের আগুন জ্বলে উঠেছিল—My curiosity was fired at the first sight of her…

আচ্ছা অরিন্দমবাবু, প্রেততত্ত্ব অধ্যাত্মবাদ ইত্যাদি নিয়ে তো আপনি অনেক নাড়াচাড়া করেছেন, কে এই বিদেশিনী যিনি কলকাতায় থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যাঁর যোগবিভূতি বা psychic powers ছিল অসামান্য, যিনি সারা পৃথিবীতে স্পিরিচুয়্যালিজমের ঢেউ বইয়ে দিয়েছিলেন,—কে তিনি? কিছু কি অনুমান করতে পারছেন?

হেলেনা পেট্রোভা ব্ল্যাভেটস্কী!

মাদাম ব্ল্যাভেটস্কী ছিলেন রুশীমহিলা। ধনী অভিজাত পরিবারে জন্ম নিলে কি হবে? অপার ঐশ্বর্য আর বিলাসিতা এবং পার্থিব সুখ আর আনন্দের প্রতি তাঁর ছিল সহজাত বিতৃষ্ণা। তাঁর সেই সুদূর কৈশোরকাল থেকেই রাশিয়ার বিজনপ্রান্তর, গহন অরণ্য, দুর্গম পার্বত্য উপত্যকা তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকত! তাঁর জীবনীকাররা জানিয়েছেন অধ্যাত্মজীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণের ভ্রূণ দেখা গিয়েছিল সেই তখন থেকেই। তাঁর শুধু মনে হত—কত-কতদূরে অধ্যাত্মবাদের দেশ—সেই ইণ্ডিয়া!

একদিন গভীর রাত্রে মাদাম স্বপ্ন দেখলেন। বিচিত্র সেই স্বপ্ন—তিনি ইণ্ডিয়াতে পেঁছে দার্জিলিং হয়ে সিকিম রাজ্য পেরিয়ে পেঁছে গিয়েছেন তিব্বতের একটি শান্ত রসাস্পদ গ্রামে। গ্রামটির নাম—কলাপগ্রাম। সেই গ্রামের প্রান্তে নানারঙের ফুলে ফুলে ভরা বাগানের মাঝখানে একটি কুটিরের সামনে দাঁড়াতেই বেরিয়ে এলেন সেই তিনি যাঁর প্রতিচ্ছবি নিশিদিন তার চেতনার ভেতরে জ্বলজ্বল করে। বললেন, তুই এসেছিস মা—তোকে আমি দীক্ষা দেব—

কী আশ্চর্য স্নিগ্ধ আর মিষ্টি কণ্ঠস্বর! তার মনে হল যেন দূরাগত কোন মধুর সঙ্গীত শুনছে! তাঁর দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ চেহারা। আগুনের মত গায়ের রঙ। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, একটি দীর্ঘ অগ্নিশিখাই যেন জ্বলজ্বল করছে।

তোকে দীর্ঘকাল এখানে থেকে যোগাভ্যাস করতে হবে—তোকে সিদ্ধযোগী হতে হবে—একটু থেমে তার মাথায় হাত দিয়ে আবার বললেন, পৃথিবীতে তোর অনেক—অনেক কাজ—

অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

ঘুম ভেঙ্গে গেল তার।

কৈশোরের সেই স্বপ্নের দেশে যেতে যেতে অনেকগুলো বসন্ত পেরিয়ে গিয়েছিল। মধ্যযৌবনে তিনি সিকিম হয়ে তিব্বতের সেই কলাপগ্রামে আসতে পেরেছিলেন। সত্যিই পাহাড়ের কোলে শান্ত সুন্দর ছবির মত সেই কলাপগ্রামের শেষে নানারঙের ফুলের সমারোহে ঘেরা উদ্যানের কুটির থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন সেই অগ্নিবর্ণ পুরুষ।

মরুদেব।

তাঁর জন্মজন্মান্তরের গুরু। তাঁর আশ্রমে দীর্ঘকাল থেকে যোগ অনুশীলন করেছিলেন ব্ল্যাভেটস্কী। তাঁর জীবনীপ্রণেতা লিখেছেন "অনেক—অনেক বৎসর ধরিয়া ঐ যোগাভ্যাসের ফলে তাঁহার মধ্যে কয়েকটি যোগবিভূতি—যাহাকে psychic powers বলে—প্রকটিত হয় এবং তিনি প্রাচ্যবিদ্যা ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে পারদর্শিতা লাভ করেন।"

কিন্তু অরিন্দমবাবু মাদামের অলৌকিক জীবনচর্যার বৃত্তান্ত যোগের প্রভাবে আত্মার অন্য কোন ব্যক্তির দেহে প্রবেশের আলোচনায় অবান্তর। কিন্তু—

নিশ্চয়ই বলা দরকার মাদাম তাঁর সতীর্থ সেই তাতারযোগী শামানের কি হিন্দীভাষী সেই ভদ্রলোকের স্পিরিটকেই শুধু পাটনায় কি রুমানিয়ায় পাঠিয়েছিলেন—শুধুই যে বিভিন্ন আত্মাকে পরিচালনা করতেন তা নয়। অনেক সময় বিভিন্ন স্পিরিট তাঁর ওপরেও ভর করত—এই প্রসঙ্গে মাদামের সহযোগী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ব্রহ্মবিদ্যা আন্দোলনের (Theosophical Movement) প্রাণপুরুষ কর্ণেল হেনরী অলকটের জবানীতেই শুনুন—

দিনের পর দিন আমরা দুইজনে টেবিলের দুইপাশে বসে নিজের নিজের কাজ করতাম। হঠাৎ কখনও কখনও তার চেহারা একেবারে বদলে যেত। আমি স্পষ্ট দেখতাম, এক দীর্ঘকায় জ্যোতির্ময় পুরুষের ছায়াদেহ মাদামের দেহের ওপর এসে কুয়াশার মত মিলিয়ে গেল! আবার কখনও দেখতাম এই স্পিরিটটি মাদামের চেয়ারে বসে আছে। তাঁর দৃষ্টি অপার্থিব ভাবে বিভোর।

আবার লিখছেন অলকট, আর একজনও সময় সময় মাদামের দেহে প্রবেশ করত—তাঁর ইংরেজী ভাষার প্রতি আদৌ পক্ষপাত ছিল না—তিনি ফরাসীতেই কথাবার্তা বলতেন।

তাঁর দেহে আরও একজন আসতেন—তিনি কবি। অনর্গল কবিতা রচনা করতে পারতেন—এই আবেশকারী স্পিরিটদের প্রত্যেকের চালচলন, ভাবভঙ্গী বুঝতে পারতাম। যখন দেখতাম মাদাম ব্ল্যাভেটস্কীর হাবভাব বদলে যাচ্ছে তখুনি বুঝতে পারতাম—কোন স্পিরিট তাঁর দেহে প্রবেশ করছে……মাদামের অলৌকিক যোগবিভূতির আরো অনেক—অনেক কথা আছে, হেনরী অলকটের লেখা "Old Diary Leaves' (ব্ল্যাভেটস্কীর জীবনী) গ্রন্থে। আর এই বইটির ভূমিকায় থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সম্পাদিকা অ্যানি বেসান্ট (Annie Besant) লিখেছেন, কর্ণেল অলকট

সত্যবাদী পুরুষ ছিলেন। তিনি সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য অনেক ত্যাগ, অনেক ক্ষতি সহ্য করেছেন। অতএব মাদাম ব্ল্যাভেটস্কীর যোগ অনুশীলনীর অলৌকিক কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে তাঁর প্রদত্ত বিবরণের প্রতিটি অক্ষরই সত্য।

বশীকরণ।

অর্থাৎ মেসমেরিজম।

ফ্রান্সের এক বিখ্যাত পরলোকবিদ মেসমারই প্রথম ইউরোপীয় ভূখণ্ডে বশীকরণ বিদ্যার প্রচলন করেন। তাঁর নাম থেকেই বশীকরণের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার নাম হয়েছে মেসমেরিজম!

গুপ্তবিদ্যা বা Occult Science-এর অভিধানে বলছে মেসমার উদ্ভাবিত ক্রিয়াকৌশলে কোন শক্তিশালী ব্যক্তি তার চেয়ে দুর্বল লোককে নিজের আয়ত্বে নিয়ে আসতে পারে। তাকে অজ্ঞান করে তার দেহ থেকে আত্মাকে বের করে এনে, সেই স্পিরিটকে অন্য যে-কোন লোকের দেহে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে। কিম্বা দূরে যে-কোন জায়গায় পাঠিয়ে দিতে পারে বা তার যে-কোন কাজে লাগাতে পারে—

তাহলে অরিন্দমবাবু, বুঝতেই পারছেন মেসমেরিজম বা বশীকরণের প্রভাবে অনায়াসেই কোন লোকের আত্মা অন্যলোকের দেহে প্রবেশ করতে পারে। ভর হতে পারে! পজেশান বা পরকায়া প্রবেশ ঘটতে পারে। কিন্তু—

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে—বশীকরণের ঐতিহ্য এই উপমহাদেশে বহুযুগের প্রাচীন। বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রেই উল্লেখ আছে বশীকরণের—একৈকমেব হি বশীকরণম গরীয়ঃ কৃতঃ আবার ডামরগ্রন্থে বলে আয়ত্তীকরণ বা পরতন্ত্রীকরণ এবং মণিমন্ত্রাদিবলে বশীভূত—মন্ত্রতন্ত্রং বশীকরণম। আরও বলা যায় সিদ্ধনাগার্জুন কক্ষপুটে আছে—মাথায় হাত দিয়ে বলতে হয়—

ও হ্রীং—হ্রীং—হে ফট নমঃ—

তারপরেই বলতে হয়, কৃতপরাগো গৃহীয়াৎ সমূলাগুরুবাবুণ্ডীং। উত্তরাভিমুখেনেব কুটুয়েও দদুখলে।

বৃহন্নলীতন্ত্রে, উড্ডীশতন্ত্রে এবং ষটকর্মদীপিকাতেও বশীকরণের উপকরণ ও কলাকৌশলের বিশদ বিবরণী রয়েছে। কোথাও বলেছে, বটী, দেবদারু ও শ্বেতচন্দন ঠিক সমান সমান পরিমান নিয়ে একত্র করে জলে একটু ঘসে যাকে বশ করতে হবে তার কপালে ফোটা দিতে হয়। আবার কোন শাস্ত্র বলেছে, পেচকের মাংস, কুমকুম, অগুরু পানের সঙ্গে খাইয়ে দিতে হয়—

কিন্তু এমন একজন শক্তিশালী যোগী বা তান্ত্রিক দেখেছি যিনি কোন উপকরণ প্রয়োগ না করেই বশীকরণের প্রভাবে শুধু কোন ব্যক্তির আত্মা অন্য লোকের ভেতরে অনুপ্রবেশ ঘটাতেই পারতেন না আরও অনেক আপাত অসম্ভব কাজও সম্ভব করতেন—

অরিন্দমবাবু, লোকটা যোগী না তান্ত্রিক বলতে পারব না। সাপের মত হিলহিলে চেহারা। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল। রক্তাভ চোখদুটো নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন।

লোকটাকে গাড়ি করে নিয়ে আসা হল। নিয়ে এসেছিল সুবোধরা। আমার বন্ধু—সুবোধ সরকার। তাদের শোয়ার ঘরের সিন্দুক থেকে বার হাজার টাকা উধাও হয়ে গিয়েছিল। তারই একটা কিনারা করতে তাকে ডেকে নিয়ে আসা হয়েছিল।

ঘটনাটা আমার চোখের সামনে দেখা অরিন্দমবাবু! আর বেশিদিন আগের কথাও নয়। মাত্র বছর চারেক আগের ঘটনা—মাসটা ছিল শ্রাবণ।

সারাদিনই আকাশের মুখ ছিল ভার ভার। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। সুবোধ অস্থির পায়ে বারান্দায় পায়চারী করছিল—কখন—কখন আসবে ওস্তাদ! কাটু তাকে নিয়ে আসতে পারবে তো!

কাটু পাড়ার মস্তান। তার অসাধ্য কোন কাজ নেই। সুবোধের আশীবছরের বৃদ্ধা-মা বিন্দুবাসিনী গুমরে গুমরে কাঁদছে। আর থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে অস্ফুট বিলাপ—আমার কী দারুণ সব্বোনাশ হল রে—

পঁক-পঁক-পঁক-গাড়ির হর্ণ বেজে উঠল। ছুটে গেল সুবোধ গাড়ির কাছে। একী! এ আবার কেমন তান্ত্রিক? মদের নেশায় একেবারে চুর হয়ে তার গাড়ির পিছনের সিটে দুই শিষ্যের কোলে মাথা রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে।

তার চ্যালারা অনেক কসরৎ করে পাঁজাকোলা করে তাকে গাড়ি থেকে নামাল। মাটিতে পা দিয়ে যেন নিজেকে একটু সংযত করল সে। আর সন্ধ্যার ধূপছায়া অন্ধকারে মোড়া সুবোধদের চকমিলান বিশাল বাড়িটার চারিদিক সার্চলাইটের মত সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে কি যেন দেখতে লাগল।

আসুন—ওস্তাদজী—চলুন ঘরে বসবেন, কাটু খুব খাতির দেখিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে—ওরা সবাই আপনার জন্য বসে আছেন—

ঘরে যাব কিরে শালা, হঠাৎ দূরে অন্ধকারে জবুথবু হয়ে থাকা গাছগাছালির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল লোকটা, এই বাড়ির ঈশান কোণের ন্যাড়া কদমগাছটা এখুনি কেটে ফেলতে বল—

সুবোধ তো অবাক।

চোখদুটো বড় বড় করে তাকিয়ে রইল রোগা সিড়িঙ্গে লোকটার দিকে। বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণের ওই কদমগাছটার কথা জানল কি করে—

ওই সব্বোনেশে গাছটাতেই তো সব শয়তানদের ডেরা, আবার চেঁচিয়ে বলল ওস্তাদ।

রাত্তিরবেলা গাছ কাটি কি করে, কাঁচু মাচু করে সুবোধ বলল, কাল সকালে কেটে দিলে হবে না?

হোবে—হো জায়েগা রে দূরে অন্ধকার দিগন্তের দিকে কথাগুলো ছুঁড়ে

ছুঁড়ে বলল ওস্তাদ—যত শাগগীর পারিস—যত শীগগীর বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল লোকটা। দূরে যেন কোন অদৃশ্য শত্রুর দিকে কটমট করে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, কৈ রে তোরা আয়—যে কেউ একজন চলে আয়—আ যাও না বেটে—অ-যাও—বাতাও—না—এই বাড়ির চুরিটা কে করেছে, আবার থেমে গেল আচমকা। কয়েকমুহূর্ত পরেই রাশি রাশি তারায় ভরা আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে চিৎকার করে বলতে লাগল বাতাইয়ে—না—বাতাইয়ে। এই শালা—চুপ করে আছিস কেন একেবারে বদ্ধ উন্মাদের মত চিৎকার করে বলতে বলতেই তীব্র উত্তেজনার ঝোঁকেই টলে পড়ে গেল!

অজ্ঞান হয়ে গেল না কি! অস্ফুট গুঞ্জন উঠল সুবোধদের বড় ঘরে পাড়ার বাসিন্দাদের ভেতরে।

না—না ওস্তাদজীর সমাধি হয়েছে। শিষ্যরা এগিয়ে এসে চারিদিকের ভিড় দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে দিল। তারা বলল সুবোধকে, এবার বেশ ভাল করে বলুন তো—টাকাটা কোথায় ছিল; আপনার বাড়িতে কে কে থাকে—সব বলুন—

সুবোধের দীর্ঘ বক্তব্য এখানে সংক্ষেপে বলা হল—তিনদিন আগে পাগলীগঞ্জের ধানীজমি বিক্রি করে বার হাজার টাকা পেয়েছিল সুবোধ। রেজিস্ট্রী অফিস থেকে ফিরে আসতে আসতেই ব্যাঙ্কিং আওয়ারস পেরিয়ে গিয়েছিল। তাই বাধ্য হয়ে মা-র পাশের ছোট ঘরে সিন্দুকের ভেতরে লকারে একশো টাকার একশো কুড়িটা ঝকঝকে নোট রেখে দিয়েছিল লাল একটা গার্ডার দিয়ে বেঁধে। মনে মনে ভেবেছিল, কাল সকালে অফিস যাওয়ার পথে ব্যাঙ্কে টাকাটা জমা দিয়ে চলে যাবে—কিন্তু—

হল না! ভাগ্য খারাপ বলেই হল না। পরদিন সকাল থেকেই মা, বিন্দুবাসিনীর হার্টের ব্যথা উঠল। ডাক্তার-ওষুধের ঝামেলা করতেই অফিসের বেলা হয়ে গেল। ব্যাঙ্কে যাওয়া হল না। মা একটু সুস্থ হতেই অফিস চলে গিয়েছিল।

দুপুরে বরাবরই বাড়িতে থাকে চারটি প্রাণী—মা, ভাইপো বীরেশ, আর দুইজন পরিচারিকা—শিবানীর মা আর সন্ধ্যা। সেদিন ছিল রেশান তোলার দিন। বীরেশ রেশান নিয়ে যখন এসেছিল তখন বেলা দেড়টা কি দুটো হবে। বিন্দুবাসিনীকে ভেতরের বারান্দায় তেল মাখিয়ে দিচ্ছিল শিবানীর মা। কিছুক্ষণ পর সিন্দুকের ঘর থেকে খুটখাট আওয়াজ যে হচ্ছিল, সেটা না কি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল শিবানীর মা। বলেওছিল বিন্দুবাসিনীকে, মাসীমা—আপনার বাক্সের ঘরে কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে—

ও কিছু নয় বাপু তেল মাখার আরামে চোখ বুজেই বলল বিন্দুবাসিনী, ওই বীরুটার বাক্সটাক্সও আছে তো ঘরটায়—জামা-টামা বের করছে বুঝি, একটু থেমে আবার তাড়া দিয়ে বলল, নাও—নাও—পিঠটায় খুব ডলে ডলে তেল দাও শিবানীর মা—ভাল করে তেল না মাখলে আমার বাপু রাত্রে ঘুম

হয় না—

আজ সকালে সুবোধের মনে হল, হাজার খানেক টাকা বাড়ির খরচের জন্য রেখে বাদবাকীটা ব্যাংকে জমা দিয়ে দেবে! কিন্তু সিন্দুক খুলে লকারের ছোট ছোট পাল্লা দুটো খুলতেই একটা দারুণ বুক ফাটা আর্তনাদ করেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

লকারে টাকা নেই!

থানায় এজাহার, পুলিশী খানাতল্লাসী, বাড়ির লোকগুলোর প্রত্যেকের জবানবন্দী—সবই যথানিয়মে হয়ে গিয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে। এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল সুবোধ। তারপরেই হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসেছিল।

ওস্তাদজীর কাছে গুটি গুটি এগিয়ে এসে একেবারে ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে কেঁদে তার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে বলেছিল—ওস্তাদজী, আমার টাকাটা উদ্ধার করে দিন। জমি বেচা টাকা। আমার শেষ সম্বল—

আহা করছেন কি—করছেন কি আপনি, হাঁ—হাঁ করে উঠল শিষ্যরা, ওস্তাদজী এখন সমাধিস্থ হয়ে আছেন আপনার জন্যই—এখন বিরক্ত করবেন না—

ও—আচ্ছা—আচ্ছা সুবোধ সরে এল। ওস্তাদজীর ধ্যানস্থ মূর্তির দিকে তাকিয়ে সুবোধের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ঠিকসে বল ভাইয়া—ঠিকসে বল, দূরে—গোয়ালঘরের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল ওস্তাদজী।

মনে হল—অন্তত আমার মনে হয়েছিল, অদ্ভুত সেই যোগী যেন পরলোকের কোন বিদেহী আত্মাদের আহ্বান জানাচ্ছে তাকে সাহায্য করার জন্যে। কেউই কিছু বুঝতে পারল না। ওস্তাদজী আবার ধ্যানমগ্ন হয়ে গেল।

শিষ্যরা কিন্তু জানে কখন কি করতে হবে। তারা বলল সুবোধকে—এবার আপনার বাড়ির প্রত্যেকটি লোককে আমাদের সামনে হাজির করুন—

বলতে হল না। বাড়ির প্রায় সবকজনই দরজার চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। সুবোধ ইসারা করতেই তারা একে একে গুটি গুটি ভেতরে এল। সে প্রত্যেকের পরিচয়ও দিল—ইনি আমার মা বিন্দুবাসিনী—এ আমার ভাইপো বীরেশ আর মেয়েছেলে দুটি একজন আমার বাড়িতে রান্না করে আর একজন অন্যান্য টুকটাক ফাইফরমায়েজ খাটে—

বেশ! ঘটনার দিন দুপুরে তো কে কোথায় ছিল বলেছেন আগেই—ওস্তাদজীর প্রবীন এক শিষ্য, আস্তে আস্তে নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে বলল, আপনার ভাইপো রেশান দিয়ে এসে সিন্দুকের ঘরে ঢুকেছিল—

হ্যাঁ, তাই তো মা বলছেন—

আপনার ওকে সন্দেহ হয়?

হ্যাঁ—ও ছাড়া আর কারো কাজ হতে পারে না—একটু থেমে আবার বলল,

বহুবার—বহু চেষ্টা করেছি। কিছুতেই কবুল করছে না—

না রে খোকা না, হঠাৎ বিন্দুবাসিনী মালা জপতে জপতে বলে উঠল, ওরকম বলতে হয় না বাবা,। ছাব্বিশ বছর ধরে আমার কাছে—

তুমি থামো মা—তোমার সাতকাহন পাঁচালি শোনার সময় নেই, সুবোধ গর্জন করে ওঠে। কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে বিন্দুবাসিনী বলতে থাকে, সেই যে—সেই তেরশো ষাট সালের শ্রাবণে খুব বন্যা হয়েছিল তখন বীরুর জন্ম। সামনের শ্রাবণে ওর তিরিশ বছর পূর্ণ—

তুমি ভেতরে যাও তো মা—

হ্যাঁ, ওস্তাদজীর কাজের অসুবিধা হতে পারে কাটু বলে।

শঙ্কিত হয়ে ওঠে সুবোধ।

ওস্তাদজীর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে মা-কে একরকম জোর করেই ভেতরে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে ওঠে ওস্তাদজী, অ্যা-ই-ও কেয়া করতা হ্যায় রে—মাইজী কো কাঁহা লে যা-তা হ্যায়?

আপনার কাজের অসুবিধা হতে পারে। বড্ড বক বক করছে।

শোন—তেরা মাইজী বহুৎ ভোলে ভালা আউর ধরমশীলা জেনানা—তারপরে একটু থেমেই বিন্দুবাসিনীকে প্রশ্ন করল আচ্ছা মাইজী, পরের ছেলে বহুত মানুষ করেছেন—না?

হ্যাঁ বাবা ভাগ্নে-ভাগ্নী, ভাইপো বোনপো সব মিলিয়ে প্রায় সতেরজন একসময় আমার কাছে ছিল—

হো হো করে হেসে উঠল সেই যোগী। সেই অট্টহাসির প্রচণ্ড শব্দ ঘরের বাতাসে বয়ে গেল লহরে লহরে। হাসির দমক কমলে আবার যেন কার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল—কয়্যা রে উল্লু, ঠিক হ্যায়—মিল গিয়া?

একটু থেমে আবার চেঁচিয়ে বলল, মিলনেই তো হোগারে জরুর—একটু থেমে ঘরের চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রত্যেককে দেখে নিয়ে বলল বিন্দুবাসিনীকে, আচ্ছা মাইজী ইবার হামি এক একঠো কথা পুছব—আপনি সাচ সাচ বাতাবেন—

বল বাবা—

এবার বিন্দুবাসিনীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসল ওস্তাদ। বলল, আচ্ছা আপকা স্বামী বুঢ়াবাবু বহুত রোজগার করত—না?

—হ্যাঁ বাবা—

রুপেয়াপয়সাকো কৈ ঠিকঠিকানা থাকত না?

—হ্যাঁ বাবা—

বহুতদিনো আগে একবার দুইশো রুপেয়া চুরি হয়েছিল?

—আশ্চর্য! তুমি কি করে জানলে? অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে পশ্চিমের কোন দূরদেশের বাসিন্দা সেই যোগীর দিকে। কিন্তু তাকে আরও অবাক করে দিয়ে ওস্তাদ তার কাছে এসে বসে ঘেঁসে বলল, মাইজী সমূচা জিন্দগী

আপনি দুধ আউর কলা দিয়ে কালসাঁপ পুষিয়েছেন—

ঘরে যেন বাজ পড়ল।

কারো মুখে একটা কথা নেই। শুধু প্রত্যেকের চোখের তীক্ষ্ন দৃষ্টি বীরেশকে সুঁচের মত বিঁধতে লাগল। চাপা হাসিতে সুবোধের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আপনার বাড়ির পশ্চিমদিকে পাঁচিলের কাছে একঠো বড়া বোনারচা গাছ ছিল না?

হ্যাঁ ছিল, সুবোধ ভয়ে ভয়ে বলল, বহুদিন আগে বাবা কেটে ফেলেছিলেন— শকুনের বড্ড উৎপাত ছিল—

নেহী—নেহী বাবুজী—শকুন নেহী। একটু থেমে গাছটা যেদিকে ছিল সেইদিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিটাকে ছড়িয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, ওই পেড়ে শালা বহুত বেতমিজ দু-দুটো বিচ্ছু ছিল, হঠাৎ থেমে সুবোধের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার একঠো বহিন ছয়বছরে মারা যায়নি?

—হ্যাঁ। আপনি—আশ্চর্য তো, অভিভূত আচ্ছন্নতায় সুবোধ বোবা হয়ে গেল।

ওই পেড়ে যে দোঠো বেতমিজ জীন ছিল তারাই আপনাদের বহুত ক্ষতি করিয়ে দিয়েছে—

কিন্তু গাছটা তো বহুদিন থেকেই নেই—এখন কেন এসব হচ্ছে?

খুক খুক করে হাসল ওস্তাদজী। চোখের কোণা দিয়ে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, গাছ না থাকলে কি হোবে বাবুজী, জীনরা কখুনো আগলা জগই ছোড়ে না—

সব্বোনাশ, আমাদের বার হাজার টাকা চুরির সঙ্গে ওদের যোগাযোগ আছে না কি?

সেইসব দেখতেই আসিয়াছি বাবুজী, দেখটে দেন কোন জীনরা আপনার সব্বোনাশ কোরেছ, বলেই বীরেশের দিকে আড়চোখ তাকাল ওস্তাদজী।

বীরেশের চোখে ভয়ের ছায়া।

বাইরে হাসির মুখোস ঝুলিয়ে সহজ হওয়ার চেষ্টা করছে।

ঠিক হ্যায়, ওস্তাদজী মনে মনে বলল। আর আস্তে আস্তে এল কাটুর কাছে। চাপা গলায় ফিস ফিস করে বলল, এই শালা তোকে একঠো কাজ কোরটে হবে—চলিয়ে আয় আমার সঙ্গে—

তারা দুইজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গেল গভীর রহস্যের জাল ছড়িয়ে।

পাশের ঘরের মেঝেতে কাটুকে বসালো ওস্তাদজী। অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে কাটুর চারদিকে সাতবার ঘুরতে ঘুরতে তার মাথায় জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে মন্ত্র পড়তে লাগল—ও হ্রীং-হ্রীং-হুঙ্কা, হে ফট্ নমঃ।

আস্তে আস্তে কাটুর সারা শরীর অবশ হয়ে এল। মেঝেতে গা এলিয়ে দিল। মুখের দুই পাশ দিয়ে গ্যাঁজলা পড়তে লাগল।

তাকে সেই অবস্থায় রেখে বড় ঘরে এল বিচিত্র সেই যোগী। একেবারে যেন অন্য জগতের মানুষ। রক্তাভ দুটো চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি। মুখখানা কেমন অমানবিক আর হিংস্র।

হঠাৎ জানলার বাইরে ঘন থকথকে কালিঢালা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, সাবাস—ভাইয়া—তোরা বিলকুল ঠিক ঠিক মদত দিয়েছিস হামাকে—ইবার শেষ বাজীঠো করিয়ে দে—

তারপরে শান্ত হয়ে বসল বীরেশের মুখোমুখি।

ভয়ে শিরশির করে উঠল বীরেশের বুকের ভেতরটা। তার চোখে চোখ রেখে অত্যন্ত দ্রুতকণ্ঠে বলল ওস্তাদজী—বীরেশজী, জলদী বাতাইয়ে রুপেয়া বড় ইজ্জত বড়—

ইজ্জত বড়—

নেহী রুপেয়া বড়—

না—না ইজ্জৎ বড়—

ঠিকসে বাতাইয়ে রুপেয়া বড়, না ইজ্জত বড়?

না—ইজ্জত বড়—

নেহী-নেহী তুরন্ত বাতাইয়ে ইজ্জত বড় না রুপেয়া বড়? বাতাইয়ে—বাতাইয়ে—ওস্তাদজী অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রবেগে বলে যেতে লাগল সেই এক কথা—রুপেয়া বড়, না ইজ্জত বড়—কথাগুলো যেন দূরাগত মন্ত্রধ্বনির মত আস্তে আস্তে বীরেশের স্নায়ুগুলোকে অবশ করে ফেলল। আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার চেতনা। অস্ফুটস্বরে বলে যেতে লাগল—রুপেয়া বড়—রুপেয়া বড়—রুপেয়া বড়—ইজ্জৎ নয়—না—ইজ্জৎ নয়, রুপেয়া-টাকা অনেক—অনেক বড়, বলতে বলতে টলে পড়ে গেল।

আশ্চর্য একটা স্তব্ধতা নেমে এল।

ঘরের কোণ থেকে একটা পোকা ডেকে উঠল—চিপ-চিপ-চিপ—

এইবার ওস্তাদজী এমন একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল—সেরকম আশ্চর্য ঘটনা আমি কখনো দেখিনি অরিন্দমবাবু। মন্ত্রশক্তির বলে, না—যোগের প্রভাবে সম্ভব হয়েছিল সেটা—বলতে পারব না।

ওস্তাদজী সুবোধকে এবং উপস্থিত আর সবাইকে (বীরেশ ছাড়া) নিয়ে পাশের ঘরে কাট্টুর কাছে এল। আর চিৎকার করে বলল, এই শালা—আভি-সব কুছ ঠিক-ঠিক বাতাইয়ে—

রুপেয়া বড়—অনেক বড় ইজ্জৎ বড় নয়। টাকা ছাড়া জীবনের কোন মানে হয় না—আমি তাই জানি—কাট্টু কথা বলছে। কিন্তু বীরেশের গলার স্বর! হিম হয়ে গেল আমাদের বুকের রক্ত।

টাকাপয়সার ওপরে আমার দারুণ আকর্ষণ ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু ছাব্বিশ বছর এ বাড়িতে আছি—কখনো একটা পয়সায় হাত দেইনি—

তাহলে বোল ব্যাটা চুরি কেন করলি?

বলছি—সবই বলছি—হ্যাঁ চুরি করলাম করতে বাধ্য হলাম একটা কারণে—

বহুত ভনিতা করতেছিস রে শালা—মোদ্দা কথা বাতা—

থরথর করে কাঁপছে ওস্তাদজী। চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

কাকা (সুবোধ) কাকীমার সঙ্গে আমার অনেকদিন থেকেই মোটে বনিবনা হচ্ছিল না। ওরা আমাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। বেশ বুঝতে পারছিলাম আমাকে চলে যেতেই হবে! কিন্তু যাওয়ার আগে একটা দারুণ শিক্ষা দিয়ে যাব—

তুই—তুই টাকা চুরি করেছিস, আর্তনাদ করে উঠল সুবোধ।

আঃ কী দিল্লাগী করটেছেন, খেঁকিয়ে উঠল ওস্তাদজী—

ইরকম করলে—

আচ্ছা—আচ্ছা ওস্তাদজী মাফ করবেন—

এই শালা-বাতা-চোরি কঁরিয়ে কী শিক্ষা দিলি—

পাগলীগঞ্জের জমি বেচা টাকাটার ভেতরে আরও দুই কাকার এবং ঠাকুমার (বিন্দুবাসিনী) অংশ আছে জানতাম। আমি টাকাটা সরিয়ে ফেললে কাকারা ওকেই (সুবোধ) সন্দেহ করবে—উনিই চুরির দায়ে পড়বেন—

এই উল্লু—সিন্দুকের চাবি কি কঁরিয়ে পাইলি?

আমার কাছে একটা ডুপ্লিকেট চাবি ছিল বহুদিন থেকে। উনি সেটা ভুলে গিয়েছিলেন—

এই শালা—বাতা—টাকাঠো কোথায় রাখিয়েছিস?

বিশ ক্রোশ উত্তরে আমার মাসীমার বাড়ির পিছনে বড় জামগাছটার নিচে মাটিতে পোঁতা—বলতে বলতেই থেমে গেল কাটুকে ভর-করা বীরেশের স্পিরিট।

হতবাক হয়ে বারান্দার এক কোণে বসেছিল সুবোধ। যে ছেলেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে তার পেটে পেটে এত!

আউর কেনু ভাবটেছেন সাহেব; ওস্তাদজী সামনে এসে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে বলল, উ জীন—বীরেশের জীন স্পিরিট যেখানে বলেছে সিখানে চলিয়ে যান সমুচা রুপেয়া মিলে যাবে—এই বলেই ওস্তাদজী চলে গেল।

আশ্চর্য, বিশ ক্রোশ উত্তরে কুমারগঞ্জে, ঠিক যেমন বলেছিল বীরেশের মাসীমার বাড়ির পিছনে জামগাছের নিচে মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে পড়েছিল—বার হাজার টাকা!

অরিন্দমবাবু সেই অদ্ভুত মানুষটির অনেক খোঁজ করেছি। তার আর কোন সন্ধান পাইনি।

আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা অসম্ভব মনে হলেও প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বলতে

পারি, লোকটা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন যোগী আর তার আছে অনেক আজ্ঞাবহ অশরীরি চাকরখানসামা অর্থাৎ স্পিরিট সারভেন্টস।

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন কাটুর, বীরেশ এবং সুবোধদের বড় হলঘরের সমস্ত দর্শকদেরও সম্মোহিত করার সময়ই থেকে থেকে জানলার বাইরে ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তাদেরকে কখনো বলেছিল—সাবাস ভাইয়া; কখনো বলছিল তাকে সাহায্য করতে।

আমার বিশ্বাস এই স্পিরিটদের সাহায্যেই সে বীরেশকে বশীভূত বা সম্মোহিত করে তার আত্মা বা স্পিরিটকে কাটুর ভেতরে প্রবেশ করিয়েছিল?

আজ্ঞাবহ প্রেতাত্মার আরও একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি—

১২ই জুন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ। অ্যাটর্নী এবং তখনকার কলকাতার ডাকসাইটে অ্যাডভোকেট পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বেলগাছিয়ার—বাগানবাড়ির চারিদিকে ঘন হয়ে নেমে আসছিল সন্ধ্যার অন্ধকার।

বিশাল হলঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে জ্বলছে সুদৃশ্য দীপাধারে দেওয়ালগিরির আলো। ঘরের মাঝখানে ঝুলছে রঙবেরঙের চৌকো কাঁচ বা প্রিজমের ঝালরে আবৃত এক সুবিশাল ঝাড়লণ্ঠন। ঠিক তার নিচে পারশ্যের রেশমে আর পশমে বোনা একটা গালিচায় মোড়া একটি বিশাল গোলটেবিল। তার চারিদিকে চক্রাকারে বসেছিলেন কলকাতার জনকয়েক বুদ্ধিজীবি মণীষী। শুধু তাদের ভেতরে একজন ছিলেন—

সাহেব।

খাঁটি ইংরেজ মিঃ এলগিনটন। উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের বিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিদ।

সেদিন কলকাতার 'এলিটস'রা (বিদ্বজ্জন) প্রেতচক্রে বসেছিলেন। অবশ্য তাঁরা বহুদিন আগে থেকেই মাঝে মাঝে কখনো চার্চ লেন কখনো কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের কমার্শিয়াল বিল্ডিংএ রবিবার দুপুরে সার্কেলে বসে থাকেন। সেদিন এলগিনটন সাহেবের জন্য ছিল বিশেষ বৈঠক। বলাবাহুল্য গোপন উদ্দেশ্যও ছিল—বিলেতের সেই ডাকসাইটে পরলোকবিদ সাহেবটির পরলোকের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষমতা কতটুকু—সেটা পরখ করা।

কৈ স্টার্ট করুন—এলগিনটন তাড়া দিলেন। আমাকে এই শহরের আরও বহু জায়গায় যেতে হবে—

সাহেব আমাদের মিডিয়াম (যার মাধ্যমে প্রেতাত্মাকে আহ্বান জানানো হয়) আসেনি—কি করে—

ডোন্ট বদার আমি এখুনি 'মিডিয়াম' আনিয়ে দিচ্ছি—বলেই মুখ নিচু করলেন। পাল্টে গেল—মুহূর্তে একেবারে পাল্টে গেলেন তিনি। রক্তাভ মুখখানা আগুনের মত জ্বলজ্বল করতে লাগল। আর বড় বড় নীল দুটো চোখের স্থির আর অপলক দৃষ্টি দিয়ে সাদা আর কালো পাথরের বরফি কাটা

মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন বিদেহী প্রেতাত্মারা ওই কারুকার্য করা শ্বেতপাথরের মেঝেতেই অদৃশ্য হয়ে মিশে রয়েছে—

ঠক-ঠক-ঠক—টেবিলে মৃদু শব্দ বেজে উঠল।

ইয়েস জন। এসেছ? এরা কি জানতে চান বল তো।

কলকাতার সেই নাম করা লোকদের হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, কে কি জানতে চান বলুন—

কেউ কোন কথা বলল না।

বলতে পারল না।

কি বলবে—কেমন করেই বা বলবে—

কলকাতার সেই জুনের দারুণ গরমে হঠাৎ কোথায় থেকে জানলা দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা আছড়ে পড়েছিল ঘরে। আর তখুনি পুবদিকের দেওয়াল জুড়ে বেলজিয়াম কাঁচের দীর্ঘ আয়নায় ফুটে উঠেছিল এক ধূসর ছায়াদেহের আভাস। তার বিপরীত দিকে বুক সেলফের সামনে আবছায়া অন্ধকারের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে এক দীর্ঘ ছায়ামূর্তি।

তার দিকে ইঙ্গিত করেই এলগিনটন বললেন, কলকাতার গরমে ওর দারুণ কষ্ট হচ্ছে—যা বলার তাড়াতাড়ি বলে ওকে ছেড়ে দিন—

প্রঃ। লিটনসাহেব* তো আমাদের মানে ভারতীয়দের মোটেই সহ্য করতেন না—দুম করে মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর কণ্ঠরোধ করার জন্য ভার্ণকুলার প্রেস অ্যাক্ট পাশ করে বসেছিলেন—একটু থামলেন প্রশ্নকর্তা। কয়েকমুহূর্ত কি ভেবে আবার বললেন ওই আইনের মারপ্যাচ এড়িয়ে আমাদের দেশী পত্রপত্রিকাগুলো বেঁচে থাকতে পারবে তো?

উঃ। পারবে—আলবৎ পারবে—অত্যাচার যত বেশি হবে ততই আপনাদের শক্তিবৃদ্ধি হবে—আরো বেশি করে সংবাদপত্র বেরবে—

প্রঃ। দেখুন—যখন সবে ভারতীয়দের মনে একটু একটু করে জাতীয়তাবাদের চেতনা জেগে উঠছে তখন লিটনের মত একজন কট্টর সাম্রাজ্যবাদী শাসক—ভারতের দুর্ভাগ্য—

উঃ। (ঈষৎ হেসে) এখন তো আপনারা অত্যন্ত উদার মনোভাবের বড়লাট পেয়েছেন—

প্রঃ। লর্ড রিপনের* কথা বলছেন তো?

উঃ। তিনি ভারতীয়দের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তিনি আপনাদের অনেক সুবিধা করে দেবেন—

---

* লিটনসাহেব ভারতের বড়লাট ছিলেন পাঁচবছর-১৮৭৬—৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

* লর্ড রিপন ভারতের বড়লাট ১৮৮০—৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

তারপরেই গভীর স্তব্ধতা নেমে এল ঘরে।

আবার একটা দমকা হাওয়ার ঝড় ঘরে ভেঙ্গে পড়েই আবার হু হু করে চলে গেল বাইরে। এলগিনটনের স্পিরিট বিদায় নিল।

সেদিন শুধু তখনকার পলিটিক্যাল সিচুয়েশান নয় কেউ কেউ আরও অনেক ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেছিল স্পিরিটকে। আশ্চর্য! প্রেতবিদ্যার মস্ত পণ্ডিত এলগিনটনের সেই আজ্ঞাবহ প্রেতাত্মার প্রতিটি কথাই আশ্চর্যভাবে মিলে গিয়েছিল।

লর্ড রিপনের আমলেই সুরেন বাঁড়ুজ্যে (পরবর্তীকালের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ) কলকাতায় প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা করে জাতীয় সম্মেলন ডেকেছিলেন (১৮৮৩) আর সেই কনফারেন্স থেকেই ঠিক দুই বছর পরে তাঁর সময়েই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল (১৮৮৫)

এবার অরিন্দমবাবু, আপনাকে বলা দরকার সেদিন বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ির প্রেতচক্রে ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র (বাংলার প্রথম উপন্যাস আলালের ঘরের দুলালের গ্রন্থকার, ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান অগ্রগণ্য মণীষী) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সূর্যকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ সেন (ইণ্ডিয়ান মিররের সম্পাদক) প্রমুখ।

বিগতশতকের বাঙ্গালির প্রেতচর্চার ইতিহাসেও আছে "১৮৬৩ থেকে ১৮৮০ সালের মে মাস পর্যন্ত প্রায় সতের বছর ধরে প্রতি রবিবার দুপুরে কলকাতার স্বনামধন্য ব্যক্তিরা প্রেতচর্চার বৈঠক করতেন।"

হয়ত ইতিহাসের এসব তথ্য আপনার অজানা নয়।

কিছু মনে করবেন না অরিন্দমবাবু, প্রেততত্ত্বের আলোচনাতেও যেন ভূতের উপদ্রব হয়। দেখুন না বশীকরণের প্রভাবে একজনের আত্মা অন্যব্যক্তির ওপর ভর করার কথা বলতে বলতে এসে পড়ল খুব ক্ষমতাসম্পন্ন যোগীদের অনুগত প্রেতাত্মা বা আজ্ঞাবহ স্পিরিটের প্রসঙ্গ। আবার সেই বিষয়ে বলতে বলতে হুট করে এসে গেল বিগত শতকে বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবিদের প্রেতচর্চার কথা—থাক আপনি নিশ্চয়ই 'বোর' ফিল করছেন না?

এবার আমরা পরলোকগত মৃতব্যক্তির আত্মা অন্য কোন জীবিত ব্যক্তির দেহে আবির্ভূত হওয়ার প্রসঙ্গে যেতে পারি। তার আগে বলা দরকার সচরাচর পজেশান বা পরকায়াপ্রবেশের ক্ষেত্রে মৃত মানুষের স্পিরিটকেই ইহলোকের বাসিন্দাদের ওপর ভর করতে খুব বেশি দেখা যায়। বিশেষ করে দেশ পাড়াগাঁয়ে ভূতে পাওয়া বা ভূত ধরার ঘটনার ছড়াছড়ি। দু-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—

আঠারো কি উনিশ বছরের মেয়ে। যেমন উথালপাতাল যৌবন, তেমনি সুন্দরী। বিয়ে হয়েছে বছর দুয়েক আগে, কিন্তু ছেলেপুলে হয়নি। স্বামী

কালীপদ হোড় লোক্যাল ট্রেনে ক্যানভাসারি করে। সকাল আটটায় বেরিয়ে যায়, ফিরতে ফিরতে সেই রাত দশটা। মেয়েটি সারাদিন শাশুড়ীর কাছেই থাকে। সংসারের কাজকর্ম করে।

একদিন সে ভরদুপুরে পুকুরে জল আনতে গিয়েছিল। কিন্তু অনেকক্ষণ হল আসে না। শাশুড়ি উদ্বিগ্ন হয়ে পুকুরের দিকে পা বাড়াতেই কানে এল—

ওরে—বাপ্-রে—গেছি রে—গেছি—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—লাগছে—এইসব বলে চিৎকার করতে করতেই হঠাৎ দড়াম করে আছড়ে পড়ে ফিট হয়ে গেল মেয়েটি।

শাশুড়ির হাঁকডাকে গ্রামের লোকজন এসে মাথায় জলের ঝাপটা দিয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে নিয়ে এল।

কিন্তু জ্ঞান না এলেই যেন ভাল হত। থেকে থেকে সে দূরে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে—ঐ যে আমাকে ধরতে আসছে—ধরতে আসছে। তারপরেই হো হো করে অট্টহাসি হেসে গড়িয়ে পড়ে, কখনো বা দু'হাতে বুক চেপে ধরে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে। সে কান্না আর থামে না। প্রহরে প্রহরে রাত যত বাড়ে, কান্নাও ততই উতরোল হয়ে ওঠে।

আবার কোন কোন রাত্রে এক ফোঁটা ঘুমায় না। উঠোনে প্রেতিনীর মত পায়চারি করে। কালীপদ জোর করে ধরে বিছানায় আনতে গেলে তাকে কামড়ে, ছিঁড়ে, রক্তারক্তি কাণ্ড করে! হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যায় কালীপদ। মেয়েটি তখন নাকী সুরে বলতে শুরু করে—তুমি অমন ছোঁক ছোঁক কর কেন বল তো—কেন ঘুর ঘুর কর আমার পিছনে—ও বুঝতে পেরেছি—খুব বুঝতে পেরেছি—তুমি কী চাও। ওসব ছোঁক ছোঁকানি মেয়েদের আঁচ করতে এট্টুও দেরি হয় না! তা—শোনো— (গলা নিচু করে ফিসফিসিয়ে) আমার ন্যাংটো চেহারাটা দেখে তুমি কী করবে—তুমি তো ভূত হয়ে গিয়েছ—তোমার ইয়েটা-ই তো—আসল জিনিসটাই—

এই মাগী চুপ করবি কি না বল? কালীপদ তেড়ে আসে।

কিন্তু কার কথা কে শোনে! ভয়ঙ্কর অশ্লীল আর নোংরা কথার তুবড়ি ছুটতে থাকে।

বাড়ির লোক অস্থির হয়ে যায়।

ওঝা আসে।

ওঝার চেহারাটা লম্বা, সিড়িঙ্গে। মিশমিশে কালো। দুই কানে গোঁজা দুটো জবাফুল। রক্তাভ বড় বড় দুটো চোখের তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে মেয়েটির রকম সকম লক্ষ্য করল। মেয়েটি তখন হাত পা ছুঁড়ছে। প্রচণ্ড দাপাদাপি করছে। তাকে খাড়া পায়ে প্রচণ্ড একটা লাথি দিয়ে চিৎকার করে উঠল ওঝা—কে তুই মেয়েটার ঘাড়ে ভর করেছিস—চলে যা বলছি—চলে যা—যা—

কোন লাভ হল না। মেয়েটি আরও উদ্দাম। আরও অস্থির হয়ে উঠল।

ও বুঝেছি—সোজা আঙ্গুল-ঘিউ উঠবেক না, ঘোঙ্গিয়ে হেসে হেসে বলল ওঝা। বলেই উঠোন ঝাড় দেওয়া মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে বেধড়ক মারতে শুরু করল। ঝাঁটার ঘায়ে পিঠ কেটে যাচ্ছে মেয়েটির যন্ত্রণায় গোঙ্গানির মত আর্তনাদ করছে—

উহুঁ—উহুঁ—ওকে আমি ছাড়তে লারবো (পারব না)—উকে যি আমি—এতক্ষণে মেয়েটির মুখে পুরুষকণ্ঠের করুণ মিনতি শোনা গেল।

মরে যাবি—মরে যাবি—ওকে ছাড়বি কিনা বল, রক্তচোখে আগুন ঝরিয়ে ওঝা শাসায়।

উঁহু-উঁহু—আমি যে ওকে ভালবেসেছিলাম—

তবে রে হারামজাদা, দাঁড়া তোর মজা দেখাচ্ছি, বলেই ওঝা করল একটা অদ্ভুত কাণ্ড। একটা বাটিতে কিছু সরষে নিয়ে আগুনে গরম করে মেয়েটির গায়ে ছিটিয়ে দিতে লাগল।

উঃ মরে গেলাম—মরে গেলাম—উঃ অমানুষিক আর্তনাদ করতে লাগল প্রেতাবিষ্ট মেয়েটি। ওঝার মুখে হাসি ঝিকমিক করে। বলে, দাঁড়া—এখুনি কি হয়েছে—বলতে বলতেই হঠাৎ নিচু হয়ে এক খামচা মাটি তুলে নিয়ে তিনটি ফুঁ দিল। তারপরেই সেই মাটি ছড়িয়ে দিল মেয়েটির চারিদিকে। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র বলতে শুরু করল—

সুতা কাটেন বনে রাম কুঁড়েতে বসিয়া।
হেনকালে কয়েকভূত আসিল ছুটিয়া॥
লক্ষ্মণ বলে বাড়সাড় ওরে ভূত কাল।
মারিব বাণ তোরে সামান সামাল॥
ভূত গোছড়া হাড়গোড় ভেঙ্গে করলাম চুর।
পালা রে ভূত, তুই না রহিস এই পুর॥
আপন গুনেতে তুই হইস বড়।
ঝট করে তুমি কাদু (কাদম্বিনীর) স্কন্ধ ছাড়ো॥
কার আজ্ঞে?
জানবি—শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞে……

মন্ত্র শেষ হয়ে আসতেই অমানুষিক যন্ত্রণায় সারা শরীরটা মোচড়াতে লাগল কাদম্বিনী। আর নাকী সুরে অদ্ভুত আর অমানবিক একটা আর্তনাদ করে বলতে শুরু করল, আমি—নবীন গো—তোমাদের নবীন। ওই পুকুরে মা। করতে গিয়ে জলে ডুবে গিয়েছিলাম—আমি কাদুকে—

হয়েছে—অনেক হয়েছে রে শালা—ওঝা খিস্তি করে, তোর ওই মরণলোকের পেত্নীও টেত্নীর সঙ্গে যত খুশি ইয়ে কর না রে হারামজাদা—

—তুমি একটু বুঝে দেখ গো, আবার নাকী সুরে ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না শুরু করল, যখন মরলাম তখন আমার বয়স মাত্র বাইশ বছর—

তুই ওকে ছাড়বি কি না বল? হিংস্র আক্রোশে চিৎকার করে উঠল ওঝা।

আর একটা পানপাতা নিয়ে একটু ছিঁড়ে কাদম্বিনীর গায়ে ছুঁইয়ে দিল—

উঃ পুড়ে গেল গো—আমার সর্বাঙ্গ পুড়ে গেল, তার কাতর আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে উঠল। ওঝা আবার মরিয়া হয়ে রিপিট করতে শুরু করল তার মন্ত্র—

ভূত গোছড়া হাড়গোড় ভেঙ্গে করলাম চুর।
পালা—রে ভূত, তুই না রহিস এ পুর॥
আপন-গুনেতে তুই হইস বড়ো……

যাচ্ছি—বাবা—যাচ্ছি—উঃ কী ভয়ানক যন্ত্রণা—উঃ

বলতে বলতেই হঠাৎ কাটাগাছের মত দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল কাদম্বিনী। দাঁতের গোড়া থেকে গলগল করে রক্ত পড়তে শুরু করল। তাজা রক্ত—

এ তুমি কী করলে গো ওঝা—ভয়ে চিৎকার করে উঠল কালীপদ।

তোমার মাগ বেঁচে গেছে গো—বেঁচে গেছে—ওর ঘাড় থেকে হারামজাদা নেমে গেছে, কাদুর চারিদিকে ঘুরপাক খেয়ে নেচে নেচে চিৎকার করে বলতে লাগল ওঝা—উঃ জব্বর ধরা ধরেছিল গো—

কি করে আমরা বুঝবো যে ভূত নেঁমে গিয়েছে?

এখুনি দেখিয়ে দিচ্ছি, বলেই ওঝা কাদম্বিনীর চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পরেই চোখ মেলে তাকাল কাদু। দুটো চোখে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সুস্থ দৃষ্টি। কিন্তু ভীষণ ক্লান্ত আর অবসন্ন মনে হল তাকে। শুধু একবার অস্ফুট স্বরে বলল একী; আমি কোথায়। বলেই এত লোকজন দেখে লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে চলে গেল। আর কুনো ভয় নাই গো আপনাদের, ওঝা হেসে হেসে বলল কালীপদকে, বৌকে সকাল-সন্ধে রামনাম জপ করতে বল—

কিন্তু আবার পুকুরে জল আনতে গেলেই তো ওকে ভূতে ধরবে।

চিন্তিত হয়ে বলে কালীপদ, এমন ব্যবস্থা করে দিন যাতে আর এরকম হাঙ্গামা—

করছি—দাঁড়ান, বলেই ওঝা চলে গেল উঠোনের এককোণে। যে মাটির কলসীটা নিয়ে জল আনতে গিয়েছিল কাদম্বিনী, সেই জলভরা ঘড়াটার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র বলল ওঝা। তারপরেই গলা চড়িয়ে হুকুম দিল—এই হারামজাদা, তোর এঁঠো এই ঘড়াটা দূরে নিয়ে এখুনি ভেঙ্গে ফেল—তানাহলে তুই আবার আসবি—

তারপরে সত্যিই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। ঝড় নেই। বাতাস নেই—জলে ভরা ঘড়াটা কাত হয়ে গড়াতে গড়াতে ঘরের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে গেল। হুহু করে জল গড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল উপস্থিত সবাই।

ওঝার নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল গ্রামে।

অরিন্দমবাবু! যদি বলেন এই ঘটনা কোথায়, কবে ঘটেছিল? আর অথেনটিসিটি বা বিশ্বাসযোগ্যই বা কতটুকু?

এসব প্রশ্নের উত্তরে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি—নেহাতই গ্রামদেশের ঘটনা। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রহরে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার আশীর্বাদে অতি উন্নত সভ্যতার পাদপ্রদীপের নিচেই কুসংস্কার আর অশিক্ষার অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আমাদের গ্রামগুলো। আর সেই জবুথবু অন্ধকারের ভেতর থেকে জন্ম নেয় এই ঘটনাগুলো। তাই এই উপমহাদেশের যে কোন প্রদেশের পল্লীঅঞ্চলে যান, শুনতে পাবেন এই ধরনের অজস্র কাহিনী পল্লবিত হয়ে লোকের মুখে মুখে ফিরছে তাই—

তাই বলে কি এসব ঘটনা একেবারেই ভিত্তিহীন? ভূতে ধরা। পরকায়া প্রবেশ বা পজেশানের কোন ছিটেফোটাও কি নেই এই ভূতে পাওয়া গেঁয়ো কেচ্ছা কাহিনীর ভেতরে।

কি বলবো অরিন্দমবাবু, প্রেততত্ত্ব যেমন জটিল আর ধোঁয়াটে মানুষের মনস্তত্ত্বও তেমনি বা ততোধিক জটিল আর দুর্জ্ঞেয়। সুস্থ মানুষ হঠাৎ কেন মানসিক সংঘাতে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে যায়, কেন তার চেতনা বিশৃংখল হয়ে যায়, কেন—কিসের অসহ্য আর তীব্র যন্ত্রণায় তার দেহ এঁকেবেঁকে দুমড়ে দুমড়ে ওঠে, মুখের দু'পাশ দিয়ে গ্যাঁজলা গড়িয়ে পড়ে—এক সময় কেন এখনও শহর থেকে বহুদূরে নিভৃত গ্রামে এসবের একটিই ব্যাখ্যা আছে—আছে একটি সংজ্ঞা—

ভূতে পেয়েছে!

সভ্যতার আদিকাল থেকেই পৃথিবীর সব দেশেই কিন্তু প্রেতাবিষ্ট হওয়ার কুসংস্কারটা প্রবলবেগে প্রবহমান ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংল্যাণ্ডে শুরু হল কৃষিবিপ্লব। মাটিতে লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করা, বর্ষার জলে ভরা ক্ষেতের মাখনের মত নরম মাটিতে বীজ ছড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি যুগযুগান্তরের চাষবাসের পদ্ধতিই আমূল পাল্টে গেল। মেশিন দিয়েই জমিতে খাল খোড়া, বীজ বোনা, ফসলকাটা শুরু হল। বদলে যেতে লাগল মানুষের ধ্যান ধারণা।

আবার তার ঠিক একশো বছর পরেই (১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে) জেমস হারগ্রীভস আবিষ্কার করল সুতোকাটা কল—'স্পিনিং জেনী'; তার চারবছর পরে আর্করাইট মাথা ঘামিয়ে বের করলেন অশ্বশক্তিচালিত মেশিন—শুরু হয়ে গেল ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব। তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে। মানুষের আবহমানকালের জীবনধারা বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল তার মানসিকতা বদলে গেল তার দৃষ্টিভঙ্গি। আমার মনে হয় অরিন্দমবাবু মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্যার ভেতরে যেই যন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটল, তখুনি ভূতে পাওয়া বা ভূতে ধরা; দুষ্টু প্রেতপ্রেতিনীর কারসাজি এবং সেইজন্যেই রোগীর অস্থির উন্মত্ততা—ইত্যাদি বন্ধজলায় নিরেট পুরু

দামাঘাসের মত কুসংস্কারের ভেতরে প্রথম তুরপুন চালিয়ে দিলেন মনোবিজ্ঞানী বা সাইক্রিয়াটিস্টরা। তাঁরা বললেন, ভূত প্রেত নয়—Mental disorder due to acute anxiety or Schizophrenia—tangible names—depression derailment etc. তারা আরও বললেন পরিষ্কার করে। ভূতে পাওয়া রোগীর ভেতরে হিস্টিরিয়ারই সিম্পটমস্ বেশি দেখা যায়। কিন্তু—

কিন্তু কেন? ভূতটুথের ব্যাপার যদি আদৌ নাই থাকে তাহলে হিস্টিরিয়াই বা হবে কেন?

মনস্তত্ত্ববিদ বললেন, হবে—মানুষের নির্জ্ঞান মনের ভেতরে লুকিয়ে থাকে হাজারো কামনাবাসনা। সজ্ঞান মন বিষধর সাপের মত এক একটা বাসনাকে সংযত বা অবদমন করতে গেলেই শুরু হয়ে যায় নির্জ্ঞান মনের সংগে তীব্র সংঘাত। সংগে সংগে বিপর্যস্ত হয়ে যায় রোগীর চেতনা। তাঁরা দিয়েছেন কয়েকটা Practical Example বা প্রত্যক্ষ উদাহরণও—

অল্পবয়সী বৌ। ছিমছাম চেহারা। রূপসী নয়। কিন্তু সুশ্রী। ভোরের প্রথম পদ্মের মত এক একটা করে পাপড়ি মেলছে তার অনাগত যৌবন।

সেদিন কি মতিচ্ছন্ন হয়েছিল কে জানে। সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘোর হয়ে যাওয়ার পরে সে একা গিয়েছিল বাইরে প্রকৃতির ডাকে। দেশে গাঁয়ে যেমন হয়। বাথরুম বা ল্যাট্রিন, ইউরিন্যালের বালাই তো নেই। সেখানে বাথরুম মানেই পুকুর।

সেই পুকুরটার চারিদিকের উঁচু পাড়ে ছিল সারি সারি তালগাছ। ভূতের মত ঢ্যাংগা ঢ্যাংগা তালগাছগুলো জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে চারিদিকের অন্ধকার আরো ঘন করে তুলেছিল। এই পুকুরের ঘাট থেকে উঠে এসে হঠাৎ চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল সে। সংগে সংগে ভূতের ওঝা ডাকা হল। এসব কেসে তো পাড়াগাঁয়ে ভূতপ্রেত ছাড়া আর কিছু ভাবা হয় না।

ওঝা বুড়োমানুষ। প্রচুর অভিজ্ঞতা। মেয়েটির হাবভাব দেখেই বলল, কোন মরদ ভূতে ধরেছে বাপু—

কিন্তু আমরা তার কেস হিস্ট্রি নিয়ে দেখেছি—ওঝার কথা একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্য! মেয়েটির নির্জ্ঞান মন পুরুষ ভূতের রূপ নিয়েছিল বা বলা যায় তার অবচেতন মনে পুরুষ সংসর্গের বাসনা তীব্র হয়ে উঠেছিল। কারণ?

বিয়ের পরেই স্বামী চলে গিয়েছিল শহরে। আসত খুব কম। স্বামীসঙ্গ হয়নি বললেই হয়। তাই যে মুহূর্তে রাত্রে সেই নির্জন পুকুরের পাড়ে হয় মাথাউঁচু তালগাছ, না হয় তার খরখরে পাতায় পাতায় বাতাসের ঝমর ঝমর শব্দের একটানা দীর্ঘশ্বাস বা আর কোনকিছু দেখে ভয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দুর্বল চেতনার ওপরে চেপে বসল তার নির্জ্ঞানের মনের সেই কামনা।

আরো একটি—আরো একটি ঘটনার কথা বলেছেন তাঁরা।

তরুণী বিধবা। সুন্দরী। শুধু দেখতে শুনতেই নয় তার ব্যবহারও খুব ভাল। তার সুডোল মুখে হাসি হাসি ভাব। কখনো তাকে কেউ ভার ভার দেখেনি। আর সকলের মুখে মুখে যেটা শোনা যায় তার সম্বন্ধে সেটা হল তার—

চরিত্রের সংযম।

মহিলাটির নাম? আসল নাম তো বলা নিষেধ। ধরে নিন কোন নদীর নাম, কি ফুলের নাম—একটা যা হোক নাম—

যমুনা। যমুনাদেবীর ওপরে প্রেতাত্মা ভর করল। শান্ত স্বভাবের লক্ষ্মী মেয়ে চিৎকার করে আর নিজের মাথার চুল নিজে ছিঁড়ে বাড়ির লোককে অস্থির করে তুলল।

বাড়িতে লোক বলতে মাত্র তিনটি প্রাণী। মা, মেয়ে আর যমুনার এক দূরসম্পর্কের কাকা—রাধামাধব! বয়সের ভারে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে তার দেহটা।

—বৌদি, কি করব—ওঝা ডেকে আনব?

যাও—যাও শীগগীর যাও, অত্যন্ত বিচলিত হয়ে চিৎকার করে উঠল যমুনার মা—আবার জিজ্ঞাসা করছ কী—দেখছ না—মেয়ে কেমন করছে।

লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে বেরিয়ে পড়ল রাধামাধব। বেশ খানিকটা চলে গিয়েছে। এমন সময়—

ও ঠাকুরপো—শুনছো—শোন—শোন—

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে পিছু ডাকল যমুনার মা। রাধামাধব থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কাকে—কোন ওঝাকে ডাকছ বল তো?

কেন রাজবংশী পাড়ার গাবুকে—সেই তো ভূত-টুথের ব্যাপারে—

না-না বঙ্কিম মাস্টেরকে ডেকে নিয়ে এস। বঙ্কিম ছাড়া আর কেউ কিছু করতে পারবে না, বলেই বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল যমুনার মা।

বঙ্কিম এল।

ত্রিশ-বত্রিশ বছরের যুবক। কিন্তু বয়সের তুলনায় একটু বেশি ভারিক্কী দেখায়। সেটা বোধহয় স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতা করে বলেই গাম্ভীর্যের মুখোস পরে থাকতে থাকতে এটাই হয়ে গিয়েছে তার মুখের স্বাভাবিক চেহারা।

পারছি না—আমি আর পারছি না—তারস্বরে চিৎকার করছে যমুনা। তাকে ঘরে শিকল দিয়ে রাখা হয়েছে। তবুও বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে তার দেওয়ালে মাথা ঠোকার শব্দ, শোনা যাচ্ছে তার দাপাদাপি শব্দ—

ঝন ঝনাৎ—শিকল খুলল বঙ্কিম।

কি—কি হয়েছে তোমার যমুনা?

মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল যমুনা। দূরাগত কোন বাঁশীর মধুর সুর শুনে মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সাপিনী।

আবার কি হল তোমার যমুনা, কণ্ঠে যতখানি সম্ভব মধু ঢেলে আস্তে আস্তে বলল বঙ্কিম, তোমার কি কষ্ট, কি দুঃখ আমাকে বলবে না?

কোন কথা বলে না যমুনা।

ঘরের এমাথা থেকে ওমাথা অস্থির পায়ে পায়চারি করে। তার বড় বড় আর ভাসা ভাসা দুটো চোখে কেমন উদভ্রান্ত দৃষ্টি।

কি হয়েছে তোমার, যমুনা—

হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। সমস্ত সংযম আর শালীনতার বাঁধ ভেঙ্গে চিৎকার করে ওঠে যমুনা। আর নিদারুণ আক্রোশে ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মত প্রায় তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, মরবো—মরবো—আমি মরে যাব—জান—আসে—রোজ রাত্রে সে আসে। আমাকে ভয় দেখায়—আমাকে খাট থেকে ফেলে দিতে চায়—

তুমি—তুমি একটু শান্ত হও যমুনা—

উঃ কতদিন—কতকাল রাত্রে আমি এটুও ঘুমাই না। আমি—আমি নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব। জান—বলতে বলতে হঠাৎ যেন দমবন্ধ হয়েই থেমে গেল যমুনা। তার দুচোখে ভয়ের বিভীষিকা। ঠক ঠক করে কাঁপছে হাঁটুদুটো।

রোজ রাত্তিরে কে যেন আমার বুকের ওপর চেপে বসে থাকে, কাঁপা কাঁপা গলায় দ্রুত কণ্ঠে বলে, ঠেলে ফেলে দিতে চাইলেও যায় না—আমার ভয় করে—খুব ভয় করে—

হয়েছে—হয়েছে—বুঝেছি, বলেই তার মুখে হাত চাপা দিয়ে থামিয়ে দিল বঙ্কিম। তাকে পরমস্নেহে বুকের ভেতরে জড়িয়ে নিয়ে এসে খাটে শুইয়ে দিল। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করল না যমুনা। যেন এই রকমই কিছু প্রত্যাশা করছিল। কিন্তু—

চুপ করে শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ধড়মড় করে উঠেই শুরু করল চিৎকার—আমার ভয় করছে—জান ওরা আমাকে মেরে ফেলবে—মেরে ফেলবে, কে আছ বাঁচাও—

বঙ্কিম কোন কথা বলল না। তাকে থামাতেও চেষ্টা করল না। তার অদ্ভুত অপ্রকৃতিস্থ চেহারার দিকে তাকিয়ে তার মুখে কালো কালো কতগুলো ছায়া মুহূর্তের জন্যই ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল।

যমুনার ঘন কালো চুলে ভরা মাথাটা বুকের ভেতর টেনে নিয়ে আর একবার তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করল বঙ্কিম। কিন্তু আরো উদ্দাম—আরো অস্থির হয়ে উঠল যমুনা। করুণ আর্তনাদ করে যেই বলতে শুরু করল আমি মরে যাব—মরে যাব—

অমনি একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল বঙ্কিম।

শুধু অদ্ভুত নয়। অশোভনও।

দু'দিকে পা রেখে যমুনার বুকের ওপরে চেপে বসল বঙ্কিম। আর কপাল থেকে শুরু করে মুখ, গলা, বুক, পেট ছাড়িয়ে একেবারে দুটো পায়ের পাতায় পর্যন্ত খুব আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সে।

পরম আবেশে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল যমুনা। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল সে।

এই বৃত্তান্ত বলে মনোবিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন, যমুনার ভেতরে পুরোপুরি হিষ্টিরিয়ারই লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। আর তার সেই হিষ্টিরিয়ার ভেতর দিয়ে যৌন অতৃপ্তিও আত্মপ্রকাশ করেছিল।

খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেছে বঙ্কিমের সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই ভাব-ভালবাসা ছিল। কিন্তু সামাজিক কোন বিধিনিষেধের জন্য বিয়ে হয়নি। যাইহোক তার যে বাসনা পূরণ করতে পারেনি সেই অতৃপ্ত আকাংখা সার্থক করল হিষ্টিরিয়ার আশ্রয় নিয়ে—

সাইকিয়াট্রিস্টরা হয়ত পরিহাস করেই বলেছেন ভূতে পাওয়া বা হিষ্টিরিয়ার এইসব কেসের আসল কারণ হল—Sexual dissatisfaction, তাই যুবতী মেয়েদের ধরে পুরুষ ভূত আর যুবকদের ওপর ভর করে তরুণীর প্রেতাত্মা।

কিন্তু অরিন্দমবাবু মনে পড়ে যায় মহাকবি সেক্সপীয়রের সেই বহু পুরানো আর বহুল ব্যবহৃত বিখ্যাত উক্তি—Horatio, there are many things between heaven and earth, which are not even dreampt in your philosophy অর্থাৎ আকাশ ও মাটির মাঝখানে এমন বহু জিনিস আছে যা তোমার স্বপ্নেও অগোচর। প্রেতাবিষ্ট হওয়া বা ভূতে পাওয়ার সব ঘটনাকেই কি সাইকিয়াট্রিষ্টদের অবদমিত যৌনবাসনার সোজা ফরমুলায় ফেলা যায়?

মিসেস লরা ক্রম্পটন। তরুণী নয়। কিশোরীও নয়। রীতিমত প্রৌঢ়া। সোনালী চুলে পাক ধরেছে। তার স্বামী হঠাৎ মারা গেল স্ট্রোকে।

লরা ভেঙ্গে পড়ল। কয়েকদিন খুব কান্নাকাটি করল। কালো পোশাক পরল। জানলা দরজায় পর্যন্ত কালো পর্দা ঝুলিয়ে স্বামীর মৃত্যুর জন্য শোকজ্ঞাপন করল। কিন্তু—

শোক মানুষ ভুলে যায়। ভুলতেই হয়। আর দারুণ এই কর্মময় সংসারে শোক জীইয়ে রেখে কেউ বসে থাকতে পারে না। থাকেও না।

লরাও বসে থাকল না। কোমর বেঁধে লেগে গেল স্বামীর বুকের রক্ত দিয়ে গড়া ইলেকট্রিকের ছোট ছোট যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানার দেখাশোনা করত। প্রত্যেকদিন ঘড়ি ধরে দশটার সময় যায়। সারাদিন থাকে। কর্মীদের খোঁজখবর করে। প্রতিটি রেজিষ্টার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চেক করে। দেখে কোন কোন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা তার কারখানার ইলেকট্রিক্যাল

মেশিনারী কিনছে। প্রতিটি অর্ডার পরীক্ষা করে কোম্পানীর লাভের অংশটা জরিপ করতে চেষ্টা করে। সারাটা দিন কাজে ডুবে থেকে বেশ কেটে যায়। কিন্তু—

রাত নামলেই হয় মুস্কিল। বিশাল ফাঁকা বাড়িটা যেন তাকে হাঁ করে গিলে খেতে আসে। শরীরের ভেতরটা ছমছম করে। আর প্রেতপুরীর মত স্তব্ধ সেই বাড়িটার চারিদিকের সাঁ সাঁ বাতাসে তার স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। ভয়ে হিম হয়ে যায় তার বুকের রক্ত। তবুও—,

তবুও কান পেতে শব্দটা কোনদিক থেকে আসছে ধরতে চেষ্টা করে। ছুটে চলে যায় বাগানের দিকে। আবার ছুটতে ছুটতে আসে বারান্দায়। কিন্তু যেই বারান্দায় উঠে আসে, অমনি অন্ধকার ছাদ থেকে ভেসে যায় তার স্বামীর কণ্ঠস্বর—ডিয়ার—ডার্লিং—লরা—

—কি আশ্চর্য তুমি—কোথায়—কোথায় তুমি—চিৎকার করতে করতে ওপরে গিয়ে দেখল, কোথায় কে—কেউ তো নেই। ঘন অন্ধকারে মোড়া জনমানবহীন বিশাল ছাদ খাঁ খাঁ করছে।

কয়েকমুহূর্ত ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ভয়ে আতঙ্কে তার বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। ঘুরতে লাগল মাথার ভেতরটা। তবুও—তবুও সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল, থাকতে চেষ্টা করল যদি আবার—আবার শোনা যায় তার স্বামী তার প্রিয়তমর সেই মধুর কণ্ঠস্বর—লরা—ডার্লিং—কিন্তু—

না।

শুধু ফাঁকা ধুধু ছাতে সাঁ সাঁ বাতাসের একটানা আর্তনাদ অব্যক্ত যন্ত্রণার গোঙানির মত বেজে যেতে লাগল। নিশি পাওয়া মানুষের মত গভীর এক আচ্ছন্নতার ভেতরে মগ্ন হয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, তোমার লরা এখানে—তুমি কোথায় ডার্লিং—বলতে বলতেই সেইখানে জ্ঞান হারিয়ে টলে পড়ে গেল।

অনেক কষ্টে বহু মেহনত করে যদি বা তার চেতনা ফিরিয়ে আনা হল, কিন্তু চোখ খোলা মাত্র কিসের যেন অসহ্য একটা যন্ত্রণায় তার সারা শরীর এঁকেবেঁকে দুমড়ে দুমড়ে উঠতে লাগল। আর যেন মর্মতন্তু ছিঁড়ে চিৎকার করে উঠল, একী! আমি এখানে কেন,—বলেই পট পট করে জামার বোতাম, স্কার্টের বোতাম খুলে, পোশাক-আশাক ফর ফর করে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে হা-হা করে হাসতে লাগল।

ভয় পেয়ে গেল বাড়ির লোকেরা।

চিন্তিত হল প্রতিবেশীরাও।

তারা পরামর্শ করে লরাকে নিয়ে গেল অনেক দূরে সমুদ্রের ধারে এক শহরে। সেখানে একেবারে সাগরের তীরে একটি ছিমছাম সুন্দর বাংলো বাড়িতে রাখল। বাংলোর চারিদিকে বাগানে ঘন সবুজের ছবির মত ঘাসের আস্তরণ, তার মাঝে মাঝে ডালিয়া, ক্রিস্যান্থিয়াম, হেলিওট্রোপ আরও কত

রকমের ফুলের গাছ। ফুলের ঐশ্বর্যে বাগান যেন আলো হয়ে আছে।

এত নিরিবিলি চমৎকার পরিবেশে লরা নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবে বাড়ির লোকেরা সেটাই ভাবছিল। কিন্তু—

কিন্তু হিতে বিপরীত হল। লরা আরো অস্থির, আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। কখনো সাঁ করে পায়ের শ্লিপার খুলে নিয়ে নিজের গালে ঘা দিতে থাকে। কখনো একেবারে উলঙ্গ হয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে কামড়ে নিজেরই দেহটাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে।

আরও বড় কথা। আগে দিনে চার-পাঁচবার অজ্ঞান হত। এখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় সে অজ্ঞান হতে শুরু করল। কত ডাক্তার, বৈদ্য, কবিরাজ এল। কিছুতেই কিছু হল না।

এল ওঝা।

ঘোষ্টডক্টর বা ওঝা অনেকক্ষণ ধরে তাকে দেখে বলল, খুব পাওয়ারফুল কোন স্পিরিট ভর করেছে, একটু থেমে কি যেন চিন্তা করে আবার থেমে থেমে বলল, খুব সহজে নামবে বলে তো মনে হচ্ছে না—বলতে বলতে সে লরার সামনে এল। খুব মিষ্টি করে বলল স্পিরিটকে কেন এই বেচারীকে এত কষ্ট দিচ্ছ—দাও ওকে ছেড়ে দাও—

না—না—আমি কিছুতেই ছাড়ব না। লরার মুখে স্পিরিট বলল।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ঘোষ্টডক্টর।

মন্ত্রপূত চাবুক উঁচিয়ে মারতে উদ্যত হল। হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে বাড়ির লোকেরা বলল, আপনি ছেড়ে দিন ওকে—আমরা অন্য ব্যবস্থা করব—

মাথাটাথা খারাপ হওয়া, ভূতে পাওয়া ইত্যাদি সব কেসে আর অন্য ব্যবস্থা কি-ই বা আছে! অনেক খোঁজ খবর করে জানা গেল ঘোষ্টডক্টরের ঝাড়ফুঁক, লাথি ঝাঁটা মন্ত্রতন্ত্র ছাড়াও হালে বেরিয়েছে একটা নতুন ধরনের ট্রিটমেন্ট—

ইলেকট্রিক শক ট্রিটমেন্ট।

রোগিনীকে অ্যানেসথেশিয়া করে অজ্ঞান করে নিয়ে মাথায় ইলেকট্রিক শক দেওয়া হল। অসহ্য যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটল মুখে। আর লরার মুখে শোনা গেল এক পুরুষকণ্ঠ ক্ষীণ অস্ফুটস্বরে—আমি সালিভান—মেয়েদের ওপর আমার দারুণ আক্রোশ। লিজাকে আমি এত ভালবাসতাম—সে আমাকে ঠকিয়েছিল—মেয়ে জাতটাকে আমি ভেবেছিলাম নির্মূল করে দেব। কিন্তু মা নিষেধ করেছে বলেই করিনি—একটু থামল, আবার বিড়বিড় করে বলল এই মেয়েছেলেটার ওপরে ভর করেছি বলে মা খুব কান্নাকাটি করছে—কেঁদ না মা—কেঁদ না—আমি একে ছেড়ে দিচ্ছি—দিচ্ছি ছেড়ে—

তারপরেই সুস্থ হয়ে উঠল লরা।

১৮৯৯ সালের ২রা আগস্ট তারিখে ডাবলিন শহরের এই ঘটনার প্রসঙ্গে সাইকিয়াট্রিস্টদের কোন একসপ্ল্যানেশান খুঁজে পাওয়া যায় না।

যেমন পাওয়া যায় না বি. জি. জে. পি. (ব্রড গেজ গ্রেট পেনিনসুলার)

রেলওয়ের এক সিনিয়র এবং প্রথম শ্রেণীর স্টেশন মাস্টারের ছেলের বৌ জানকীর কেসে।

মাস্টারমশায়ের মেয়ে মারা গেল।

মাত্র তের বছর বয়স। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। কিন্তু তিনদিনের জ্বরে মরে গেল।

কিন্তু বাড়িতে গভীর শোকের ছায়াটা কেটে যেতে না যেতে আর এক বিপদ বাধল। কোন অসুখ বিসুখ নেই, হঠাৎ কেন যেন ঘন ঘন ফিট হতে শুরু করল জানকী।

খুব চিন্তিত হলেন মাস্টারমশায়। তার একমাত্র ছেলের বৌ। ডাক্তার ডাকলেন। তিনি জানকীর রকম সকম দেখে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেন্সলেস, হয়ে পড়ে থাকে শুনেই ডায়াগোনিসস করে দিলেন—হিস্টিরিয়া! সেইমত প্রেসক্রিপসান করে ওষুধপথ্যও দিয়ে গেলেন। কিন্তু—

কিছুই হল না। অবস্থার কোন উন্নতিই হল না। ওঝা ডাকা হল। সে অনেক ঝাড়ফুঁক করল। তাতেও কোনই ফল হল না।

মাস্টারমশায় দুশ্চিন্তায় পাগলের মত হয়ে গেলেন। কিন্তু হলে কি হবে? ভবিতব্য খণ্ডবে কে! জানকী যে আর কোনদিনই সুস্থ হয়ে উঠবে না, হেসে খেলে গান গেয়ে নিঝুম পুরীর মত বাড়িটাকে আর কখনো মুখর করে তুলবে না জানা গেল সেদিন—

যেদিন শেষ রাত্রে জানকী স্বপ্ন দেখল, লছমী (মাস্টারমশায়ের মেয়ে) এসে দাঁড়িয়েছে তার মাথার কাছে। রাগ রাগ মুখ। হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, তোকে আমিই ভর করেছি—তোকে আমি খুন করে ছাড়ব—

এই ঘটনার তিন মাস পর (১৯০৬ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারী) সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা গেল জানকী।

হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিনে এই বিবরণ দিয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছে—জানকী প্রেতাবিষ্ট হয়েছিল সত্যি-সত্যি। মৃত্যুর পাঁচ-ছয়দিন আগে থেকে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। নির্জলা উপোষ করত। কিন্তু তার শরীরে দুর্বলতার কোন চিহ্ন ছিল না।

অরিন্দমবাবু! হয়ত এই কেসটাতে সায়ক্রিয়াট্রিস্টরা বলবেন, জানকী প্রেগন্যাণ্ট ছিল। সেই অবস্থায় মেয়েরা সামান্য কারণেই খুব বিচলিত হয়ে ওঠে। ভয় পায়। অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রেগন্যানসির বা গর্ভাবস্থার স্বাভাবিক দুশ্চিন্তা এবং ভীতির সঙ্গে অল্পবয়সী ননদের মৃত্যুর নিদারুণ শোক এবং অনিবার্য ভাবে তার অতৃপ্ত প্রেতাত্মার আতংক মিশে গিয়ে তার চেতনাকে বিশৃঙ্খল করে দিয়েছিল।

হয়ত তাই। কিন্তু—

স্বপ্নটা?

অরিন্দমবাবু! মনস্তত্ত্ববিদ্যার পণ্ডিতদের কথা আর কি বলব! পজেশানের বা প্রেতাবিষ্ট হওয়ার বেশির ভাগ কেসগুলোরই কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারেন না তাঁরা। প্রেতগ্রস্ত রোগী বা রোগিনীর ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাওয়া, অস্থিরপায়ে পায়চারি করা ইত্যাদি সিম্পটম দেখে সায়কিয়াট্রিস্ট হয় হিস্টিরিয়া, না হয় স্কিজোফ্রেনিয়া (Schizopnrenia) বা অতিরিক্ত কোন উদ্বেগ কিম্বা গভীর হতাশা বা ডিপ্রেশন থেকে ডিবেলমেণ্ট অফ দি রেন, এবং চরম মানসিক বিপর্যয় বা অ্যাকিউট-সাইকলজিক্যাল ডিসরাপশান ইত্যাদি সিদ্ধান্ত বা ডায়গোনিসিস করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে মনোবিকলনের চিকিৎসা শুরু করেন।

কখনো রোগী সুস্থ হয়ে আনন্দোজ্জ্বল জীবনের আলোয় এসে দাঁড়ায় আবার কেউ বা বিপর্যস্ত এবং বিধ্বস্ত মনের গভীর অন্ধকারে চিরকালের মত তলিয়ে যায়।

তাঁরা সাইকিয়াট্রিস্ট। মনোবিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের সূত্র দিয়েই তাঁরা মানুষের জীবন ও মনের বিচার করে থাকেন। বস্তুগ্রাহ্য এই জগতের (Materia-world) বাইরে তাঁদের দৃষ্টি কখনোই প্রসারিত হয় না। তাঁরা কি কখনো, কোন মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করেন আমাদের এই জীবন ও জগতের মাঝখানে এমন অনেক কিছু আছে যা আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত। তা নাহলে কেন-কেন পরলোক থেকে প্রিয়জন এসে স্বপ্নে দেখা দেয়? কেন তারা সাবেক জীবনের আকর্ষণে তার পুরানো জায়গায় আনাগোনা করে আর কেনই বা আপনজনের ওপরে ভর করে তার চেতনাকে একেবারে বিপর্যস্ত করে দেয়?

এসব 'কেন'র কোন ব্যাখ্যা কোন মনস্তত্ত্ববিদ কেন কেউ-ই দিতে প্যারে না। এমন কি সারাটা জীবন যিনি প্রেতবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেছেন, করেছেন কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, দেশবিদেশের পত্র-পত্রিকায় পরলোকতত্ত্বের ওপরে কত প্রবন্ধ লিখেছেন—সেই মিষ্টার স্টেড (Mr. Stead) তাঁর নিজেরই জীবনের অদ্ভুত ঘটনায় বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সাময়িক ভাবে লোপ পেয়ে গিয়েছিল বুদ্ধিবৃত্তি। একেবারে বুদ্ধু হয়ে গিয়েছিলেন, স্পষ্ট বলেছিলেন—

That strange incident of terrific demonical possession certainly fooled me…… ভয়ংকর সেই দানবসুলভ প্রেতাবিষ্টের বিচিত্র ঘটনা আমাকে বোকা করে দিয়েছিল।

আজও ভেবে পান না স্টেড কেমন করে বৃহস্পতিবারের বারবেলায় সেই লম্বা ঢ্যাঙ্গা মত ইয়ংম্যান সোজা একেবারে চারতলায় তার অফিসঘরের লিফটের সামনে চলে এসেছিল, কেমন করেই বা সে আচ্ছন্নের মত হয়ে পাতার পর পাতা লিখে চলেছিল আর অসহ্য—অসহ্য ও তীব্র কোন যন্ত্রণায় মুচড়ে মুচড়ে উঠেছিল আর কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেছিল, জানেন সে আমাকে

ঘাড় ধরে লিখিয়ে নেয়—ক্লান্তিতে সারা শরীর ভেঙ্গে যায় তবুও লিখতেই হয়—একটু থেমে আবার বুক উজাড় করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিল, জানেন, মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না—কিছুতেই না—

এবার স্টেডেরই জবানীতে শুনুন সেই অদ্ভুত ঘটনা—

জানুয়ারী মাস। শীতের বেলা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। অফিসে কাজ করতে করতে হঠাৎ দেখলাম দুটো! মনে হল টিফনই তো হয়নি। বরাবরই আমি বাইরে টিফিন করি। তাড়াতাড়ি করে খেয়ে ফিরছি। লিফটে করে চারতলায় উঠে এলাম।

আপনি কী অনুগ্রহ করে বলতে পারেন মিঃ স্টেড আজ অফিসে এসেছেন? একটি যুবক এগিয়ে এসে লিফটম্যানকেই প্রশ্ন করল।

আমি—আমিই মিঃ স্টেড—

আপনি?

আমি বৃটিশ আর্মির অফিসার। এখন সিক লিভে আছি কথাগুলো বলছে যেন ধুঁকতে ধুঁকতে।

উসকো খুসকো রুক্ষ চুল। বড় বড় দুটো নীলাভ চোখে কেমন আচ্ছন্নের মত দৃষ্টি।

তা আমার কাছে আপনার কিসের দরকার?

আমি স্পিরিচুয়্যালিজমে ইণ্টারেস্টেড। আমার মনে হয় আপনি আমাকে কিছু অ্যাডভাইস দিতে পারেন, একটু থেমে আমার দিকে কেমন অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে বলল, আমাকে গাইডও করতে পারেন—

হয়েছে কী—আপনার ডিফিকাল্টি কি?

কোন কথা বলল না সে।

আমার কথা যেন শুনতেই পেল না। নিজের চিন্তার ভেতরে মগ্ন হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

কথা বলছেন না কেন?

আপনি আমাকে বাঁচান মিঃ স্টেড—আপনি আমাকে বাঁচান, তার কাতরকণ্ঠের কথাগুলো কেমন কান্নার মত শোনাল।

অনেকদিন থেকেই সে পরলোকতত্ত্বের বই নিয়ে নাড়াচাড়া করত। সময় সময় বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে প্ল্যানচেট বসিয়ে যোগাযোগও করার চেষ্টা করত স্পিরিটদের সঙ্গে। এই কমিউনিকেশানের ব্যাপারটা কেমন একটা দারুণ নেশার মত পেয়ে বসেছিল তাকে।

একদিন অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটে গেল। চাকরির জন্য দরখাস্ত লিখতে বসেছিল। শেষ হয়ে গেল লেখা। তবুও কী আশ্চর্য! কলম আর থামছে না! দ্রুত—অত্যন্ত দ্রুত যেন ঝড়ের বেগে কলম চলেছে। পাতার পর পাতা শেষ হয়ে যাচ্ছে। একটা পাতা শেষ হতেই আর একটা রেডী

করার সময়টুকু পর্যন্ত দিচ্ছে না !

প্রথমে তার মনে হয়েছিল, হয়ত ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্বতস্ফুর্তভাবে লেখবার শক্তি (Automatic writing faculty) অর্জন করেছে সে। খুশিই হয়েছিল সে ! কিন্তু—

কিছুদিন যেতে না যেতেই তার মনে হল কলম ধরা মাত্র এক-দেড় মিনিটের ভেতরে একটা গোটা পাতা শেষ হয়ে যাচ্ছে কি করে ? কেন তার হাতের ভেতরটা ঝিম ঝিম করে ! তাহলে অস্বাভাবিক এই অলৌকিক ঘটনার (unusual phenomenon) আড়ালে কোন প্রেতাত্মার প্রভাব নেই তো ?

তার সন্দেহটা সত্যি হয়ে গেল সেদিন, যেদিন ভোর ছয়টা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত—টানা নয় ঘণ্টা অবিরাম দুরন্ত বেগে কলম চলল। স্নান নেই, খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই—শুধু লেখা আর লেখা। অনেক—অনেক বার বহু চেষ্টা করেও সে কিছুতেই কলম থামাতে পারল না। কোন অদৃশ্য শক্তি যেন জোর করে তার হাত ধরে লিখিয়ে চলেছে ! সে একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেল—Its a complete possession।

যাহোক, প্রতিদিন সে স্পিরিটের নির্দেশে লিখে যেতে লাগল পাতার পর পাতা। কলম ধরলেই ঝরণার মত অবিরল ধারায় কথাগুলো বেরিয়ে আসে ! সবই পরকালতত্ত্বের কথা, মৃত্যুর পর আত্মার পরিণতির কথা—রহস্যময় সেই পরলোকের বাসিন্দাদের বিচিত্র জীবনধারার কথা ! স্পিরিটের সঙ্গে তার এই কমিউনিকেশান যেন তার রক্তে নেশা ধরিয়ে দিল। কিন্তু—

তখনও—তখনও আশ্চর্য হতে অনেক অনেক বাকি ছিল। একদিন কলমে কালি ফুরিয়ে গিয়েছিল। কলমটা নিয়ে দোয়াতে ডুবিয়ে কালি ভরতে যাবে এমন সময় পেনটা ছিটকে এসে পড়ল কাগজের ওপরে। আবার সেটাকে তুলতে গেল। কিন্তু—আশ্চর্য ব্যাপার, কলম হাতে নিতেই সেটা গড় গড় করে চলতে লাগল কাগজের ওপরে। অদৃশ্য কালিতে পাতার পর পাতা লেখা হয়ে যেতে লাগল। আর সেই লেখাগুলো সে বেশ পড়তেও পারছে।

কয়েকদিন পর লক্ষ্য করল কলমেরও প্রয়োজন হচ্ছে না। এমনিই সাদা কাগজের ওপরে লেখা ফুটে উঠছে। আর যখুনি সেই বিচিত্র রহস্যময় লেখা শুরু হয় তখুনি বুকের ভেতরটা ভারি হয়ে ওঠে। অসহ্য ব্যথায় মাথা ছিঁড়ে পড়ে ! কখনো জ্ঞান হারিয়ে টলে পড়ে যায়—আবার কখনো অল্প অল্প সেন্স থাকে ! বেশ বুঝতে পারছে ভয়ানক শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ কোন স্পিরিট তার ওপর ভর করেছে—Very powerful invincible spirit established his control……

শুধু তাই নয়। ধীরে ধীরে এমন অবস্থা হয়ে গেল, তাকে তার যেমন খুশি চালাতে লাগল। কখনো অদৃশ্য কালিতে লেখা রাশি রাশি সেই সাদা কাগজগুলোর সামনে ঘাড় ধরে বসিয়ে দিচ্ছে, আবার কখনো মেঝেতে মাথাটা ঠুকে দিচ্ছে। একটু এদিক ওদিক করলেই মারছে পিঠের ওপরে

সাথি !

তার মনে হল, তার দেহ তার নয়। তার শরীরের ওপরে কোন বশ নেই। তার ইচ্ছায় কিছুই করতে পারবে না সে—

I no longer felt I belonged to myself. It dominates me by its will and I do not know what the end will be……খুব ক্লান্ত আর ক্ষীণ অবসন্ন কণ্ঠে এই কথাগুলো বলেই থেমে গিয়েছিল সে। তার দুটো চোখে ফুটে উঠেছিল আতঙ্কের ছায়া! তীব্র আর অসহ্য কোন যন্ত্রণায় আর কান্নার আভাসে মুখখ না কেমন কুৎসিত হয়ে উঠেছিল।

তার অবস্থা দেখে আমার মনে হয়েছিল, খুব বলিষ্ঠ কোন আত্মা তাকে ধাক্কা দিয়ে জোর করে অন্ধকার খাদে ফেলে দিয়েছে, সেই অতল কালো গহ্বর থেকে বহু চেষ্টা করেও সে কিছুতেই উঠে আসতে পারছে না!

শুনুন ভাই, আপনার মনে জোর আনুন, আমি বললাম কখনো নিজের দৃঢ়তা—নিজের পারসন্যালিটি হারাবেন না—

কোন কথা বলল না সে।

ম্লান হাসি ফুটে উঠল তার শুকনো বেগুনী ঠোঁটে। ঝাপসা গলায় বলল, আপনি বুঝতে পারছেন না স্যার—ভয়ঙ্কর দুষ্ট প্রকৃতির আত্মা—

যত দুষ্টুই হোক আর হিংস্র হোক না কেন, একটু চেষ্টা করলেই আপনি তাকে অ্যাভয়েড করতে পারবেন—

চেষ্টা! অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। খুব আস্তে আস্তে অস্পষ্ট গলায় বলল, কত চেষ্টা করেছি স্যার—এখনও করছি, হঠাৎ থেমে গেল। কয়েকমুহূর্ত কি ভেবে কান্না ভাঙ্গা গলায় বলল, মরা ছাড়া আমার আর গতি নেই—

আমার কেমন সন্দেহ হল, শুধুই স্পিরিটের পজেশান নয়, নিশ্চয়ই অন্য কোন রহস্য আছে। হঠাৎ এই যুবকের ওপরেই প্রেতাত্মার ভর হবে কেন? আর সেই স্পিরিটই বা কার স্পিরিট? কোন না কোন দুর্বলতা না থাকলে তো হঠাৎ পজেশান হয় না। আমার মনে হল, 'এক্সপেরিমেণ্ট' করার মত খুব উপযুক্ত কেস তো!

এখন তো আপনাকে সুস্থই দেখছি—

হ্যাঁ। কিন্তু সে আর কতক্ষণ?

আপনার স্পিরিটকে একটু বলুন না আপনাকে সীজ করতে একটু থেমে বললাম, দেখতাম—কী টাইপের টরচার করে—

তাই বলছেন? বলেই লম্বা লম্বা পা ফেলে আমার চেম্বীরের এ মাথা থেকে ও মাথায় গেল। ফিরে এসে যেই ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল অমনি দু'হাতে পেট চেপে ধরে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল আর হঠাৎ ঠাস করে চিৎ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে—

আহা—কি হল—কি হল আপনার?

আমার কথা শোনার মত অবস্থা তার ছিল না। সে তখন ক্লান্ত জন্তুর মত বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছে। হাঁফাচ্ছে। আর নিদারুণ কোন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে—

কী আশ্চর্য—কি হল আপনার—

আমি—আমি সেই মেয়েটির ঠাকুরদা যে মেয়েটিকে এই ছোকরা পাগলের মত ভালবেসেছিল, তার মুখে এক বৃদ্ধের প্রেতাত্মা কথা বলে উঠল, একদিন, দু'দিন নয়—চার চারটা মাস ধরে মেয়েটার সঙ্গে মেলামেশা করেছিল, রীতিমত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা। তারপরে যা হয়—

উঃ মাগো! আবার শুরু হল খিচুনী। সে কী প্রচন্ড কনভালশান। তোমার এখুনি কী হয়েছে সেই প্রেতসত্তা রীতিমত অভিশাপ দিতে লাগল, তোমার ডিসেন্ট্রী হবে, কলেরা হবে—তুমি মরবে তুমি নির্বংশ হবে—

ওর ওপরে আপনার এত আক্রোশ কেন?

আক্রোশ! হ্যাঁ প্রতিহিংসার আক্রোশ, একটু থেমে আবার সে বলল, বিশ—দীর্ঘ বিশ বছর ধরে প্রেতলোকে আছি। প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত্রি—প্রত্যেক মুহূর্তে আমি ওর মৃত্যু—

বিশ বছর, আমি আস্তে আস্তে বললাম, বিশবছর ধরে পরলোকে বাস করছেন—কিন্তু—আপনার আত্মার তো কোন উন্নতি হয়নি—

হবে আর কি করে ভাই, আমি যে পাপিষ্ঠ—অতি পাপিষ্ঠ—দুশ্চরিত্র নরাধম—

নিজের ওপরে এত ঘেন্না কেন?

এই ছোকরার মত আমিও ছিলাম মিলিটারী অফিসার। চেহারাটা ছিল ফুটফুটে। বহু সুন্দরী মেয়ে আমাকে ভালবেসেছিল আর আমি—

আঃ—উঃ—পেটে হাত দিয়ে ধুঁকতে লাগল আমার হতভাগ্য ভিজিটর। বলল, আমি তাদের প্রত্যেকের চরম সর্বনাশ করেছি—কেউ কেউ লোকলজ্জার ভয়ে আত্মঘাতী হয়েছে—

তারপর?

তারপর আর কি এখন প্রেতলোকে ছটফট করে ঘুরে বেড়াই। এখনও—এখনও আমার বুকের ভেতরে কামনার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলে, মনের ভেতরটা পুড়ে পুড়ে একেবারে খাক হয়ে যায়, হঠাৎ থেমে গেল প্রেতাত্মা।

বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে লাগল আমার ভিজিটর। আর কেমন দুটো ঘোলাটে চোখের অসহায় দৃষ্টি তুলে ধরে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

এখন দূরে থেকে সুন্দরী যুবতী মেয়েদের দেখি। আর মনে মনে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রেমে পড়ে যাই, বলতে বলতে হঠাৎ ভয়ংকর উত্তেজিত হয়ে উঠল, কিন্তু—কিন্তু আপনি তো জানেন সুন্দরী মেয়েদের শুধু দেখে মন ভরে না—ভরতে পারে না। বরং বুকের ভেতরটা আরো জ্বলে যায়। কিন্তু—

খক্—খক্।—কাশতে লাগল আমার ভিজিটর।

জল দেব?

জল কি খেতে দেবে।

না—না—জল পিপাসা পায়নি ওর—ওসব ছোকরার শয়তানী। যাক্ শুনুন, মেয়েদের দেখে কি করব। তারা আমাকে ছুঁতে পারে না। আমি তাদের ছুঁতে পারি না। আমি তাদের নিয়ে কি করব—তারা আমাকে নিয়ে কী করবে—শুধু শুধু সর্বব্যাপী একটা বাসনায় নিশিদিন জ্বলে যাই, একটু থামল প্রেতাত্মা। আবার আস্তে আস্তে বলল, যখন দেখি, মনের ভেতরের ওই বিষধর সাপটা অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গের কামনাটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না তখন মহিলা আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে বেরোই—তাতেও Sex desire অনেকটা কমে—

আপনার নাতনীর সঙ্গে কি রিসেনটলি দেখা হয়েছিল?

আরে—হ্যাঁ রে বাপু। আমি তো এখন তার কাছ থেকেই আসছি—

আপনার নাতনী কি আমার ভিজিটর সম্বন্ধে কিছু বলল?

বলল না আবার? দিনরাত মাথার চুল ছিঁড়ে অভিসম্পাত দিচ্ছে এই ছোকরাকে! মৃত্যু কামনা করছে। সে চাচ্ছে ছোকরার মাথায় বজ্রাঘাত হোক—ধ্বংস হয়ে যাক—

করেছিল কি?

করবে আবার কি, একটা মেয়েছেলের সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে তার সর্বনাশ আর কি ভাবে করা যায়—

একটু থেমে আবার বলল, আমার নাতনী সেই পাপের অনুশোচনায় কেমন একটা গভীর 'ডিপ্রেশানে' ভুগছে। কথা বলে না। মুখ তুলে তাকায় না—হঠাৎ ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে বলল, ফুলের মত সুন্দর মেয়েটার জীবন নষ্ট করে দিয়েছে এই হতভাগা—ওকে আমি ধ্বংস করে দেব—ওকে আমি খুন করব বলেই সোফায় জোরে জোরে মাথা ঠুকতে লাগল।

কয়েকমুহূর্ত পরে সে নিজেকে সংযত করল। আমার ভিজিটরের অসাড় নিস্পন্দ দেহটার হাত বুলিয়ে আবার বলল, দেখুন আমি ছোকরাকে প্রায় আধমরা করে ফেলেছি—এখুনি কী হয়েছে—ওকে খুন করে ওর লাশের ওপরে উঠে আমি ধেই-ধেই করে নাচব—

আপনি—প্লীজ—থামুন—

শুনুন—চারমাস—চারমাস ধরে দিন রাত্রি আমার নাতনীর পিছনে ঘুরঘুর করত এই হারামজাদা। তারপরে শেষ সর্বনাশ করে সরে পড়েছিল। একটু থেমে কঠোর গলায় অভিশাপ উচ্চারণ করার মত করে বলল, চারমাস নয়—চারবছর পাঁচবছর—বছরের পর বছর ধরে যতকাল ও বাঁচবে ততকাল ওর ওপর অত্যাচার চালাব—বলেই হো হো করে হাসল।

ভয়ানক হিংস্র সেই হাসি। কিন্তু—

কেমন অর্থহীন।

একটি মেয়েকে ভালবেসেছে বলে এত রাগ করছেন—আপনিও তো বহু মেয়েকে ভালবেসেছেন—

রঙ—কোয়াইট রঙ চিৎকার করে উঠল সেই বিচিত্র প্রেতাত্মা—ডাউন রাইট রঙ—

আমি কখনো কোন মেয়েকে ভালবাসিনি। শুধু এনজয় করেছি—সিডিউস করেছি, একটু থেমে আবার বলল, মেয়েছেলে মানেই আমার কাছে সেক্স—

সত্যি আপনার জন্য দুঃখ হয়, করুণা হয়—

না—না—খবরদার, দয়া দেখাবেন না, করুণা করবেন না, হঠাৎ বিকট চিৎকার করে উঠল, কারো সহানুভূতি দয়া আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। বলতে বলতেই দুহাতে পেটটা খিমচে ধরে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল আমার ভিজিটর আর তার গোঙানির আর্তনাদে ঘরের বাতাস ভারি হয়ে উঠল।

ডাক্তার ডাকব?

পৃথিবীর কোন ডাক্তার কিছু করতে পারবে না, প্রেতাত্মার কণ্ঠে বিরক্তি ফুটে উঠল, প্লীজ আমাকে ডিসটার্ব করবেন না—অন্যমনস্ক করবেন না—আপনি জানবেন, আমার একমাত্র লক্ষ্য হল—বদলা। তাই আমি ওর দেহটাকে অধিকার করেছি, থেমে গেল স্পিরিট। আবার বেশ শান্ত সংযত হয়ে যেমন করে কোন পরিকল্পনা করে তেমনি করে বলল, প্রথমে সাঁড়াশি দিয়ে ঠোঁটদুটো শক্ত করে ধরে টেনে নিচে নামিয়ে দেব। ছোকরা যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকবে। করুক। আমি কানই দেব না—আমি টানতেই থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত ঠোঁটদুটো ঝুলে পড়ে লম্বা আর সরু হয়ে এবং কিঞ্চিৎ গোলাকার হয়ে ঠিক শুয়োরের মুখের মত না হচ্ছে—

আপনি আমার সামনে এসব করতে পারবেন না?

না—না তা হতে পারে না। আমি ওকে ভর করেছি—এই হতভাগা এখন আমার—সম্পূর্ণ আমার—উৎফুল্ল হয়ে বলল, ওকে নিয়ে আমার যা খুশি তাই করব।

এবার সত্যিই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল সেই বৃদ্ধ আর্মি অফিসারের স্পিরিট। ঠিক আর্মি প্যারেডে যেমন করে অর্ডার দেওয়া হয় তেমনি করে হেঁকে বলল—

টার্ন ইয়োর হেড—

ভিজিটর ডানদিকে মাথা কাত করল।

লে ইয়ারো হেড অন দি রাইট সোলডার—

ডানদিকের ঘাড়ে মাথা নামিয়ে দিল সে।

রোজ ইয়োর হেড—

সে মাথা তুলল।

টার্ন ইয়োর হেড লেফট—

বাঁদিকে মাথা ঘোরাল—

খুক খুক করে হাসল প্রেতাত্মা। বলল, দেখলেন তো আপনার ভিজিটর ভদ্রলোককে কি ভাবে বশ করেছি। একটু থেমে আবার খুব গর্বের সঙ্গে বলল, এখন ওই হতভাগার প্রায় মরা মানুষের লাশের মত দেহটাকে আমার মন যা চায়—

আপনি ওকে পজেস করলেন কি করে?

হো হো করে হেসে উঠল স্পিরিট। বাহাদুরীর হাসি। সাফল্যের হাসি হাসলেন। আপনি তো জানেন, এই ছোকরা স্পিরিচুয়্যালিজমের বইটই নিয়ে নাড়াচাড়া করত—

হ্যাঁ—শুনেছি—

যেই এই হতভাগা অটোমেটিক রাইটিং প্র্যাকটিশ করতে শুরু করল, আমি ওর সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওকে পজেস করে ফেললাম, একটু থেমে হেসে বলল, ঘাড় ধরে পাতার পর পাতা লেখাচ্ছি তখনও ওই নচ্ছারটা বুঝতে পারেনি আমি ওকে ভর করেছি—

একেবারে গোড়াতেই কি ও সহজে লিখতে চাইল?

না—না—তাই কি আর চায় কেউ? একটু থেমে বলল, কলম হাতে নিয়ে ঠোঁটটি মেরে বসেছিল। আমি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে যেয়ে মোক্ষম মন্ত্র বললাম—

মন্ত্র!

হ্যাঁ। বললাম আমি লুসির (আমার নাতনী) স্পিরিট বলছি—আর যায় কোথায়! আনন্দে তার সারা দেহে যেন শিহরণ বয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগে কলম যেন উড়ে চলল, একটু থেমে আবার বলল, লেখাতে শুরু করলাম এমন সব কথা—যা খুব-গোপন, একমাত্র লুসি আর সে-ই জানে। তাই লেখা বেরিয়ে আসতে লাগল প্রেতের মত—

তারপর?

তারপর আর কি! ওই লেখার ভেতরে আমি ওর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যেতে লাগলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা—দিন নেই রাত নেই ওর ঘাড় ধরে লিখিয়েই চলেছি, বলেই হাসতে লাগল স্পিরিট। ঘেঙ্গিয়ে হেসে হেসে হাসির রেস টেনে বলল, ব্রাইট ইয়ংম্যান—নাইস ইয়ংম্যান প্রেম করতে যাওয়ার মজাটা এবার বোঝো, হঠাৎ থেমে গেল।

আমার ভিজিটর অসাড় হয়ে পড়ে আছে।

শুধু নিশ্বাসের তালে তালে ওঠা নামা করছে তার বুক।

ইয়ংম্যান ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে আবার বলতে শুরু করল স্পিরিট,-ওর ফিয়াসে লুসির নাম করে কোন প্রেতাত্মা ভর করেছে! কত চেষ্টা করল

আমাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে—তাই কি আর সম্ভব? আমিও দুঁদে আর্মি অফিসার বলেই হাসতে লাগল। বলল দেখলেন তো কি ভাবে ওই আধমরা হতভাগাটাকে আমি প্যাঁজেস করেছি। আমার যা খুশি তাই করছি—হঠাৎ থেমে গেল। আবার কয়েকমুহূর্ত পরেই ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে বলল, এই কুকুরটাকে আমি ঘেন্না করি—আমি ওর গলা কেটে নেব—ওকে—

না—ওরকম কিছুই আপনাকে করতে দেব না—আমি চিৎকার করে ধমকে বললাম—জেনে রাখবেন আমিও স্পিরিচুয়্যালিস্ট একটু থেমে গলাটা নামিয়ে শাসিয়ে বললাম, কি করে আপনার মত স্পিরিটকে তাড়াতে হয় তার ওষুধ আমি জানি—

আপনি—আপনি শুধু আমার দোষটাই দেখলেন? ও আমার নাতনীকে—

আপনিও যেসব মেয়েদের সর্বনাশ করেছেন তারাও কারো না কারো নাতনী, যান চলে যান—অনেকক্ষণ থেকেছেন—

অদ্ভুত একটা প্রগাঢ় স্তব্ধতা নেমে এল ঘরে।

আঃ-উ-উঃ-পেটটা খামচি দিয়ে ধরে কাতরাতে কাতরাতে উঠে দাঁড়াল আমার ভিজিটর। বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চোখদুটো রগড়ে নিয়ে বলল, দেখলেন তো কি সাংঘাতিক স্পিরিট। আমাকে নিয়ে যা খুশি তাই করল—

আপনার সম্বন্ধেও তো অনেক কথা বলে গেল—

কি বলল—কি বলল?

আপনি যে মেয়েটির সর্বনাশ করেছেন স্পিরিট তার ঠাকুরদা—একটু থেমে বললাম, অবশ্য আমি—আপনাদের কিছুই জানি না—প্রেতাত্মা যা বলে গেল আমি তাই বললাম।

হ্যাঁ, লুসির সঙ্গে আমার অ্যাফেয়ারসটা সত্যি! মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বলল আমার ভিজিটর, কিন্তু কোন ক্ষতি তো করিনি একটু থেমে তীব্র আবেগে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল সত্যি করে যাকে ভালবাসা যায় তার কখনো কোন অনিষ্ঠ করা যায়?

তাহলে আপনাদের রিলেশানটা লুসির বাড়ির কেউ-ই ভাল চোখে দেখত না?

না।

কেন?

ওরা ক্যাথলিক। আমরা প্রোটেস্ট্যান্ট বলে—বলেই কেমন অসহায় আর করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

দেখুন—আপনার যা অবস্থা দেখছি, আমি বললাম, এখুনি এই মুহূর্তে এই শহর ছেড়ে দেশ ছেড়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যাওয়া উচিত—

—তাহলেই কি স্পিরিট আমাকে ছেড়ে দেবে? আপনি তো জানেন—তারা সর্বত্র যেতে পারে চোখের পলকে—

—জানি—জানি—কিন্তু ইয়ংম্যান আপনাকে তো বাঁচতে হবে—

কিন্তু—কিন্তু কেমন করে—কেমন করে? সেজন্যই তো আপনার কাছে এসেছি—

শুনুন, কখনো ভুলে যাবেন না আপনি ব্রাইট ইয়ংম্যান—আপনি আর্মি অফিসার। আপনার ব্যক্তিত্ব আছে—বুদ্ধি আছে—তাকে হিপনোটাইজ করার মত করেই বেশ ঝেঁকে ঝেঁকে কথাগুলো বলছিলাম, স্পিরিটকে বেশ ভদ্র আর বিনীতভাবে অগ্রাহ্য করবেন।

—কিন্তু জোর করে হাত ধরে যে লিখতে বসিয়ে দেবে?

—হাতটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখবেন—

—তাহলে কথা বলতে আসবে—

—তার কোন কথার উত্তর দেবেন না। বোবা হয়ে থাকবেন, একটু হেসে বললাম, ইয়ংম্যান বড় শক্ত গেরোতে পড়েছেন—আপনাকে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে লড়াই করতে হবে—

—হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন স্যার, আমি বেশ ভালভাবেই জানি—আমাকে বাঁচার জন্যই সংগ্রাম করতে হবে—

হ্যাঁ, কারেক্ট। আমি খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম—মনে রাখবেন ফাইট—ফাইট—ফাইট টু দি লাষ্ট—এমন কিছু করবেন না স্পিরিট যা চায়। সে যেটা বলবে তার ঠিক উল্টোটা করবেন। প্রতিটি মুহূর্তে তাকে নস্যাৎ করে দেবেন, একটু থেমে তার হাত দুটো ধরে অনুনয় করে বললাম, তার শক্তিকে খর্ব করে আপনার উইলফোর্সকে অ্যাসার্ট করতে হবে—

পারব স্যার—চেষ্টা করব, কেমন অস্পষ্ট শোনাল তার কণ্ঠস্বর। একটা কথা বলব, মনে কিছু করবেন না?

বলুন—

লুসি এখন কোথায়?

—জানি না। তার সঙ্গে আমার সব সম্বন্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে স্যার—

—কিন্তু আপনি তো ওকে এখনও ভালবাসেন?

—বাসি।

—তাকে বিয়ে করতে চান?

—চাই। কিন্তু লুসি কিছুতেই রাজি হবে না—

—কেন?

—আমার সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে স্ক্যাণ্ডাল ছড়িয়ে ছিল বলে সে খুব ক্ষুব্ধ আর অনুতপ্ত—সে নাকি বলেওছে জীবনে কখনো আর আমার সঙ্গে দেখা করবে না—

ওঃ মেয়েরা ভালবাসলে অভিমান করে ওরকম অনেক কথা বলে, আমি বললাম, ওসব গায়ে মাখবেন না—আপনি আর একটুও দেরি না করে লুসিকে আপনার এই অবস্থাটা বলুন, যাই বুড়োর স্পিরিটের কবল থেকে উদ্ধার

পাওয়ার জন্য ওর সাহায্য—

আমার কথা আর শেষ করতে পারলাম না।

স্পিরিটের প্রসঙ্গ উঠতেই তার চোখে আতংকের ছায়া পড়ল। তার মুখ থেকে ক্ষণকাল আগের সেই জোরালো ঝকমক আলো যেন দপ করে নিভে গেল। আমতা আমতা করে বলল, আচ্ছা যাওয়ার সময় স্পিরিট কিছু বলেছিল?

হ্যাঁ। আপনাকে নাকি আজ রাত্তিরেই খুন করবে—গলা কেটে নেবে—

আঃ উঃ-উঃ আবার পেটটা দুহাতে খিমচে ধরে প্রহৃত পশুর মত আর্তনাদ করতে শুরু করল সেই ইয়ংম্যান। তাকে দেখে আমার মনে হল এবার সেই স্পিরিটের আক্রমণ আগের চেয়ে অনেক—অনেক বেশি নিষ্ঠুর অনেক বেশি হিংস্র। আর প্রকাশ্য বিরোধীতার মত বেশ উচ্চকিত।

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না সে। তীব্র যন্ত্রণায় সারা শরীর মোচড়াতে মোচড়াতে মেঝেতে টলে পড়ে গেল। আর শক্ত সেই শানের মেঝেতে বদ্ধ উন্মাদের মত মাথা ঠুকে ঠুকে তার মুখখানাকে এমন রক্তাক্ত এমন ভয়াবহ করে তুলল—যে সে দৃশ্য আমার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল—

এই পর্যন্ত বলে ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত পরলোকবিদ মিঃ স্টেড মন্তব্য করেছিলেন, এই যুবকটির ভেতরে ইনস্যানিটি সবে দেখা দিয়েছে। তানাহলে স্পিরিটের কন্ট্রোল যেই থেমে যায় অমনি সুস্থ এবং শান্ত হয় কি করে? কিন্তু যদি পাগলামি বলেন তাহলে বলব প্রেততত্ত্ব নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি করেছিল বলেই মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল।

আমার মনে হয় এই কেসটি কোন সাইকিয়াট্রিষ্টকে দেওয়া উচিত। তারা তো আর আমাদের মত বলবেন না কোন স্পিরিটের পজেশান। সোজা ইলেকট্রিক শক দিয়ে ট্রিটমেণ্ট শুরু করবেন—

অরিন্দমবাবু। দেখলেন তো, মিঃ স্টেডের মত অতবড় ডাকসাইটে প্রেততত্ত্ববিদও সাইকিয়াট্রিষ্টের কথা বলেছেন। বলেছেন অবশ্য বিদ্রূপ করে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ঠিক কী বলেছেন শুনুন—I wish any materialistic doctor would take the man (Visitor) in hand. He would, I am sure be less scornful in his comments upon that Exploded Superstition of Demonical possession.

অর্থাৎ কোন ডাক্তার এই ভদ্রলোককে (ভিজিটর) দেখলে ভূত ধরা বা পজেশান যে একেবারে ফালতু এবং বাজে একটা কুসংস্কার বলে কখনই তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিতে পারত না……

কিন্তু সেই সঙ্গে আবার সাইকিয়াট্রিষ্টের বা মানসিক রোগের ডাক্তারের *কথাও বলেছেন কেন? হয়ত ভেবেছেন, প্রেতাবিষ্ট হলে বা পজেশান হলে* মানুষের মনের গহন অবচেতনায় যে ভয়ংকর বিপর্যয় দেখা দেয়, বিকল করে

দেয় তার চেতনা, দেখা দেয় উন্মাদের লক্ষণ—সেইসব ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে মনোবিজ্ঞানী ! কিন্তু—

কিন্তু যেখানে প্রকৃতই পরকায়া প্রবেশ ঘটেছে এবং বেশ নিবিড় ভাবেই প্রেতাবিষ্ট হয়েছে সেখানে কি সাইক্রিয়াট্রিষ্টের কোন ভূমিকা থাকে ? আদৌ কি মনোবিজ্ঞানী সেই হতভাগ্যকে কোন সাহায্য করতে পারে—

তাই যদি পারত তাহলে আর পঞ্চাশ বছর আগে এলাহাবাদের বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক পাইওনিয়ার পত্রিকায় কখনই নিচের এই অদ্ভুত চিঠিট প্রকাশিত হত না।

টুংভুলা

২রা জানুয়ারী, ১৯৩৭

প্রিয় মহাশয়,

যদি অনুগ্রহ করে কিছু মনে না করেন তাহলে আপনার এই বহুল প্রচারিত দৈনিকে আমার দশ বছর আগের একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা খুব সংক্ষেপে বলি। নিশ্চয়ই বলা দরকার কিছুদিন আগে আপনার এই কাগজেই সুদূর বেলুচিস্থানের কোয়েটার একটি সুদৃশ্য বাড়ি শাঁওনভিলার একটা আশ্চর্য ঘটনার বিশদ বিবরণ ছাপা হয়েছিল বলেই আমি খুব উৎসাহিত হয়েছি।

আমার ঘটনাটি বেলুচিস্থানের সেই শাঁওনভিলার মতই অলৌকিক। অতিপ্রাকৃত। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। অথচ—

বাস্তব। কঠিন বাস্তব। একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্যি—আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। এবং একদিন নয়, দুদিন নয়— দিনের পর দিন। রাত্রির পর রাত্রি—জানেন, এখনও—এখনও, পুরো এক দশকের বেশি ব্যবধানে এসেও সেই নিদারুণ ঘটনা আমার স্মৃতির ভেতরে জ্বল জ্বল করে।

কিন্তু আপনি শুনলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবেন, এই অদ্ভুত ঘটনা প্রসঙ্গে আমি ছিলাম অদ্ভুত ভাবে মৌন। কাউকে ঘুণাক্ষরেও একটা কথা বলিনি। কারণ, পরলোকতত্ত্বে আমার কিছু বিশ্বাস আছে ঠিকই, কিন্তু নিশিরাতে হঠাৎ প্রেতের আবির্ভাব, দূরে থেকে তাদের কথা বলা ইত্যাদি ভূতুড়ে কর্মকাণ্ডে আমার এতটুকু আস্থা নেই—

সে যাই হোক, এবার ঘটনাটা বলি।

বোধহয় রাত দুটো হবে। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পাশেই ছিলেন গভীর ঘুমে অচৈতন্য আমার স্ত্রী। আমাদের দুজনেরই শুতে একটু রাত হয়েছিল। আমার বৃদ্ধা মা-র হুকুমে বাড়িতে কীর্তনের আসর বসানো হয়েছিল। নদীয়া থেকে এক বড় কীর্তনিয়া এসেছিলেন। সেই সব ঝুটঝামেলায় রাত হয়ে গিয়েছিল। তাই

শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে গভীর ঘুমে অসাড় হয়ে গিয়েছিলাম—

হঠাৎ বোধহয় একটা মাথা পাগলা বাতাসের ঝড় আছড়ে পড়েছিল ঘরে। আর ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলো উড়ে গিয়েছিল ফর ফর শব্দ করে কিন্তু সেই শব্দেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। চোখ খুলতেই আমার মাথার প্রত্যেকটা চুল খাড়া হয়ে গিয়েছিল। একেবারে হিম হয়ে গিয়েছিল বুকের রক্ত!

মশারীটা খুব দুলছিল। আমার মনে হয়েছিল নিশ্চয়ই বাতাসে। কিন্তু কী আশ্চর্য! হাওয়ায় উড়তে উড়তে হঠাৎ মশারীটা দু'ফাঁক হয়ে গেল। আর তার ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে এল আমার খুব আদরের ভাইঝি! খুব সুন্দরী। ফুটফুটে চেহারা। অপর্ণা—অপু। সে থাকে আঠারো মাইল দূরে আমার গ্রামের বাড়িতে।

আমাকে দেখে অপুর মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

অ—পু!—তুই কি করে এলি—বলেই হাত দুটো বাড়িয়ে ছুটে তার দিকে যেতেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চলে গেল চিরকালের মত।

পরের দিন অফিসে বসে কাজ করছি। কিন্তু মাথার ভেতরে সেই অদ্ভুত স্বপ্নের ব্যাপারটা আনাগোনা করছে। অপু ভাল আছে তো!

সাড়ে দশটা নাগাদ দেশ থেকে লোক এল। নিয়ে এল ভয়ংকর দুঃসংবাদ—অপু—অপর্ণা গতকাল রাত দুটোয় (ঠিক যখন স্বপ্ন দেখেছিলাম) মারা গিয়েছে! সঙ্গে সঙ্গে দেশে রওনা হলাম। গ্রামে পেঁ৷ছে সোজা চলে গেলাম শ্মশানঘাটে। ততক্ষণে যথারীতি শবদাহ হয়ে গিয়েছে। চিতায় জল ছিটিয়ে শেষকৃত্য করে বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু—

না এলেই বোধহয় ভাল হত। বুকের ভেতরটা ভারি—খুব ভারি হয়ে উঠল। মনে হল কে যেন দশমনী ওজনের একটা বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিম করে। ভয় হয়, বুঝি টলে পড়ে যাব। আবার সময় সময় মনে হয়, আমার পায়ের নিচে যেন মাটি নেই। আমি একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছি একটা অতল অন্ধকার খাদে।

আমার অবস্থাটা স্ত্রীকে বললাম। সে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলল, ওসব কিছু নয়। অপু তোমাকে খুব ভালবাসত। তুমিও ছিলে ভাইঝি অন্ত প্রাণ—তাই তোমার ওরকম লাগছে—

ওর কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতচমকের মত আমার মনে পড়ে গেল এক প্রখ্যাত দার্শনিকের উক্তি—এই বিশ্বসংসারে কোন

কিছুরই মৃত্যু নেই—একটি অনু কি পরমানুও ধ্বংস হয় না। তাই দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম-ভালবাসা বা স্নেহ-প্রীতিই বা অন্তর্হিত হবে কেন? Love—the best of things cannot be doomed to die with the dissolution of the body…

শেষ পর্যন্ত হলও তাই। স্নেহ-ভালবাসা কখনো মরে না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে গেলাম। অপু ছিল আমার চোখের মণি। সে-ও আমাকে দারুণ ভালবাসত। অতএব তার আত্মা আমার প্রতি তীব্র আকর্ষণে আমার ওপরে একটু একটু করে ভর করল। আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন হয়ে এল আমার চেতনা।

আমি প্রেতাবিষ্ট হলাম।

আমার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হয়ে উঠল। মাথা তুলতে পারি না। অসহ্য যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ে মাথাটা। নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল মনে হয়—মনে হয় যেন সামান্য কিছুদিন আগে খুব একটা ভারি অসুখ থেকে উঠেছি। আর নিশিদিন প্রতিটি মুহূর্তে আমার চেতনার ভেতরে জ্বলজ্বল করে অপুর ধারালো চেহারাটা। কিছুতেই বহু চেষ্টা করেও তাকে আমি সরিয়ে দিতে পারি না আর অদ্ভুত একটা অভিভূত আচ্ছন্নতার ভেতরে তালিয়ে যাই। ধীরে ধীরে স্নায়ুগুলো যেমন বিকল হয়ে আসে।

ডাক্তার কল দেওয়া হল। জেনারেল ফিজিশিয়ান। প্রেশার দেখলেন। বুক পরীক্ষা করলেন। বোধহয় দুর্বলতা দূর করার জন্য কিছু ভিটামিন জাতীয় ওষুধ দিলেন। কিন্তু—

কিছুই হল না। এবার ডেকে নিয়ে আসা হল এক প্রবীন সাইক্রিয়াট্রিস্টকে। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার কেস হিস্ট্রিটা শুনলেন। শুনলেন অপুর সঙ্গে আমার রিলেশান। এমন ছোটখাটো দুটো একটা ইনসিডেন্টও শুনতে চাইলেন—যাতে বুঝতে পারা যায় আমার ওপরে অপুর অ্যাটাচমেন্টের ইনটেনসিটি (গভীরতা)!

যতটুকু মনে আছে—সবই তাকে বললাম। বললাম, যত রাতই হোক, আমি না আসা পর্যন্ত অপু কিছুতেই খেতে চাইত না। বলত, মেজকা আসুক না—তোমরা এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ভাল কোন জিনিস রান্না হলে প্রথমেই খোঁজ করত মেজকার জন্য আলাদা করে তুলে রাখা হয়েছে কিনা!

মা অত্যন্ত বিরক্ত হতেন।

সব বৃত্তান্ত শুনে ডাক্তারবাবু বললেন, ভাইজীর কথা একটু কম ভাবুন সুস্থ হয়ে যাবেন, কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে আবার খুব আস্তে আস্তে বললেন, শুনুন, সায়ক্রিয়াট্রিক ট্রিটমেন্টে যেটা একেবারে

ফার্ষ্ট স্টেপ—হল কমিউনিকেশান (রোগীকে জিজ্ঞাসাবাদ, তার অচেতন মনের ভেতরে সঞ্চিত 'ফিক্সেশান'কে—। (বদ্ধমূল ধারনা বা চিন্তা, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জেনে নেওয়া) মেথডে চিকিৎসা করে গেলাম. একটু থেমে বললেন আবার, আশা করি ভাল রেজাল্ট পাবেন—

ওষুধ দিলেন, কতগুলো 'নার্ভ সুদিং' এবং ইনসমনিয়ার (ঘুমের) ওষুধ। এসব ওষুধে ফল হল। কিন্তু সাময়িক—ওষুধের এফেক্ট শেষ হলেই আবার যে-কে সেই। সেই অসহ্য মাথা ধরা, সেই দুর্বলতা আর চেতনা একটু একটু করে অসাড় হয়ে আসা এবং মনের অতল গহনে দাঁড়িয়ে অপুর ব্যাকুল হাতছানি সমানে চলতে থাকে। আমার মনে হল—আমি বোধহয় এবার পাগল হয়ে যাব।

বাড়ির লোক খুব চিন্তিত হয়ে উঠল। তারা যখন ইলেকট্রিক শক ট্রিটমেণ্টের জন্য তোড়জোড় শুরু করল তখন আমার বৃদ্ধা মা বললেন আমার ভাইদের শোন ডাক্তার-কবরেজ গুলে খাওয়ালেও কিছু হবে না—তোরা বাড়িতে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা কর, একটু থেমে আবার বললেন, অপু কীর্ত্তন গান খুব ভালবাসত—

কথাটা আমার মনে ধরল। ভাইরাও রাজি হয়ে গেল। আর সেই দিনই সন্ধ্যায়—

খুব ধুমধাম করে গৃহদেবতা রাধামাধবের পুজো দেওয়া হল। ধূপ ধুনোর মিষ্টি গন্ধে আর মঙ্গলারতির সমধুর ঘণ্টাধ্বনির দূরাগত মূর্ছনায় সারা বাড়িতে একটা আরাত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হল। আর—

আশ্চর্য! তখুনি আমার মাথাটা হাল্কা মনে হতে লাগল। পুজো শেষ হল। সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘন হল। এবার বসল কীর্ত্তনের আসর। বেজে উঠল খোল, বেজে উঠল মৃদঙ্গ আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাজতে লাগল করতাল। সেই ঐকতানের মধুর ধ্বনি আমার উত্তপ্ত আর বিকল চেতনার ওপরে যেন কেমন মনোরম আর স্নিগ্ধ শীতল একটা আবেশ ছড়িয়ে দিল। আর আমার তেতে-ওঠা কানদুটোর পাশ দিয়ে ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়া বইতে লাগল। আর অনেক—অনেকদিন পরে—অনেক বিনিদ্র রাত্রির পরে সেই প্রথম মধুর একটা ঘুমের আবেশে আমার চোখদুটো জড়িয়ে এল। তখুনি কানে এল কীর্ত্তনীয়ার উদাত্ত কণ্ঠের সেই গান—

পঞ্চ রিপুর এই দেহ হবে রে খাঁচা ছাড়া।
(জানবি) মরণের চেয়ে আর নাইকো কিছু বড়া॥
ওরে, তোর আত্মাটা চলে যাবে সুদূর অনন্তধামে।
তোর নশ্বর দেহটার শুধু ভস্ম পড়ে থাকবে ধরাধামে…

গানের কথাগুলোর ভেতরে কোন সুদূর লোকান্তপারের সেই অজানা জগত এবং জন্ম-মৃত্যুর অবিরাম প্রবহমান লীলার আভাস

আছে বলেই হয়ত আমার মনটা কেন যেন একটা উদার আর মহৎ অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে গেল। আর—

খোল আর মৃদঙ্গের গম্ভীর মধুর ধ্বনির সওয়ার হয়ে গানের কথাগুলো গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষিণতর হয়ে দেশ-দেশান্তর, লোকলোকান্তর পার হয়ে যেন এক অসীম সুদূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। আর সেই দূরাগত ক্ষীণ শব্দে আমার চেতনা কেমন একটা মধুর অনুভূতিতে একটু একটু করে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে আমার মনে হল—

মনে হল, অনেকদিন পর যেন একটা ঘন নিচ্ছিদ্র অন্ধকারের জগত থেকে অবারিত আলোর রাজ্যে পেঁছে গিয়েছি। সেই দিনই—

অনেক রাতে চাঁদ উঠল। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। সেই ধূসর ম্লান জোৎস্নার আলোয় আমার জানালার সামনে সে এসে দাঁড়াল। আমাব মনে হল, এক টুকরো মেঘ-ই যেন নেমে এসেছে। দূর থেকে বলল, মেজকা আমি খুব খুশি হয়েছি। আর কখনো তোমার কাছে আসতে হবে না। আমি যাচ্ছি মেজকা—

এখনও তার কথা খুব মনে হয়। মনে তো হবেই। কিন্তু আর কখনো অসুস্থ বোধ করিনি—

নমস্কারান্তে—

ইতি—

বিনীত

অবিনাশ চন্দ্র শর্মা, এম. এ. বি. এল.

অ্যাডভোকেট.

অরিন্দমবাবু,

ভূতে পাওয়া বা পরকায়া প্রবেশ অথবা প্রেলোকবিদদের ভাষায় পজেশানের অনেক ঘটনাই তো শুনলেন। স্মরণ রাখবেন কিন্তু টুকরো টুকরা এই ঘটনাগুলোর মাধ্যমে আমি প্রেতের অস্তিত্ব, প্রেতাত্মার জীবিত মানুষের দেহে অনুপ্রবেশ, প্রেতাবিষ্ট মানুষটির কণ্ঠে স্পিরিটের কথা বলা ইত্যাদি কোন কিছু প্রমাণ করতে চেষ্টাই করিনি। অবশ্যই অলৌকিক এবং অতিপ্রাকৃত কর্মকাণ্ডের ছড়াছড়ি যেখানে সেই প্রেতলোকের কোন ঘটনাকেই প্রমাণিত করা যায় না। তবুও—

তবুও আপনাকে শুধু এইটুকুই বলতে পারি, পরকায়া প্রবেশের বা ভূতে পাওয়া অথবা ভূতে ধরার প্রতিটি ইতিবৃত্তের প্রত্যেকটি কথা পর্যন্ত প্রমাণসিদ্ধ এবং বহু পরীক্ষিত সত্য। শুধু তাই নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বলা হয়েছে ঘটনাগুলো—The possession and the voice of

spirit and such other oddities ought to be based firmly on tastable evidences……

তাই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন অধিকাংশ ঘটনাই আমি রাম-শ্যাম বা তৃতীয় পুরুষের মাধ্যমে শুধু নীরস বিবরণের মত করে না বলে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় আমি দেখেছিলাম, আমি শুনেছিলাম বলে যার জীবনের ঘটনা তাঁরই জবানীতে বা উত্তম পুরুষে বলতে চেষ্টা করেছি।

ভুতে পাওয়া প্রসঙ্গের একেবারে এই সর্বশেষে বিচিত্র ও অদ্ভুত ঘটনাটির প্রধান কুশীলব বা প্রধান বক্তা এক ইংরেজ—ব্রিয়ান ব্র্যানস্টন (Brian Branston)। অবশ্যই সমস্ত ঘটনাটির বিবরণ তিনি বলবেন তাঁর জবানীতেই। কিন্তু সেখানেও আছে অনেক জটিলতা। হবেই তো। মূল ব্যাপারটাই যে খুব জটিল আর কেমন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কখন যে কোনদিকে দ্রুত বাঁক নিয়ে রহস্যময় সর্পিল পথে এগিয়ে গিয়েছে তা বুঝতে পারা খুব মুস্কিল। তাই—

ব্র্যানস্টন খুব বিব্রত হয়ে নিজেই বলেছেন। কেমন করে এবং কোথায় থেকে যে শুরু করব, তাই তো বুঝতে পারছি না—

বি. বি. সির (ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশান) স্টুডিওতে সেই রেকর্ডটা চালিয়ে দেওয়া হল। অমনি যেন ঝন ঝন করে বেজে উঠল ভাঙ্গা ভাঙ্গা আর ককর্শ এক কণ্ঠস্বর। সে প্রচণ্ড উত্তেজিত আর বিক্ষুব্ধ হয়ে ঝড়ের বেগে কথা বলে চলেছে। আর আশ্চর্য! বলছে কখনো আফ্রিকার বান্টু ল্যাঙ্গুয়েজে, আবার কখনো মধ্য ইউরোপের প্রাচীন শ্লাভ ঘেঁসা ভাষায়—কখনো বা চোস্ত উর্দুতে অনর্গল কী সব বলে চলেছে—আমি কী এখান থেকেই ঘটনাটা বলতে আরম্ভ করব? না কি চলে যাব একেবারে পাঁচ—পাঁচটা দশক পেছিয়ে সেই বাহান্ন বছর আগে ডাবলিনের ভয়ংকর নৃশংস সেই জোড়া খুনের বীভৎস ও সর্বনাশা প্রসঙ্গে? ১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রে যখন ঝির ঝির করে তুষারের বৃষ্টি ঝরছিল তখন চারিদিকের দুর্ভেদ্য আর আদিঅন্তহীন কুয়াশার ভারি চাদর যেন হঠাৎ ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দিয়ে তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল এক রমণীমূর্তি! অসাধারণ রূপসী। তার সমবয়সী সঙ্গিনী মেয়েটিকে নিচু গলায় কি বলে খুব তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠল—আর ঘন কুয়াশার ভেতরে গাড়ির লাল আলোটা প্রেতের মত একচক্ষু হিংস্রতায় জ্বলজ্বল করতে করতে দূরে-বহু দূরে গিয়ে বিন্দুর মত মিলিয়ে গেল! সেই যে গেল—সেই তার শেষ যাওয়া—এইখান থেকেই শুরু করব বলতে? • যাক—বেশি গৌরচন্দ্রিকা করতে গেলে একেবারেই খেই হারিয়ে ফেলব।

আমাকে আরম্ভ করতে হবে অনেক—অনেক আগে থেকে। চলে যেতে হবে সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের পর্যায়ে। ১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে জার্মানরা চারিদিক কোণঠাসা হয়ে পড়ে সারেণ্ডার করার কথা ভাবছে। জাপানেও

যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে আসছে। এই সময়টা আমি ছিলাম আর্মিতে। আর ভারত এবং ব্রহ্মদেশের অনেক ফ্রন্টেই লড়াই করেছি। আরও—

বলতে হয় অধিকাংশ সময়ই আমি ভারতীয় বাহিনী বিশেষ করে পাঞ্জাবী মুসলমান, পাঠান এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পার্বত্য উপত্যকার বালুচদের সঙ্গে কাজ করেছি।

১৯৪১ সালে কোয়াটাতে আমার পোস্টিং হল। আমার খুব ইচ্ছা হল, এদেশের ভাষাটা অর্থাৎ উর্দু শিখি। এক মুন্সী বা মৌলভী সাহেবকে এনগেজ করলাম। খুব ভাল শিখিয়েছিল। ১৯৪৫ সালে চারবছর পর ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলাম। সে সময় আমি রীতিমত ফ্লুয়েণ্টলি উর্দুতে কথা বলতে পারি। ক্ল্যাসিক্যাল উর্দুও একটু আধটু জানি।

শুধু তাই নয়। ইণ্ডিয়ানদের মত খুব গরম গরম ঝোল ভাতও বেশ খেতে শিখেছি। আর খুব ভালও বাসি—হিন্দু আর মুসলমান—দুটো কমিউনিটিকেই। কিন্তু এখন থাক—সেসব অনেক-অনেক পরের কথা।

কোয়েটায় দুই বছর কাটতে না কাটতেই বদলীর অর্ডার এসে গেল। এবার আমাকে পাঠিয়ে দিল সুদূর আরাকানের যুদ্ধ বিধ্বস্ত আকিয়াবের একশো মাইল দক্ষিণে। আমাকে চট্টগ্রামে এবং মাদ্রাজে রিপোর্ট করতে বলা হল। আমি অত্যন্ত ব্যস্ত এবং জনবহুল শহর—মাদ্রাজে যেয়ে কোনেমারা হোটেলে উঠলাম। আর—

এইখানেই খুব ফিটফাট এবং স্মার্ট এক শিখ যুবকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। সে আবার এ্যাস্ট্রলজার। আমার হাত দেখেই বলে বসল, আপনার দুই ছেলে এবং একটি মেয়ে মোট তিনটি সন্তান আছে—

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। হাসির রেশ টেনে বললাম, আমি এখনও বিয়েই করিনি—

কিন্তু আমার ক্যালিকুলেশান ভুল হতে পারে না—

আশ্চর্য। কয়েকবছর পরে আমার এমন মহিলার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার তিনটি ছেলেমেয়ে ছিল। সত্যিই আমি বিস্ময়কর ক্ষমতা দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সেই তরুণ শিখ-ই আমাকে প্রথম বলেছিল—সে প্রেততত্ত্বের চর্চা করে। স্পিরিটের সঙ্গে কথা বলতে পারে এবং বলেছিল Very cxpert in apparition dbealing অর্থাৎ প্রেতাত্মাদের নিয়ে কাজ ক রব র করতে সিদ্ধহস্ত।

তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হওয়ার পর থেকেই পরলোক-প্রেতাত্মা ইত্যাদি ধোঁয়াটে ব্যাপারগুলো আমার মাথায় খুব আনাগোনা করতে শুরু করেছিল। কিন্তু—

করলে কি হবে। স্পিরিচুয়্যালিমের দেশ ভারতে আমার আর থাকা হল না। যুদ্ধ শেষ হল। আমাকে ফিরে যেতে হল হোমে। এক্স-আর্মির লোক বলেই হয়ত বি. বি. সির ম্যানচেষ্টার সেণ্টারে বেতার প্রযোজক বা

রেডিও প্রডিউসারের খুব লোভনীয় চাকরিটা পেয়ে গেলাম। নতুন পরিবেশ আর নতুন ধরনের চাকরিতে প্রেততত্ত্বের চিন্তাগুলো যেন উবে গেল।

এসব ১৯৪৮ সালের একেবারে গোড়ার দিকের কথা।

সেসময় বি. বি. সির লাউ স্টুডিও ছিল উড হাউস লেনের এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রাক মিলন কেন্দ্রের অতি পুরোনো বাড়িতে। বাড়িটার চেহারা ছিল ঠিক ভজনালয় বা প্রার্থনাগৃহের মত দেখতে। তার দেওয়ালগুলোতে ঝুলকালিতে কালো ভুসো ভুসো রঙ্। প্রাচীনেরা বলে—ওসব ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবের ঝুলকালির চিহ্ন। কিন্তু—

থাক সেসব কথা। তখনো—সেই ১৯৪৮ সালেও বি. বি. সির স্টুডিতে আগের মতই সুখী পারিবারিক পরিবেশ ছিল। তাই সহকর্মীরা কেউ কারো উপাধি জানত না। কাজ চলে যেত শুধু নামে। যেমন—

অ্যালবার্ট। কে? স্টুডিও অ্যাটেণ্ডাণ্ট! ডিক এবং রেকস—ড্রামা প্রডিউসার, ফ্র্যাংক—প্রোগ্রাম ইঞ্জিনীয়ার; অ্যাণ্ডওয়্যার স্ক্রীপ্ট রাইটার, উইলফ্রেড-কুইজ ইত্যাদি। শুধু নামটুকু বললেই তার ডিপার্টমেণ্ট ঠিক করা যেত।

আমার চেম্বারটা ছিল প্রডিউসার বারান কোলনানের পাশের ঘরে। আর প্রডিউসারদের প্রত্যেকের চেম্বারই ছিল বিল্ডিংটার পিছন দিকে। প্রতিটি ঘরই ছিল যুদ্ধোত্তর ইংল্যাণ্ডের অস্থায়ী ঘরগুলোর মত কাঠের ওপরে প্লাস্টার করে খুব তাড়াতাড়ি তৈরি করা। কারণ তখন বি. বি. সির ব্রডকাস্টিং-এর খুব দ্রুত সম্প্রসারণ চলছিল। ফলে আমার চেম্বারের দুই পাশের দুই ঘর থেকেই স্পষ্ট প্রতিটি কথা শোনা যেত।

একদিন সকালে, বোধহয় সাড়ে নয়টা-টয়টা হবে। আমার চেম্বারে পা দিতেই পাশের ঘর থেকে কানে এল ভয়ানক উত্তেজিত আর বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর। মনে হল, কোন স্ত্রীলোকের কণ্ঠ। কেমন অদ্ভুত একটা আবেগে কাঁপা কাঁপা গলায় কথাগুলো বলছিল সে। ভাষাটা ইংরেজী। কিন্তু খুব জোরাল গলায় এক একটা শব্দের ওপরে খুব ঝোঁক দিয়ে বিদেশী কায়দায় উচ্চারণ করে অর্থাৎ ফরেন অ্যাকসেণ্টে বলে চলেছিল সে—

বারনি, তোমার ঘরে কে?—তুমি কি রেকর্ড করছ?

সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল মহিলার কণ্ঠ।

কে, ব্রেন বলছ? পাশের ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল বারনি।

আমি চমকে উঠলাম। আমার যুদ্ধকালীন নাম—ব্রেন। একমাত্র আমার স্ত্রী জানে। সে ও-ই নামেই ডাকে। কিন্তু সেই নাম—এরা জানল কি করে?

শুনছ, আমি বারনি বলছি, আমার চেম্বারে চলে এস। ভদ্রমহিলা কি বলছে শুনে যাও—আবার চেঁচিয়ে বলল বারনি।

এইবার বলা দরকার—বারনির ছিল একটা আশ্চর্য যন্ত্র—টি. ডি—৭

রেকর্ড প্লেয়ার অর্থাৎ টেপরেকর্ডার ডিস্ক। এখনকার এই টেপরেকর্ডিং চালু হওয়ার আগে বি. বি. সির রেকর্ডিস্টরা অ্যাসিটেলিন বা অ্যাসিড দিয়ে তৈরি চাকতির মত রেকর্ড কেটে কেটে খণ্ড খণ্ড করে বেতারের গান, বাজনা, কথিকা ইত্যাদি অনুষ্ঠান রেকর্ড করে রাখত।

আমি যে কণ্ঠস্বরটি শুনেছিলাম তার রেকর্ডটা তখনও রেকর্ড প্লেয়ারের স্পাইনে বোঁ বোঁ করে ঘুরছে।

এসেছ! বারান বলল, শোন এবার কী আশ্চর্য ব্যাপার, বলেই রেকর্ডের 'ওপরে' টোন আর্মটা বা পিন লাগানো স্বরযন্ত্রের হাতল বসিয়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন গম গম করে বেজে উঠল সেই গলা।

আশ্চর্য। সত্যিই বিচিত্র উত্তেজিত আর ক্রুদ্ধ সেই কণ্ঠস্বরের ভয়ংকর রোমাঞ্চকর সেই কথাগুলো—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—১৯৩৫ সালে ডাবলিনের সেই ভয়াবহ জোড়া খুনের সব কিছু—আদ্যোপান্ত—কারা কারা খুন হয়েছিল, কে তাদের অত্যন্ত নৃশংসভাবে খুন করেছিল, কেনই বা হত্যা করেছিল, কেমন করে অনুপম সুন্দর দুইটি তন্বী নারীদেহকে কেটে কেটে টুকরো টুকরো করে কশাইদের মত সুন্দর সাইজ করে স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা সানডে গ্র্যাফিকের কাগজে জড়িয়ে দূরে সীমান্তের এক সংকীর্ণ অন্ধকার গিরিপথে রেখে দিয়েছিল—সব—সব কিছু আমি জানি—

নিয়তির কাছে, ভবিতব্যের কাছে মানুষ কত অসহায় আগামীকাল কি হবে নয়, পরমুহূর্তে তার জীবনে কি ঘটবে—বলতে পারে না সে। তা নাহলে—

১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রে ঝির ঝির করে তুষারের বৃষ্টি ঝরছিল একটানা। ল্যাংকাস্টার শহরের আলোঝলমলে এক একটা বাড়ি বরফের সাদা চাদর গা জড়িয়ে অতিকায় প্রেতমূর্তির মত দাঁড়িয়েছিল। সেই রাত্রে—

সেই ভয়ানক দুর্যোগের হিম-ঝরা রাতে—থেমে গেল তার কথা। রেকর্ডের এক পিঠ শেষ হয়ে গেল।

ভদ্রমহিলা কে?

মিসেস হকলি। নামকরা স্পিরিচুয়্যালিস্ট—থেমে গেল বারান। তাকে কেমন অন্যমনস্ক মনে হল।

লক্ষ্য করেছিলাম, রেকর্ডটার একটা পিঠ চলেছিল ঠিক সাড়ে তিন মিনিট। কিন্তু কে এই মিসেস হকলি? স্পিরিচুয়্যালিস্ট তো—কিন্তু কোথায় বাড়ি—সোশ্যাল স্ট্যাটাস কি। আর বাহান্নবছর আগের ডাবলিনের সেই জোড়া খুনের সম্বন্ধে এত 'ডিটেলস' তিনি জানলেনই বা কি করে? অনেক-অনেক প্রশ্ন—অনেক কৌতুহলই মনের ভেতরে আনাগোনা করছিল। কিন্তু—

আমি কিছু বলার আগেই বারান রেকর্ডের আর একটা সাইড চালিয়ে

দিল। এবার শোনা গেল একটি পুরুষের খুব গম্ভীর আর কেমন করুণ গলার স্বর। মনে হল যেন একটা চাপা কান্নার আভাস আছে সেই কথাগুলোর আড়ালে—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—১৯৩৮ সালেই মিউনিক—মিউনিকে বসেই ব্রিটিশ বেনিয়ারা চেকোশ্লোভাকিয়াকে নাৎসী নেকড়েদের মুখে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করে। তারাই ওই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরাই জাপানকে মাঞ্চুরিয়া বিকিয়ে তার মর্যাদাকে পথের ঘাসে লুটিয়ে দিয়েছিল। আর ১৯৪৭ সালে তারা অবিসিনিয়াকে ছুঁড়ে দিল ইটালীয় শৃগালদের কাছে। এইবার তারা বেশ কোমর বেঁধে লেগেছে রুশীভল্লুকের থাবার সামনে চেকোশ্লোভিয়াকে এগিয়ে দিতে। হঠাৎ—

থেমে গেল। পজ। বিরতি। ক্ষণকালের বিরতির পরে কণ্ঠ যেন আরও উঁচু পর্দায় উঠল—আমি গোটা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের সমস্ত বড় বড় শক্তিগুলোকে সতর্ক করে দিয়ে বলছি যদি বৃটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র চেকোশ্লোভাকিয়াকে কমিউনিষ্ট দুনিয়ার কাছে বিকিয়ে দেওয়ারই ষড়যন্ত্র করে থাকে তাহলে আপনারা জানবেন অনিবার্যভাবে চেকোশ্লোভাকিয়া তার স্বাধীনতা হারাবে—

২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ সালে আমার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। চেকোশ্লোভাকিয়ার মাননীয় প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করলেন, কমিউনিষ্ট নেতা গটওয়াল্ডের নেতৃত্বে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান হয়েছে। তিনিই ফেব্রুয়ারীর শেষে সরকার গঠন করবেন। প্রকৃতপক্ষে তারই একনায়কত্বে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে—

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকার, বৃটেন এবং ফ্রান্স এক যুক্ত বিবৃতিতে কুপডিট্যাটের প্রচুর নিন্দা করে অভিযোগ জানাল—দেশের এক ভয়ঙ্কর সংকটজনক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কমিউনিষ্টরা শাসনক্ষমতা দখল করেছে।

এসবের আগে—১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে সকালে আমাকে অর্থাৎ ডক্টর জ্যান ম্যাসারিক চেকোশ্লোভাকিয়ার বিদেশমন্ত্রীকে বোমা ছুঁড়ে হত্যা করার একটা ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছিল। সেই সঙ্গে আরও দুইজন বিরোধী দলের মন্ত্রীকে নিহত করার চেষ্টা হয়েছিল। তারপর—

তারপর আর কি—আপনারা তো সবই জানেন—১০ই মার্চ চেকোশ্লোভাকিয়া গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেছিল সারা দেশে—বিদেশমন্ত্রী জ্যান ম্যাসারিক, চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রথম প্রেসিডেণ্টের পুত্র আজ খুব ভোরে সিজারিয়ান প্রাসাদের তিনতলায় তাঁর নিজের দপ্তরের ঘরের জানালা থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছেন—

সরকারী ঘোষণায় অবশ্য আরও বলা হয়েছে তার পিতৃভূমির পরাধীনতা এবং তার শোচনীয় পরিনামের লজ্জায় দুঃখেই নাকি স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জন করেছেন। অবশ্যই দীর্ঘ মেয়াদী অসুস্থতা এবং একটানা দীর্ঘ অনিদ্রাতে

স্নায়ুবৈকল্যের মুহূর্তেই এই শোচনীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের চেম্বারের জানালা থেকে জারিয়ান প্রাসাদের প্রাঙ্গণে লাফ দিয়েছিলেন। কিন্তু—

তার এই করুণ পরিণতির আগের দিনও তার মানসিক অসুস্থতার কোন লক্ষণই দেখা যায়নি। বরং তাকে যথারীতি অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং আশাবাদী-ই মনে হয়েছিল……সরকারী ইস্তাহারে-আরও কি সব ছিল এখন তা আর আমার মনে নেই!

আপনারা শুনলে নিশ্চয়ই হাসবেন, চেকোশ্লোভাকিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী গটওয়াল্ড আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় বলেছেন, আমাদের প্রিয় জ্যান ম্যাসারিক নাকি পশ্চিম ইউরোপের কমিউনিস্টদের সংগঠিত এক অভিযানে ভীত হয়ে আত্মহত্যা করেছেন, এই উক্তিটি আমার এবং আমাদের বন্ধুদের কাছে প্রচণ্ড আঘাত এবং গভীর বেদনাদায়ক ইত্যাদি অনেক-অনেক কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেছেন। থেমে গেল সেই গম্ভীর আর করুণ কণ্ঠস্বর। রেকর্ডটাও ঘুরতে ঘুরতে শেষ হয়ে গেল।

আমি রীতিমত ধাঁধায় পড়ে গেলাম। একদিকে ডাবলিনের জোড়া খুনের বীভৎস বিবরণ আর একদিকে ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন জটিল রাজনীতি।

ব্যাপারটা কি বল তো? তুমি এই রেকর্ড পেলে কোথায়?

আর বল কেন, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! আস্তে আস্তে বলেছিল বি. বি. সি-র প্রবীন প্রডিউসার বারনি অদ্ভুত এই রেকর্ডের বিচিত্র বৃত্তান্ত—

মিঃ ব্রীগস। তার বাল্যবন্ধু। সেও চাকরি করে রেডিওতে সে বি. বি. সি-র লিভারপুর সেণ্টারের রেকর্ড লাইব্রেরীর ইনচার্জ। ব্রীগস আবার স্পিরিচুয়্যালিজাম বা পরলোকচর্চায় খুব ইণ্টারেস্টেড! সে এই রেকর্ডটা তাকে দিয়ে বলেছিল—দেখ বহুদিন আগের রেকর্ড—জায়গায় জায়গায় ফেড হয়ে গিয়েছে—একটু থেমে আবার বলেছিল, তবুও যদি চালাতে পারিস—তাহলে অবাক হয়ে যাবি—

বেশ অবাক হতে হবে। কী আছে ওতে—সেসব ভেঙ্গে বলল না ব্রীগস। আর শোনার সময়ও ছিল না। রেকর্ডটা নিয়ে চলে এসেছিল, এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল বারনি। নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কি চিন্তা করে আবার যেন বহু—বহু দূর থেকে বলেছিল, আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি—মিসেস হকলি কী পাওয়ারফুল মিডিয়াম—তা নাহলে তার মত স্ট্যাটাসের মহিলার পক্ষে এত কথা বলা কখনোই—

মিসেস হকলি কি করেন?

কিছুই না। হয়ত হাউসওয়াইফ—

লেখাপড়া?

মনে হয় তেমন কিছু না। চোদ্দ বছর বয়সে স্কুল ছেড়েছিলেন। তারপরে আর পড়াশুনা করেন নি—

কি রকম বয়স ?

মাঝবয়সী—

তাহলে তো যুদ্ধোত্তর ইউরোপের এসব রাজনৈতিক ঘটনা তার বুঝতে পারার কথাই নয়—

কোন কথা বলল না বারনি। চিন্তার ছায়া নেমে এল তার চোখে। অস্ফুটস্বরে বলল, যদি সত্যিই চেকোশ্লোভাকিয়ার আত্মঘাতী বিদেশমন্ত্রী জ্যান ম্যাসারিকের স্পিরিটই তাকে প:জেস করে থাকে তাহলে সে সবই বলতে পারে—

যদি বলছ কেন ?

কেউ কেউ মনে করে ওটা ম্যাসারিকের গলার স্বরই নয়। কমিউনিষ্ট বিরোধীরা তাদের প্রপাগান্ডা করিয়েছে কাউকে দিয়ে। একটু থেমে আবার বলল, ইউরোপের বিখ্যাত মিডিয়াম মিসেস হকলিকে শুধু মাধ্যম হিসেবে ইউটিলাইজ করেছে—

বলছ কী! এ যে রীতিমত ফ্রড—

ফ্রড নয় হে—ফ্রড নয়—পরলোকতত্ত্বের কোন ব্যাপারেই এত চট করে কোন কনক্লুশান করা যায় না—থেমে গেল বারনি। আর চাপা হাসির আলোয় তার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমার মনে হল—মনে হল—বারনি যেন কি চেপে যাচ্ছে—

তোমার—তোমার কী মনে হয় বারনি, ম্যাসারিকের স্পিরিট কি ভর করেই নি ?

আগে মিসেস হকলির আর একটা রেকর্ড শোনো, গম্ভীর হয়ে বলল। আর রেকর্ডপ্লেয়ারে নতুন একটা ডিস্ক বসিয়ে তাতে টোন আর্ম ফিট করল—

হ্যাঁ। ১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রির কথা যা বলছিলাম। সেই তুষারঝরা তুহিনশীল দারুণ দুর্যোগের রাত্রে যে মহিলা দুইটি বৃষ্টি মাথায় করে নির্জন রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল। বহু—বহু মেহনত করে অনেক অনেক পরে জানতে পেরেছিলাম তাদের নাম—

ইসাবেলা ভ্যান অ্যাস।

মেরী রজারসন।

ইসাবেলা অসামান্য রূপসী। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে শাপভ্রষ্ঠা কোন অপসরী। তার সুন্দর সুডৌল মুখে বিষাদের ছায়া। চাপা কান্না যেন মনে হয়, থমকে আছে তার বড় বড় আর ডাগর দুটো নীল চোখে। সে কেন যেন ঘন ঘন খুব উৎসুক হয়ে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে। বরফের বৃষ্টি-ঝরা সেই রাত্রে জনমানবহীন রাস্তায় কাকে খুঁজছিল কে জানে ? হয়ত কারো আসার কথা ছিল।

আর একজন—

রজারসন। ইসাবেলার মত সুন্দরী নয়। বয়সেও একটু বড়। কিন্তু

সুন্দর স্বাস্থ্য আর যৌবনের জেল্লায় যেন চাপা পড়ে গিয়েছে বয়সের ভার।

সে ইসাবেলার নার্সমেড। এটা তার বাইরের পরিচয়। আসলে ইসাবেলার ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধু। পরামর্শদাতা। এবং সময় সময় পরিচালিকাও বটে।

কৈ রজারসন কাউকেই তো দেখছি না—

ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ঠিক আসবে—

—হ্যাঁ, আসাই তো উচিত, নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে যেন আস্তে আস্তে বলল ইসাবেলা ওরা তো জানে—আমি জীবনের একটা ভাইটাল টার্নিং পয়েন্টে এসে দাঁড়িয়েছি—আমি—তীব্র আবেগে রুদ্ধ হয়ে এল তার গলার স্বর। আর বুকের ভেতরটা তীব্র যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠল। চোখ ফেটে জল এসে পড়ল।

—ওই তো—ওই তো আসছে! বলে উঠল রজারসন। ইসাবেলা দেখল, তুষারের বৃষ্টি আর কুয়াশার নিরেট পাঁচিল বিদীর্ণ করে যেন একটা রক্তের বিন্দু দ্রুত এগিয়ে আসছে। তাদেরই বাড়ির গাড়ির আলো।

কলকল করা হাসিতে চারিদিক মুখর করে গাড়ি থেকে নেমে-এল তার দুই ছোট বোন—ডোরা আর লিজা!

কি রে দিদি, বাড়িতে গেলি না যে রাস্তায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলি—মা খুব দুঃখ করছিল—

মা কী জানে না। আমি কত সুখে আছি, ইসাবেলার চোখদুটো ধক করে উঠল।

কি যে তোদের ব্যাপার দিদি, তোরাই জানিস। ডোরা মাথা নিচু করে বলল, এই দেখতাম, মিঃ রাকসটন তোকে দুদণ্ড না দেখলে অস্থির হয়ে উঠত—

ওই স্কাউন্ড্রেলটার নাম আমার কাছে করিস না ডোরা, মর্মভেদী একটা চিৎকারে চারিদিক শিউরে দিয়ে ইসাবেলা গলা একটু নিচু করে বলল, তোদের ব্রাদার-ইন-ল আর সেই মানুষ নেই রে ডোরা—থেমে গেল সে। ভেতরে ভেতরে অসহ্য আর তীব্র একটা যন্ত্রণায় যেন পুড়ে যেতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত পরে যেন একটা অস্ফুট আর্তনাদের মত করে বলল, এখন আমার জীবন অতিষ্ঠ করে দিয়েছে—থেমে গেল সে। আবার ভেতরে ভেতরে যেন আরও শক্তি সঞ্চয় করে নিজের মনেই বলল, আমি আজই একটা হেস্তনেস্ত করব—

দিদি তোরা কি কথাই বলবি—না, ব্ল্যাকপুলে যাবি?

হ্যাঁ—হ্যাঁ, দিদি, লিজার কথায় সেই অস্বস্তিকর আর পীড়াদায়ক প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে বলে উঠল ডোরা, চল না দিদি ব্ল্যাকপুলে মেলা বসেছে—আলো দিয়ে সুন্দর সাজিয়েছে—যাবি?

চল, বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইসাবেলা বলল, কে জানে আর তোদের সঙ্গে দেখা হবে কিনা?

এডিনবরা শহরের উত্তরপ্রান্তে এক শান্ত জনপদ ব্ল্যাকপুল। যে ব্ল্যাকপুল

অন্যান্যদিন ঘন অন্ধকারে জবুথবু হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে, আজ সেই ব্ল্যাকপুল আলোর মালা পরে রূপসী সেজেছে।

বিরাট একটা খোলামাঠে মেলা বসেছে। জোরালো গ্যাসে সারি সারি দোকানে রকমারি পণ্যসম্ভার ঝলমল করছে। আর প্রত্যেকটা দোকানের সামনে গিজ গিজ করছে মানুষ আর মানুষ। সেই জমাট ভিড়ের ভেতরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আর চোখদুটো সরু করে কি যেন খুঁজতে লাগল ইসাবেলা। তার ক্রমশত্রু হয়ত এখানেও তার পিছু নিয়েছে।

চল-চল দিদি এগিয়ে চল—ডোরা তাকে ঠেলে দিল। আর সেও ভিড়ের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে সামনে এগিয়ে গেল।

কত রকমের দোকান। কত রকমের পণ্য। কত বিচিত্র মানুষ। একটা জায়গায় এসে যেন ইসাবেলার পাদুটো আটকে গেল—কয়েকজন জিপসী ওপরে রঙ্গীন চাঁদোয়া খাটিয়ে দোকান দিয়েছে। তাদের ভেতরে একজন ভাল্লুকের খেলা দেখাচ্ছে। আর একজন মুখে একটা চোঙ্গা দিয়ে সমানে চিৎকার করছে—আসুন—চলে—আসুন আমার কাছে বশীকরণের এমন অব্যর্থ ওষুধ আছে, যা খেলে নির্ঘাত আপনার স্বামী বা ফিঁয়াসে একেবারে আপনার পায়ের কাছে পড়ে থাকবে—

ইসাবেলার বুকের ভেতরটা মুহূর্তের জন্য দুলে উঠল। মনের আয়নায় ভেসে উঠল রাকসটনের মুখখানা। কেন—কেন যে ও এরকম হয়ে গেল। নিয়ে যাবে নাকি এই ওষুধ? ভাবতে ভাবতেই লোকটার দিকে গুটি গুটি এগিয়ে গেল সে। দেখল, একটা সিন্দুর লাগানো করোটি কঙ্কাল, কালো প্যাঁচার চামড়া, গোক্ষুর সাপের খোলস আরও সব অদ্ভুত প্রাচ্যদেশীয় জীবজন্তুর হাড়পাঁজরা সাজিয়ে রেখে লোকটা তারস্বরে প্রচার করছে—

দিদি—ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস? ডোরা পিছন থেকে ডেকে বলল, এগারটা বেজে গেল যে—

এখন বাড়ি না ফিরলে মা ভয়ানক চিন্তা করবে—লিজা ব্যস্ত হয়ে উঠল।

হ্যাঁ—হ্যাঁ—তোরা চলে যা, কেমন উদাসীন আর নিস্পৃহ শোনালো ইসাবেলার কথাগুলো।

দিদি, তুই মার সঙ্গে দেখা করতে যাবি না?

না। আমাকে এক্ষুনি ল্যাংকাস্টারে ফিরে যেতেই হবে--

এখুনি! এত রাত্রে?

কোন উপায় নেই রে ডোরা, হঠাৎ থেমে গেল ইসাবেলা। কয়েকটা ঢোক গিলে বুকের ভেতর থেকে ঠেলে ওঠা ব্যথাটাকে সামলে নিয়ে ঝাপসা গলায় বলল, তোদের সঙ্গে শুধু দেখা করতেই এসেছিলাম রে, আবার থেমে গেল। কয়েকমুহূর্ত পরে অস্ফুটস্বরে বলল—কে জানে তোদের সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবে কি না—তার কথাগুলো কেমন কাতর কান্নার মত শোনালো।

মাথা নিচু করে গাড়িতে উঠল ইসাবেলা। গাড়ি স্টার্ট দিল।

গুড বাই দিদি—গু—ড—বা—ই—উত্তুরে হা হা বাতাসের অশ্রান্ত আর্তনাদে কোথা তলিয়ে গেল ডোরার কথাগুলো!

গুড বাই! ইসাবেলার অস্ফুট কথাটা যেন ঝুপ করে ডুবে গেল তুষারের ঝড়ের একটানা শব্দের ভেতরে।

উজ্জ্বল রক্ত আলোর নিশানা জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গেল গাড়ি। তাদের মনে হল—মনে হল ইসাবেলা যেন বরফের বৃষ্টি-ঝড় আর কুয়াশার সেই নীরন্ধ্র অন্ধকারের দেশে চিরকালের মতই হারিয়ে গেল।

গাড়ি চলছে। চলছে বরফের বৃষ্টি আর ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

—ভেবে দেখ, তুই ঠিক ডিসিশন নিচ্ছিস কি না?

—অনেক—অনেক দিন অনেকবার ভেবেছি রজারসন, ফুঁসে উঠল ইসাবেলা। স্টিয়ারিং-এ চোখ রেখে বলল ইসাবেলা, পদে পদে আমাকে সন্দেহ করবে। যেখানে যখন যাব সেইখানেই আমার পিছু নেবে—একী! থেমে গেল সে। নিষ্ঠুর যন্ত্রণার পীড়নে তার মুখখানা কুৎসিত হয়ে উঠল। মাথার ভেতরে পাক দিয়ে ওঠা নিদারুণ জ্বালাকে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে সহ্য করতে করতে বলল আবার, আমি—আমি তো একটা মানুষ—

রজারসন কোন কথাই বলল না।

গাড়ি চলতে লাগল।

হ্যাঁ। যা হয়—যা হয়ে থাকে। রীতিমত পুরো একটা বছর প্রেম করে কোর্টশিপ করেই তাকে বিয়ে করেছিল রাকসটন। ডক্টর বাক রাকসটন কিন্তু তার আসল নাম বক্তিয়ার রুস্তমজী হাকিম। স্কটল্যাণ্ডে এসে বক্তিয়ার হয়েছিল বাক, আর রুস্তমজী হয়েছিল রাকসটন।

অতি সুদর্শন এই পারশী যুবকের চারিদিকে মেয়েরা খুব ঘুর ঘুর করত। এমনিতেই এ দেশে মেয়েদের প্রাচ্যের পুরুষদের প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ থাকেই। আর বিশেষ করে রুস্তমের দিকে চোখ পড়ার অনেক কারণই ছিল—ইস্পাহানের প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক কোন এক জমিদারের একমাত্র ছেলে নাকি রূপবান। অসাধারণ সেই রূপ। তার ওপর আবার ব্রিলিয়্যাণ্ট স্টুডেণ্ট। বোম্বাই মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস-এ ফার্স্ট হয়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ডি.করতে এসেছে।

আরও পাঁচটা মেয়ের মত সেও তার প্রেমে পড়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অনেক-অনেক ডাকসাইটে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে জোর কমপিটিশন করে সে জয়ী হয়েছিল। আর সফল যুদ্ধের নায়িকার মত দৃপ্তভঙ্গীতে রাকসটনের হাত ধরে ঘর বেঁধেছিল। তার—

সুখের ঘর। ভালবাসার ঘর। কিন্তু বিধাতা যে অলক্ষ্যে সেই ঘরে অভিশাপের বিষ ঢালার চক্রান্ত করছেন, সেটা সে কল্পনাও করতে পারেনি!

আর করবেই বা কি করে—কেন করবে ? তখন যে রাকসটনের প্রেমে ভালবাসা আনন্দ টলোমেলো জীবন শরতের মেঘের মত উড়ে চলেছে।

দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গিয়েছিল। তাই হয়। সুখস্বপ্নের কাল দ্রুতই ফুরিয়ে যায়! রুস্তমজী বা রাকসটনের অসম্ভব সেই রূপই হয়েছিল কাল। তার সঙ্গে বিয়ের পরও মেয়েরা যেমন তার আশেপাশে ঘুর ঘুর, তেমন রাকসটনও তাদের পিছু পিছু ছোঁক ছোঁক করে বেড়াত। তাকে কেমন বেহায়ার মত মনে হত! তার খুব খারাপ লাগত।

এই ব্যাপারে একদিন বলতেই হঠাৎ রুখে উঠল। যা মুখে আসে তাই বলে শেষে তাকে শাসিয়ে বলেছিল জানো তো আমরা পারশী। ঘরে দুই তিন কি চারটি বিবি থাকা কিছুই না—

ওর প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য দেখে সে, সে-ই প্রথম আভাস পেয়েছিল ঝড় আসছে। তারপরেই ঘটনার চাকা ঘুরতে লাগল অত্যন্ত—অত্যন্ত দ্রুত—

তার সঙ্গে বিয়ের খবর পেয়েই তার বাবা পয়সাকড়ি পাঠানো বন্ধ করে দিল। এদিকে রাকসটন মেয়েদের পিছনে দেদার টাকা উড়িয়ে চলল, ড্রিংকের মাত্রা বেড়ে গেল। তার সব খরচ জুগিয়ে চলে সে। সে একটা ডাচ কোম্পানীর এক্সিকিউটিভ। মোটা মাইনে পায়। এডিনবরার উপকণ্ঠে ব্ল্যাকপুলে তার বাবারও আছে এগ্রিকালচ্যারাল ফার্ম। অতএব পতিদেবতাকে তুষ্ট করতে তার খুব একটা কষ্ট হতো না।

তবে ও যে একটা দারুণ সর্বনাশের দিকে চলেছে, সেই ভেবে মনে খুব কষ্ট পেত। কষ্ট তো হবেই। এটা যে তার তিননম্বর সংসার। সেই উথাল পাথাল বিশ বাইশ বছর বয়সে প্রথম যার গলায় মালা দিয়েছিল তার আয়ু ছিল কম। দ্বিতীয় বিয়েটাও বেশিদিন ধোপে টিকল না। সে ছিল জার্মান! বন্ড গোঁয়ার, একগুঁয়ে। আর অসম্ভব জুলুম-জবরদস্তি করত। অবশ্য এই ব্যাপারটাতে পৃথিবীর সব জাতের সব পুরুষই এক। জার্মান যুবক অটোর সঙ্গে পারশী তরুণ রুস্তমের নেই এতটুকু পার্থক্য।

প্রচণ্ড জুলুম আর অকথ্য অত্যাচার শুরু করল রুস্তমও। প্রায়ই চোখ রাঙিয়ে বলত, তোমার বাবার কাছ থেকে টাকা এনে দাও—

প্রথম প্রথম ওকে খুশি করার জন্যই তার ব্যাংক আকাউন্ট থেকে টাকা তুলে এনে দিত। আর সে টাকা মেয়েদের পিছনে উড়িয়ে মদ খেয়ে তিনদিনে ফৌত করে দিত। আবার এসে বলত দাও টাকা।

সে কিন্তু তখন একটা কাজ করেছিল। করেছিল অনেক ভেবে। কিন্তু এখন মনে হয়—মনে হয় প্রকাণ্ড ভুলই করেছিল—

ভুল!

শোন, ইসাবেলা, তুই আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ না—ওকে ফেরাতে পারিস কিনা।

রজারসনের কথা শেষ হতে না হতে উল্টো দিক থেকে আসা একটা গাড়ির

হেডলাইটের জোরালো আলো গঁড়ি গঁড়ি তুষারের বৃষ্টি আর জমাট কুয়াশার বুক চিরে এসে পড়ল ইসাবেলার মুখে। তার চোখদুটো ধাঁধিয়ে গেল।

বলিস কিরে রজারসন, চোখদুটো মুছে নিয়ে শক্ত করে স্টিয়ারিং চেপে ধরে বলল ইসাবেলা, তুই অষ্টপ্রহর আমার সঙ্গে থাকিস—চোখে দেখিস না—ওকে ফেরানোর কত চেষ্টাই না করেছি গত তিনবছর ধরে—একটু থেমে আবার ভারি একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, ওকে খুশি করার জন্য যখন যা চেয়েছে দিয়েছি—

—দেখেছি তো—সবই দেখেছি। তবুও বলছি, ঝাপসা গলায় থেমে থেমে যেন বহু—বহু দূর থেকে বলল রজারসন—তিন তিনবার সংসার করলি, কিন্তু সুখী হতে পারলি না—

সুখ! হুঁ—বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল ইসাবেলা, সুখ আমার কপালে নেই রে—

গাড়ি চলছে।

বৃষ্টি আর বাতাসের মাতামাতি বাড়ছে।

—তুই কি কাউন্টিকোর্টে ডিভোর্সের পিটিশন করে দিয়েছিস?

—হ্যাঁ। কিন্তু মনে হয়, হবে না—

—কেন?

—শুনছি ওই রাসকেলটা নাকি পাল্টা পিটিশন করেছে, আমার কথাগুলো মিথ্যে বলে—

—সে কী! তোকে তাহলে ছাড়তে চায় না বল?

খুক খুক করে হেসে উঠল ইসাবেলা। কেমন করুণ একটা কান্নায় ভরা সেই হাসি। অস্পষ্ট গলায় বলল, না—না—আমাকে কাছে রেখে যন্ত্রণা দিয়ে তিলে তিলে মারবে—এটাই যে ওদের দেশের ট্র্যাডিশন—

আশ্চর্য! মেরী রজারসনের অস্ফুট কথাটা ঝড়ো বাতাসের শব্দের ভেতরে ডুবে গেল।

আর কেউ কোন কথা বলল না।

ঝড়ো বাতাসের উজান ঠেলে ঠেলে গাড়ি চলতে লাগল। থেকে থেকে চাকা স্লিপ করছে। দুহাতে শক্ত করে স্টিয়ারিং চেপে ধরল ইসাবেলা।

হ্যাঁ। মস্ত বড় ভুল সে করেছিল। ডাচ কোম্পানীর এই চাকরিটাতে আসার আগে সে ছিল ক্রিশ্চয়ান সোসাইটির সলভেশান ইউনিটে। তাদের কাজই হল, পাপের অন্ধকারে ডুবতে বসেছে যে মানুষ—তার ভেতরে মনুষ্যত্ব জাগিয়ে দিয়ে তাকে সুস্থ জীবনের আলোয় ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

কত দুর্বৃত্ত, কত সমাজবিরোধীকে যে সে সৎপথে নিয়ে এসেছিল। আনতে পেরেছিল। পারল না সে শুধু তার স্বামীর বেলায়। অথচ যখন যা চেয়েছে তাই করেছে সে। তারও কেমন একটা রোখ চেপে গিয়েছিল—ওকে ফিরিয়ে সে আনবেই—আনবে। কিন্তু—

তার ভালো মানুষীকেও দুর্বলতা মনে করল। আরো বেশি উদ্দাম হয়ে

উঠল—আরো অত্যাচার বেশি করে করতে লাগল—

হ্যাঁ—তোর সেই ওমান আলি কি করলেন ?

উনি আর কি করবেন বল, একটু থেমে আবার বলল ইসাবেলা, বেচারী বড় ভালো মানুষ ! দুইবেলাই দোস্তকে পাখি পড়ার মত করে বোঝাচ্ছে । কিন্তু তার কোন পরিবর্তনই নেই—

কোন কথা বলল না রজারসন !

শুধু বুকের ওপরে মাথা গুঁজে বসে রইল চুপ করে ।

ওমান আলি । পারশী । তার বাড়িও তেহরানে । তিনিও রুস্তমের মতই ডাক্তারী পড়তে এসেছেন এদেশে । রুস্তমের ছেলেবেলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু । তাই সে রুস্তমের ব্যাপারে ওমানের সাহায্য চেয়েছিল । ওমান খুব চেষ্টা করেছে বন্ধুকে ফেরাতে । সে যাই হোক রুস্তমকে উপলক্ষ করেই ওমানের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতাও হয়ে গিয়েছে । আর সে-ই হয়েছে কাল ! রুস্তম তাকে রীতিমত সন্দেহ করছে । নির্গুণ মানুষের যা হয়—প্রায়ই তাকে শাসাচ্ছে—ফের যদি তোমাকে ওমানের সঙ্গে কথা বলতে দেখি, তাহলে তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলব—

আলিসাহেবকে নিয়ে তো খুবই মুস্কিলে পড়েছি রে রজারসন ।

ওঃ তোকে সন্দেহ করছে তো রুস্তম ।

যেখানে যাচ্ছি—ছায়ার মত পিছু নিচ্ছে—যখন তখন খুন করব বলে শাসাচ্ছে—নিদারুণ যন্ত্রণায় তার মুখখানা কুৎসিত হয়ে উঠল প্রায় অস্পষ্ট গলায় অসহায় মানুষের মত বলল, কি করি—করি কি বল তো রজারসন ? পুলিশে একটা ডায়েরী করে রাখা বোধহয় ভালো—

হঠাৎ পিছন থেকে একটা গাড়ির হেডলাইটের তীব্র আলোর ঝলক আছড়ে পড়ল ইসাবেলার গাড়ির জানলার কাঁচের স্ক্রীনে !

রজারসন মাথা ঘুরিয়ে দেখল গাড়িটাকে । কেন যেন ঝড়ের গতিতে আসছে গাড়িটা ।

—আমার মনে হয়, আমাদের কেউ ফলো করছে !

ইসাবেলা যেন তার কথা শুনতেই পেল না ।

—রাকসটন কোথায় জানিস ?

—কেন যে তুই বার বার ওর কথা বলিস । ঝাঁঝিয়ে উঠল ইসাবেলা । বলল, নাম্বার ওয়ান ডিবচ একটা । ওর থাকা না থাকার ঠিক আছে কিছু । ঘৃণায় মুখখানা দড়ির মত পাকিয়ে উঠল । থেমে থেমে বলল, দেখ গিয়ে হয়ত কোন গার্লফ্রেন্ডকে বিছানায় নিয়ে মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে—বলে যেন মনের জ্বালাতেই অ্যাকসেলেটারে পা দিয়ে বাড়িয়ে দিল গাড়ির স্পীড । পিছনের গাড়িটাও যেন তাড়া করে আসতে লাগল । দুর্যোগের সেই নিশিরাত্রে একটানা তুষারবৃষ্টি আর ঝড় মাথায় করে কোন একটা হিংস্র দৈত্য যেন তীব্র আক্রোশে ছুটে আসছে ইসাবেলাকে গ্রাস করতে ।

সামনে পড়ল বাঁক।

পাহাড়ি পথ। তাতে আবার চড়াই।

তাই গাড়ির স্পীড কমাতেই হল। আর যেই গতি কমে এল অমনি ঝড়ের বেগে পাশ কাটিয়ে পিছনের গাড়িটা ইসাবেলার গাড়ির সামনে এসে ব্রেক কষল—ক্যাঁচ,—ক্যাঁচ—

কড়্-কড়্-কড়াৎ—দূরে কোথায় বাজ পড়ল। ঝলসে উঠল বিদ্যুত আর উগ্র সাদা আলোয় অপ্রত্যক্ষ থাকল না কিছুই—কট্—রেকর্ড শেষ হয়ে গেল।

নিস্তব্ধতায় থম থম করতে লাগল ব্রীগসের চেম্বারটা।

তারপরে ?

মিসেস হকলির আর কোন রেকর্ড আমার কাছে নেই। শান্ত নির্বিকার গলায় বলল বারনি।

তাহলে সেই ঝড়ের রাত্রে কে ইসাবেলাদের পিছু নিয়েছিল ; ওই দুই মহিলাকে খুনই করা হয়েছিল কোথায়—এসব জানব কি করে ?

বারনি কোন কথা বলল না কিন্তু তাকে দেখে মনে হল, কি যেন ভাবছে। ওর মনের ভেতরে নাড়াচাড়া চলছে—

কি চুপ করে আছ কেন বারনি, বেশ চড়া গলায় বললাম—তুমি আমাকে ডেকে এইটুকু না শোনালেই পারতে—এখন যন্ত্রণায়—

তুমি স্পিরিচুয়্যালিজমে ইণ্টারেস্টেড ? আমার মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে প্রশ্ন করল বারনি।

কেন, বল তো ? আশ্চর্য হয়ে বললাম। একটু ভেবে আবার বললাম—যদি বলি টু মাচ ইণ্টারেস্টেড—

তাহলে আজ সন্ধ্যায় কোন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রেখ না, গম্ভীর হয়ে খুব অন্যমনস্কভাবে বলল বারনি, আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে—সেখানে গেলেই জানতে পারবে সব—

এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিলেন ব্রেন ব্র্যানস্টান।

অরিন্দমবাবু মনে রাখবেন, মিসেস হকলি কিন্তু কোন কাল্পনিক নাম নয়। এই শতকের বর্তমান বিশের দশকের ইউরোপের সবচেয়ে বড় স্পিরিচুয়্যালিস্ট। দস্তুরমত একটা হিস্টোরিক্যাল ফিগার।

এখানে ম্যাসারিকের প্রসঙ্গ তথা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন পশ্চিম ইউরোপের যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বলেছিলেন মিসেস হকলি সেটা বেশ বুঝতে পারা যায়, কেস অফ পজেশান! ম্যাসারিকের-ই স্পিরিট ভর করেছিল। কিন্তু—

ইসাবেলা আর রুস্তমের কেসটা কিন্তু কখনোই পরকায়া প্রবেশ নয় বা ভূতে ভর করা নয়। কেন ?

একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন এখানে মিসেস হকলি নিজেই বেশ গুছিয়ে বলে চলেছেন। গলার স্বরটাও তারই। অন্য কোন স্পিরিটের কণ্ঠে কথা

বলছেন না। কিন্তু ডাবলিনের সেই জোড়া খুনের ঘটনা এত ডিটেলস জানলেন কি করে?

বাদ বাকীটুকু শুনুন—তাহলেই বুঝতে পারবেন পরলোকতত্ত্বে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

সন্ধ্যায় ব্র্যানস্টান চলে এসেছিল বারনির বাড়িতে।

কোন ভূমিকা না করে কোন ভালমন্দ বা কুশল প্রশ্ন না করে কেমন উত্তেজিত হয়ে বলল ব্র্যানস্টান, তুমি যেখানে নিয়ে যাচ্ছ, সেখানে গেলেই আমি ইসাবেলার এপিসডটার সবটুকু জানতে পারব তো?

ডোণ্ট বি একসাইটেড ব্রাদার হাত তুলে থামতে ইঙ্গিত করে বারনি বলল, রেকর্ড নয় খোদ মিসেস হর্কলির মুখেই বাদবাকী জানতে পারবে—

বলছ কী! উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠল ব্র্যানস্টান, মিসেস হর্কলি কী এখন লণ্ডনে?

হ্যাঁ—ব্রীগসের মানে আমার সেই লিভারপুল বি.বি.সি-র বন্ধুর বাড়িতে উঠেছেন—একটু থেমে আবার বলল ব্রীগস। আজই সিয়ান্সে অর্থাৎ প্রেতচক্রে বসার কথা আছে—

ব্রীগসের বাড়ির বড় হলঘরে আসর বসেছে। প্রেতচক্রের আসর।

ঘরের ঠিক মাঝখানে ঘোড়ার খুরের আকৃতির একটা বিশাল টেবিল। তার দুইদিকে পরকালতত্ত্বে হয়ত ইণ্টারেস্টেড কয়েকজন প্রবীণ ভদ্রলোক বসে রয়েছেন। আর টেবিলের সেই খোলা দিকটায় পিছনে হেলান দেওয়ার জন্য কাঠের উঁচু স্ট্যাণ্ড লাগানো কুশনের গদি আঁটা চেয়ারে বসে আছেন এক মাঝবয়সী মহিলা। আসরের মধ্যমণি। মিসেস হর্কলি!

আশ্চর্য! অধ্যাত্মবাদীদের মত সেই সুন্দর, অপার্থিব এবং সৌম্য, উদার কোন ভাবই নেই তার চেহারায়। বরং খুব মজবুত গড়নের বেঁটে-খাটো মহিলা। কেমন স্থূল আর ঘোরতর সাংসারিক রমণী মূর্তি।

তিনি পা-দুটো ঝুলিয়েই চেয়ারে বসেছেন; কিন্তু কেন যেন শক্ত করে পা-দুটো মাটিতে চেপে রয়েছেন। তাহলে কি চেয়ার থেকে আচমকা পড়ে যেতে পারেন ভয়েই ওইভাবে বসেছেন?

দর্শকরা উৎসুক আর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কখন—কখন আরম্ভ হবে সিয়ান্স—কখন পরলোক থেকে ভেসে ভেসে আসবে স্পিরিট। কথা বলবে। কে জানে কত আশ্চর্য কথাই হয়ত জানা যাবে—

তীব্র উত্তেজনায় কারো হাঁটু থরথর করে কাঁপছে; কারো বা বুকের ভেতরটা গুরু-গুরু করছে। আবার কারো বা দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে—

টক্—টক্—টক্। জুতোর হিল দিয়ে মেঝেতে তিনবার আওয়াজ করলেন হর্কলি। সঙ্গে সঙ্গে জোরালো আলো নিভে গেল। জ্বলে উঠল মৃদু নিভু

নিভু—আলো। মুহূর্তে গা ছমছম করা একটা ভুতুড়ে পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল। মিসেস হর্কালি, স্যাল আই স্টার্ট রেকর্ডিং? হর্কালির কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল ব্রীগস।

নো—নট নাউ! বেশ বিরক্ত হয়ে উঠলেন মিসেস হর্কালি। চাপা গলায় বলল, এসময়ে কেন যে আমাকে ডিসটার্ব করেন, বলেই কেন যেন রাস্তার দিকের খোলা জানলাটার দিকে বার বার কি দেখতে লাগলেন।

গরমকাল। শুধু রাস্তার দিকের নয়, ঘরের সবগুলো জানলাই হাট করে খোলা। কে জানে কোন জানলা দিয়ে কার প্রেতাত্মা এসে হাজির হবে। ভূত প্রেতের সঙ্গে ওঠাবসা। মায়াবিনী মেয়েমানুষ বাবা। এদের অসাধ্য কোন কাজ নেই। অজানিত ভয়ে দর্শকদের প্রত্যেকের বুকের ভেতরে ধুকপুক করছে—

খট্—হঠাৎ একটা শব্দ হল নিস্তব্ধ সেই ঘরে। আর যা ভাবা গিয়েছিল, তাই হল। রাস্তার দিকের জানলা দিয়ে ধপ করে লাফিয়ে পড়ল মেঝেতে একটা বেশ মোটাসোটা কালো বিড়াল। আর ঘরভর্তি লোক দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মুহূর্তের জন্য। তারপরেই হেলেদুলে বেশ রাজেন্দ্রাণীর মত হেঁটে হেঁটে সোজা গেল মিসেস হর্কালির কাছে। আর তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে তার কোলে বসে পড়ল।

বিড়ালের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতেই আবার বাইরের দিকের জানলায় তাকিয়ে কাকে যেন ইসারা করল হাত নেড়ে। আর চাপা গলায় গর্জন করে বলল, নো—নো ডক্টর জিমি—নট—নাউ—একটু থেমে আবার বলল, মাই নাম্বার ওয়ান অ্যাসিস্ট্যাণ্ট লিলিবেট হ্যাজ অলরেডি কাম—

দর্শকরা হতভম্ব।

তাদের মনে হল, তারা যেন একটা ধাঁধাঁর ভেতর দিয়ে চলেছে। কি যে হচ্ছে আর কি-ই বা ঘটবে, কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না—

কট্—কট্—কট্ আবার জুতোর হিল দিয়ে ঠুকে ঠুকে তিনবার আওয়াজ করলেন মিসেস হর্কালি। আর ব্রীগসের দিকে ইঙ্গিত করেই চেঁচিয়ে বললেন, স্টার্ট—রেকর্ডিং—

কির্-কির্-কির্—ব্রীগসের রেকর্ডিং মেশিন চলতে লাগল। কোন কিছু ঘোষণা করার মত গলা চড়িয়ে বললেন হর্কালি, বলুন কে কি শুনতে চান বা জানতে চান—বলুন এনি অড কোশ্চেন—

আপনি শুধু এডিনবরার সেই ডবল মার্ডারের ব্যাপারটা বলুন—

কেন, আমার রেকর্ড শোনেন নি।

—মাত্র একটা পিঠের রেকর্ড শুনেছি ম্যাডাম, ব্র্যানস্টান উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত ভাবে বলল, সেই দুর্যোগের রাত্রে ইসাবেলার গাড়িকে ফলো করে আর একটা গাড়ি এসে তাকে ব্লক করে দাঁড়াল—

ও হ্যাঁ! তারপর—হঠাৎ যেন আচমকা থেমে গেলেন হর্কালি। আর

চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠল কেমন গভীর। আর সেই দূরকালের দূরদেশের ঘটনার ছায়াও যেন তার চোখে ভেসে উঠল। আর মনে হল, একটু একটু করে কেমন একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নতার ভেতরে তলিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

এই মহিলার ভাবসাব দেখে বিদ্যুৎ চমকের মত ব্র্যানস্টানের মনের ভেতরে ভেসে উঠল, মাদ্রাজের হোটেলের সেই যুবক শিখ অ্যাস্ট্রলজার এবং স্পিরিচুয়্যালিস্ট! সে-ও কিন্তু মাথা নিচু করে যেন কিসের ধ্যান করত। হয়ত এমনি করেই ওরা আদার ওয়ার্ল্ডের স্পিরিটদের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

শুনুন, সেই যে ইসাবেলাদের পিছু পিছু ঝড়ের বেগে যে গাড়িটা এসেছিল, হর্কালি বলতে শুরু করল, ওটা রাকসটনের-ই গাড়ি—কথাগুলো বলছে দূরে ঘরের সাদা ধবধবে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে। যেন ওইখানে—ঐ দেওয়ালেই অদৃশ্য কালিতে লেখা আছে এডিনবরার সেই ঐতিহাসিক ডবল মার্ডারের ইতিবৃত্ত।

ইসাবেলাকে শুধু বলেছিল রাকসটন—আবার বলতে আরম্ভ করল হর্কালি, হঠাৎ তোমার গাড়ি দেখলাম—ভাবলাম, চল একসঙ্গে যাওয়া যাক্—একটু থেমে আবার বলেছিল, ইসাবেলা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। বেশ ভালো ছেলের মত লক্ষ্মী ছেলের মত সস্ত্রীক তাদের ল্যাঙ্কাস্টারের বাড়িতে এসেছিল—

তাহলে ওদের রাকসটন খুন করেছিল কোথায়?

ধক্ করে জ্বলে উঠল মিসেস হর্কালির রক্তাভ চোখদুটো। ডান হাত দিয়ে মুখটাকে আড়াল করে চাপা গলায় চিৎকার করে ডাকল—ডক্টর জি—মি—দে আর ডিসটার্বিং মি টু মাচ—

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল দর্শকদের। ডক্টর জিমি নামে কোন প্রেতাত্মাকে ডেকে হয়ত কোন অনর্থ বাধিয়ে বসবে।

কিন্তু—না। কোন ছায়াদেহকে দেখা গেল না। আর অশরীরিদের অগ্রদূত সেই এলোপাথাড়ি দমকা হাওয়ার ঝাপটাও আছড়ে পড়ল না। গম্ভীর হয়ে ঘোষণা করলেন হর্কালি, আমার কনসেন্স—স্পিরিট, ডক্টর জিমি আমাকে ইনস্ট্রাকশান দিয়েছিলেন, এডিনবরার ডবল মার্ডারের ঘটনা সংক্ষেপে বলতে। একটু থেমে আবার সতর্ক করে দিয়ে বললেন, অনুগ্রহ করে আমার কথার মাঝখানে ইনটারাপড করবেন না—

মিসেস হর্কালি কখনো তার বিবেকরূপী অশরীরি আত্মা—ডক্টর জিমির সঙ্গে পরামর্শ করে আবার কখনো বা তার সহকারী স্পিরিট কালো বিড়ালের কানে কানে কিছু বলে, কখনো হাত নেড়ে উত্তেজিত হয়ে, কখনো গলা খাদে নামিয়ে নানা অঙ্গভঙ্গী করে বলেছিল বাহান্ন বছর আগের সেই নৃশংস জোড়া খুনের রোমাঞ্চকর বিবরণ। এখানে তাঁর সেই পোজ—পশ্চার আর কথা বলার অভিনব ভঙ্গি ইত্যাদি সব বাদ দিয়ে শুধু বলা হল ঘটনাটুকু।

সেই দুর্যোগের রাতে মনে হয় তারা তিনজন বাড়িতে ফিরেছিল। ইসাবেলা,

রাকসটন আর মেরী রজারসন। তখন রাত দুটো।

পরদিন ভোর সাড়ে ছয়টায় রাকসটনকে দেখা গেল ল্যাঙ্কাস্টারের রাস্তায়। হাঁটছে—হাঁটছে, টলতে টলতে। কেমন উদ্‌ভ্রান্ত। উসকো-খুসকো চুল। ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পড়তেই হল।

হ্যালো—মিসেস অকসালি-ই—দূরে কুয়াশার ভেতরে থেকে থপথপ করতে করতে এক মোটাসোটা মহিলার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল রাকসটন, আজ আমার বাড়িতে যেতে হবে না—

কেন স্যার?

মিসেস রাকসটন আর মেরী রজারসন যে ছুটি কাটাতে গিয়েছে এডিনবরায়—কেউ নেই—

তাঁরা না থাক—আপনি তো আছেন স্যার, রাকসটনের বাড়ির বহুকালের লেডী সুইপার মিসেস অকসালি বলল, আমি ঝাড়পোছ করে—

না—না—মিসেস অকসালি আমি তো বলছি—যেতে হবে না। কেমন আর্তনাদ করে উঠল রাকসটন।

তাকে বিদায় করে আবার কোয়ার্টারে ফিরে এল রাকসটন। দেখল তার চেম্বারে বসে আছে তার খুব পরিচিত এক বড় ব্যবসায়ী। সঙ্গে দুইজন পেশেণ্ট। তাদের দেখেই অস্বস্তিবোধ করল রাকসটন। তবুও কোনরকমে ভদ্রতার হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে বলল সেই বিজনেসম্যানকে—আপনি ওদের নিয়ে অন্য ডাক্তারের কাছে যান—

কেন ডাক্তারবাবু?

না—না, দেখছেন না, আমার হাতটা কাটা—আমার শরীর খুব খারাপ—

কেমন করে কাটল ডাক্তারবাবু?

আর বলেন কেন, বাটারের টিন কাটতে গিয়ে—

সকাল গড়িয়ে দুপুর হল। ভর দুপুর। এই সময়টাতেই বড় বেশি ব্যস্ততা, ছুটোছুটি, হাঁকডাক আর হট্টগোলের দুনিয়া থেকে পালিয়ে এসে পৃথিবীটা যেন ঝিমোয়। প্রগাঢ় স্তব্ধতার ভেতরে একটু একটু করে তলিয়ে যায়। খুব—খুব সঙ্গোপনে আর সকলের চোখের আড়ালে কোন কাজ করতে হলে এই সময়টাই—সবচেয়ে ভালো সময়। তাই—

তাই আবার রাস্তায় দেখা গেল রাকসটনকে। বড় রাস্তা ছাড়িয়ে গলিঘুঁজি পেরিয়ে একটা অ্যাসবেস্টাস শেডের বাড়িতে কড়া নাড়ল। বেরিয়ে গেল এক মহিলা। রোগা কাঁকলাসের মত চেহারা। সাপের জিভের মত চোখদুটো চিকচিক করছে—

মিসেস হ্যামসফায়ার—চলুন—চলুন—কুইক—আপনাকে বলেছিলাম—

কিন্তু স্যার—আপনি যা ফি বলেছেন—তাতে পারব না—

দেব—দেব মিসেস হ্যামশফায়ার আপনি যত পাউণ্ড চাইবেন—দেব—

হ্যামসফায়ারকে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকল রাকসটন।

বাতাসে ভেসে এল তীব্র একটা আঁশটে গন্ধ। বারান্দার কার্পেটে বিভিন্ন ঘরের মেঝেতে পাতা রেশমে পশমে বোনা সুদৃশ্য ইস্পাহানী গালিচায় চাপ চাপ রক্তের দাগ। শুকিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে। বালতির পর বালতি জল ঢেলে ঝাঁটা দিয়ে দিয়ে কার্পেটের ওপরের দাগ তুলতে লাগল হ্যামশফায়ার! কিন্তু—

হিতে বিপরীত হল। কার্পেট আর গালিচা ধোঁয়া জল হয়ে গেল লাল। টকটকে লাল—একেবারে তাজা রক্তের মত—তাড়াতাড়ি করে কলের মুখ খুলে দিয়ে তোড়ে জল দিয়ে সেই রক্তের রং ফিকে করে কর্পোরেশনের বড় ড্রেনের দিকে ঠেলে দিল রাকসটন।

হ্যামশফায়ার বেশ মোটা বখশিষ নিয়ে বিদায় হয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কলিং বেল বেজে উঠল দরজায়। ধক্ করে রাকসটনের বুকের ভেতরটা! পুলিশ! কিন্তু না—জানবে কি করে তারা। কোথাও কোন প্রমাণ রাখেনি সে।

ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং—আবার বেল বাজিয়ে তাড়া দিল।

দরজা খুলতেই রাকসটন দেখল, দুই মহিলা। তার বাড়ির আরও দুইজন চারউম্যান বা ঠিকে ঝি—

মিসেস স্মিথ।

মিসেস কারওয়েন।

স্মিথ রাঁধুনী। আর কারওয়েন কাপড়চোপড় কাচে। ওরা এসেই নাকে রুমাল চেপে বলল, হাউ হরিবল—কী আঁশটে গন্ধ রে বাবা—

আর বলো কেন, হেসে হেসে বলল রাকসটন কাল খুব বড় একটা সার্ডিন মাছ কেটেছিলাম বারান্দায়—আমি কি আর তোমাদের মত ধোয়াপাকলা করতে পারি—

মিসেস রাকসটন—মেরী রজারসন—ওরা—

ওরা তো এডিনবরায় গেছে ওর বাবার কাছে, বলতে বলতেই রাকসটন ওডিকোলোনের বড় বোতল নিয়ে এসে বলল, তোমরা এসে পড়েছ ভালোই হয়েছে—শোন—এমন সহজ ভঙ্গিতে বুঝিয়ে বলতে লাগল রাকসটন—তোমাদের রান্নাও করতে হবে না—কাপড়ও কাচতে হবে না। বেশ করে ওডিকোলনটা সারা বাড়িতে স্প্রে করে দাও তো—বলেই বাথরুমে ছুটে যেয়ে দুটো বড় বড় বালতিভর্তি জল নিয়ে এল টেনে! নিয়ে এল স্প্রে করার জন্য সিরিঞ্জ। যে সাহেবকে কখনো ঘরসংসারের কাজের দিকে ঘুরেও তাকাতে দেখেনি—তার উৎসাহ দেখে চারউম্যানরা অবাক হয়ে গেল।

প্রতিটি ঘরের প্রত্যেকটি দেওয়ালে, ঘরের কোণে কোণে বারান্দায় ওডিকোলোন দিয়ে স্প্রে করল তারা তিনজন টানা দুই ঘণ্টা ধরে। ওডিকোলোনের ঝাঁঝালো মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠল। তবু—থেকে থেকে এক একটা মাথাপাগলা দমকা হাওয়ায় সেই মিষ্টি সুগন্ধের সঙ্গে মেশানো একটা উগ্র আঁশটে গন্ধ—ভক করে এসে নাকে লাগে। অত সোজা নয়—ওই আঁশটে গন্ধকে দাবিয়ে রাখা। আঁশটে গন্ধ যে—

নরমাংসের গন্ধ !

বালতি বালতি জল ঢেলে মুছে ফেলা যায় রক্তের দাগ। আঁশটে উৎকট গন্ধকেও দূর করা যায় সুগন্ধী আতর কি আর কোন পারফিউমারি সারা বাড়িতে ছিটিয়ে। কিন্তু—

পাপ? পাপকে কি কোন কিছু দিয়ে কখনো চাপা দেওয়া যায়! —না তাই সম্ভব? একদিন রাত শেষের ঝুকঝুকি অন্ধকারে হাইওয়ে পেট্রোলিং পুলিশের জীপ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ল্যাংকাস্টারের উপকণ্ঠে এক সংকীর্ণ পাহাড়ি পথের বাঁকে। নেমেই তারা ছুটল ডানদিকের খাড়া পাহাড়ের গায়ে একটা অন্ধকার গুহার দিকে! যেতে যেতেই হেড লাইটের তীব্র আলোয় তাদের নজরে পড়েছিল ভেনের মধ্যে সাদা মত কি একটা যেন পড়ে আছে। সামনে যেয়ে দেখল, খবরের কাগজে মোড়া বড় একটা পোঁটলা। যেমন বিশাল ঢাউস চেহারা, তেমনি খুব ভারি পুটলীটা। সেটা খুলতেই তারা ভয়ে আঁতকে উঠে দুপা পেছিয়ে গেল। তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে এল অস্ফুট আর্তনাদ—ও গড।

স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা সানডে গ্র্যাফিকেসর-ই শুধু ল্যাংকাস্টারের স্থানীয় খবর নিয়ে প্রকাশিত একটা লোকাল এডিশানের কাগজ দিয়ে মোড়ানো ছিল পুঁটলীটা। তার ভেতরে ছিল কষাইদের মত সুন্দর সাইজ করে খণ্ড খণ্ড করে কাটা মানুষের মাংস। তার সঙ্গে একটা দামী কাপড়ের ঘন নীলরঙের ব্লাউজ। আর একটা বেশ বড় মাপের ব্রেসিয়ার! দুটোই রক্তে ভেজা। হয়ত আততায়ী যাদের খুন করেছে তাদেরই জামা দিয়ে তাদের দেহের টুকরো টুকরো মাংস প্যাক করেছিল! তার ওপরে ছিল কাগজের মোড়ক!

হাইওয়ে পেট্রোলিং স্কোয়াডের ইনচার্জ সেই বীভৎস বস্তুটি লোকাল থানায় জমা দিয়ে তার সঙ্গে তার রিপোর্ট পেশ করে চলে গেল। সেই থানা আবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা পাঠিয়ে দিল ল্যাংকাস্টার বোরো পুলিশের অফিসার ইনচার্জের কাছে।

এসব ২১শে সেপ্টেম্বরের কথা।

অর্থাৎ ইসাবেলা এবং রুক্সারশনকে যেদিন শেষ দেখা গিয়েছিল (১৪ই সেপ্টেম্বর দুর্যোগের রাত) তার ঠিক পনেরদিন পরের ঘটনা। ইতিমধ্যে কিন্তু ল্যাংকাস্টারে অনেক জল গড়িয়েছিল। এখন সেসব থাক—

ল্যাংকাস্টার বোরোর ও. সি. সেই মাংসের টুকরোর পুঁটলী পেয়েই চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি খুলল ডায়েরী রেজিস্টার। ১৮ই সেপ্টেম্বর ডায়েরী করে গিয়েছে ইসাবেলার বস ডাচ কোম্পানীর ম্যানেজার—বলেছে ইসাবেলাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না—এডিনবরাতে তার বাবার কাছেও খোঁজ করেছে—সেখানেও নেই সে। ল্যাংকাস্টারের বাড়িতে তালা ঝুলছে।

তার হ্যাজব্যাণ্ড মিঃ রাকসটন কোথায় গিয়েছেন কেউ বলতে পারে না—আর ২০শে সেপ্টেম্বর ডায়েরী করে গিয়েছে ইসাবেলার বাবা—১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রে তার ছোট দুই মেয়েকে নিয়ে তার বড় মেয়ে ইসাবেলা ব্ল্যাকপুল ফেস্টিভ্যালে গিয়েছিল। সেখান থেকে মেরী রজারশনকে নিয়ে সে ল্যাঙ্কাস্টারে রওনা হয়েছিল। তারপর তাদের আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না……তার সঙ্গে তার সান-ইন-ল যে মদ্যপ দুশ্চরিত্র এবং মেয়ের সঙ্গে বনিবনা ছিল না—সেসব কথাও একগাদা লেখা ছিল—

এই দুটো ডায়েরী পেয়েই পুলিশ রাকসটনের বাড়ির তালা ভেঙে ভেতরে যেয়ে তন্ন তন্ন করে সার্চ করেছিল। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পায় নি। বেশ হতাশ হয়ে বসেছিল, এমন সময় এল এই মানুষের মাংসের টুকরো। নীল ব্লাউজ আর ব্রেসিয়ার। ও. সি. যেন ঘন অন্ধকারে আলোর রেখা দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে এডিনবরাতে খবর পাঠিয়ে ইসাবেলার বাবা আর তার ছোট দুই বোনকে ডেকে নিয়ে এল। তারা ব্লাউজটা দেখেই বলে উঠল—দিদির ব্লাউজ!—পারশিয়ান মসলিনের—জামাইবাবু দিয়েছিল—

এল অর্থোপেডিক্সের স্পেশালিস্ট ডাক্তার। তিনি টুকরো টুকরো মাংস নিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করে বললেন, ফিমেল বডি—কিন্তু একজনের নয়—দুইজনের আর লোয়ার পার্ট!

তাহলে আপারপার্ট গেল কোথায়? আর একই রকমের রুমাল তো অন্য কোন মহিলারও থাকতে পারে। তাতে প্রমাণিত হয় না ইসাবেলাই খুন হয়েছে। আর রাকসটনই বা কোথায় গা-ঢাকা দিল। যদিও পুলিশ ইংল্যাণ্ডের প্রতিটি পোর্টে, পাসপোর্ট অফিসে রাকসটনের ছবি পাঠিয়ে দিয়ে তাকে দেখলেই গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছিল।

কিন্তু—

কোনদিনই সে ধরা পড়ত না। আর নিহতদের দেহের আপারপার্টও পাওয়া যেত না যদি—এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন মিসেস হর্কলি। আর চোখদুটো কেমন বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন দেওয়ালের দিকে। মনে হল যেন স্পিরিটওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন হয়ত।

তারপর কি হল, অনুগ্রহ করে কি বলবেন? রেকর্ডিং মেশিনের গীয়ার হাতে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল ব্রীগস—না, রেকর্ডিং কি অফ করে দেব?

নো—নো—কন্টিনিউ ইয়োর রেকর্ডিং হোয়াই ইউ উইল স্টপ বেশ জোরেই ধমকে উঠলেন হর্কলি। আবার জুতোর হিল দিয়ে মেঝেতে তিনবার শব্দ করল হর্কলি—টক—টক—টক—তার পরেই জানলার বাইরে ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, হ্যালো ডক্টর জিম—স্যাল আই ডিস ক্লোজ দি ফ্যাক্ট?

কয়েকমুহূর্ত পরই মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, নো—আই অ্যাম সরি সব কথা খোলাখুলি বলতে নিষেধ করছে ডক্টর জিম, হঠাৎ থেমে গেলেন হুকলি। মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ কি ভেবে ঝাপসা গলায় বললেন, তবে যেটুকু বলতে পারব, সেটুকুই বলি—

তার সেই দীর্ঘ বক্তব্য এখানে খুব সংক্ষেপে বলা হল—

ল্যাংকাস্টার পুলিশ যখন জোড়া খুনের কিনারা করতে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে সে সময় থানায় একটা কাণ্ড ঘটল—

আমি জানি—আমি জানি—খুনী কোথায় লুকিয়ে আছে, বছর দশ এগারোর একটা মেয়ে দুহাত তুলে চিৎকার করতে করতে থানায় এল। যেন দূরাগত দৈববাণীর মত করেই বলল, আমি—লাশদুটোর আপার পার্ট কোথায় আছে তাও জানি—

স্ট্রেঞ্জ!—কে তুমি?

আমি যে-ই হই, দৃপ্তভঙ্গীতে বলল মেয়েটি, আমার সঙ্গে যাবেন তো এখুনি চলুন, তা নাহলে আসামী পালিয়ে যাবে—

আর একটা কথা বলল না পুলিশ অফিসার। তার হয়তো মনে পড়ে গেল অরলিয়েন্সের সেই জোয়ান অফ আর্কের কথা। সে-ও তো ঈশ্বরের নির্দেশেই প্রতিটি কথা বলত—এই মেয়েটার কথাও তো সেই রকম হতে পারে।

মেয়েটিই পথ দেখিয়ে ল্যাংকাস্টার শহরের শেষপ্রান্তে কারখানার মজুর বস্তির একটা পড়ো ঘরের কোণে একটা বস্তার ভেতরে পাওয়া গেল দুইটি করোটি কঙ্কাল, দুটো মুণ্ডুহীন ধড়, দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মোট ১৭টি অংশ আর মোট ৪৩টি অংশ সরু এবং নরম সুতোর মত আশ বা সফট টিস্যুজ। কিন্তু—

তাদের আইডেন্টিফিকেশানের সমস্ত চিহ্ন নির্মূল করে ফেলা হয়েছে। ফিঙ্গার প্রিন্ট বা আঙ্গুলের ছাপ যাতে না নিতে পারা যায় তার জন্য তাদের আঙ্গুলগুলো ছুরি দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে। একটা করোটি বা মাথার খুলি থেকে দুটো চোখই উপড়ে ফেলা হয়েছে। রজারসনের চোখদুটো ছিল ট্যারা। ট্যারা চোখ চট করে চিনতে পারা যায়। তাই খুবলে তুলে ফেলেছে। এটা নিশ্চয়ই রজারসনের ই মাথার খুলি। তারপরে দুটো স্কাল, দুটো ধড়ের ওপরে ইসাবেলা আর রজারসনের লাইফ সাইজ ছবি সুপার-ইম্পোজ করে বসিয়ে দিতেই একেবারে মিলে গেল। প্রমাণিত হয়ে গেল ইসাবেলা আর রজারসন-ই খুন হয়েছে!

পোস্টমর্টেম রিপোর্টে আরও জানা গেল—দুইজনকেই গলা টিপে খুন করে সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত শুষে নিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খণ্ড খণ্ড করা হয়েছে।

সেই রহস্যময়ী বালিকার সাহায্যে পাওয়া গেল খুনী ডক্টর রাকসটনকে। সেই বস্তির একটা অন্ধকার ঘরে মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়েছিল। ৫ই নভেম্বর, তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। আর—

২১শে মে, ১৯৩৬ সালে ইসাবেলা এবং মেরী রজারসনকে হত্যার অপরাধে ম্যানচেস্টারের স্ট্রেঞ্জওয়েজ জেলে রাকসটনের ফাঁসি হল—এই পর্যন্ত বলে থেমে গেল হকলি।

সেই মেয়েটি কে?

মেয়েটি কি পজেসড্—না—স্পিরিটওরিয়েন্টেড্?

নো—নো নাথিং—

তাহলে?

আমি—আমিই সেই মেয়ে, হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে বলল হকলি। বাহান্ন বছর আগে আমার বয়স ছিল দশ—

yes! I had seen the whole incident of that famous double murder through clairvoyance and informed the police…

ঘরে যেন বাজ পড়ল।

কারো মুখে একটা কথা নেই। সকলের চোখে চোখে ঘুরতে লাগল একটা প্রশ্ন—ক্লেয়ারভয়্যান্স কি? কিন্তু—

সেই গম্ভীর আর কঠোর স্বভাবের মায়াবিনী সেই স্ত্রীলোককে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস করল না—এই পর্যন্ত বলে ব্র্যানস্টন জানিয়েছিল সেদিনের প্রেতচক্রে’ই আর একটা অদ্ভুত ঘটনা—

ক্লেয়ারভয়্যান্স কি! ম্যাডামকে বলব ভাবছি—হঠাৎ দেখি তিনি হাত নেড়ে নেড়ে কাকে বলছেন এখন যাও—চলে যাও আর না—

কার সঙ্গে কথা বলছেন ম্যাডাম?

উনি-ই তো আমার স্পিরিট—যার মাধ্যমে এত কথা বললাম, হঠাৎ থেমে আবার তীব্র আনন্দে উত্তেজনায় শিউরে উঠে বললেন—আরে—। তিনি-ই তো আপনাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন—

আমরা ভয়ে চমকে উঠি। পিছনে তাকিয়ে দেখি স্বল্পালোকিত সেই ঘরে আমাদের চেয়ারের ঠিক পিছনে এক—

দীর্ঘ ছায়ামূর্তি!

অরিন্দমবাবু, আপনাকে বলা দরকার, চেকোশ্লোভাকিয়ার বিদেশ মন্ত্রী জ্যান ম্যাসারিকের স্পিরিট মিসেস হকলিকে ভর করেছিল। আর ম্যাসারিক নিজেই তাঁর আত্মঘাতী হওয়ার বৃত্তান্ত বলে গিয়েছিল হকলির মুখ দিয়ে—সেই ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার। কিন্তু এডিনবরার জোড়া খুনের প্রসঙ্গে মিসেস হকলি নিজেই ঘোষণা করলেন, ক্লেয়ারভয়্যান্সের মাধ্যমে তিনি গোটা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন। শুনতে মনে হয় যেন প্রেতাবিষ্ট বা পজেশান হওয়ার ভেতরে কিম্বা প্রেতের কোন ভূমিকাই নেই। কিন্তু—তা নয়!

কেন?

ক্লেয়ারভয়্যান্সের সাদামাটা অর্থ হল—দিব্যদৃষ্টি। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন যোগীরা এবং অধ্যাত্মবাদীরা বহুদূরের এবং দূরভবিষ্যতের ঘটনা প্রত্যক্ষ

করতে পারেন। তাকেই বলে দিব্যদৃষ্টি। অনেক দূরের ঘটনা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় বলে তাকে টেলিস্থেশিয়াও (Telesthesia) বলা হয়ে থাকে। কিন্তু—প্রখ্যাত পরলোকবিদ বিশপ লেডবিটার জানিয়েছেন, এই দিব্যদৃষ্টিকে এস্ট্রেলদিব্যদৃষ্টি বললেই ভালো হয় তার কারণ এই দৃষ্টিতে শুধু যে দূরের ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়, তা নয়, এই দৃষ্টিতে বিদেহী আত্মা বা স্পিরিট (Spirit) অর্থাৎ দেবযোনীরা প্রত্যক্ষ হয়। তারা কাছে আসে। আর সূত্রধরের মতই ঘটনার ব্যাখ্যা করে। এস্ট্রেল দিব্যদৃষ্টির ব্যাপারটা আপনার কাছে আরও পরিস্কার করতে হলে, বলতে হয় একটি অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনা—

ফ্রান্সের ডিয়েপ শহরে এক অভিজাত ভদ্রলোকের বাড়িতে প্রেতচক্রের বৈঠক বসেছে। বিখ্যাত যোগী এবং প্রেততত্ত্ববিদ ডি. ডি. হোম চোখদুটো দূরে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি, খুব কুৎসিত চেহারার কয়েকজন শববাহক কফিন নিয়ে চলেছে সমাধিভূমির দিকে। আমি বললাম—কার শব ?

কেন জানেন, না প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন—

প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটনে একটা সভায় বক্তৃতা করছিলেন। আর একজন বলল, ঘাতক হঠাৎ পিছন থেকে এসে গুলি করে—বলেই শববাহী প্রেতাত্মারা মিলিয়ে গেল—এসব ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসের ঘটনা। ঠিক একবছর পরে (১৮৬৪, এপ্রিল মাসে) কিন্তু লিঙ্কন নিহত হয়েছিলেন।

লক্ষ্য করেছেন হয়ত, স্পিরিটের সঙ্গে কথা বলে তাদের সাহায্য নিয়েই মিসেস হকলি এডিনবরার হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছিলেন। আর সেই জোড়া খুনের ঘটনা হওয়ার আগে তিনি এস্ট্রাল দিব্যদৃষ্টিতে তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

চতুর্থ প্রেতমণ্ডল

Ghost Doctor (Ojha) was originated from the fear of the ghosts and that too was the begining of the wisdom.

Eric Maple

ওঝার সৃষ্টি হয়েছিল ভূতের ভয় থেকে আর সেই ভয় থেকেই মানবমণীষারও জয়যাত্রা শুরু।

"প্রেততত্ত্বের ওপরে আপনার লেখা বইগুলো পড়েছি। ভুতুড়ে বাড়ির বৈশিষ্ট্য থেকে শুরু করে পরকাল, আত্মা—বাসনাময়, প্রাণময় আত্মা এবং মৃত্যুরও নানা বৈচিত্র ইত্যাদি তথা প্রেতবিদ্যারই অনেক বিষয়েই বেশ আলোচনা করেছেন"—চিঠিটা লিখেছেন কাঁচড়াপাড়া থেকে এক প্রবীণ শিক্ষক হৃদয়গোপাল ব্যানার্জী, "কিন্তু ভূতের ওঝা" সম্বন্ধে কোথাও কিছু বলেন নি। 'ওঝা' বলতে কি বুঝতে পারা যায়; সত্যিই কি প্রেতকে বিতাড়িত করতে পারার কোন ক্ষমতা তার আছে? অর্থাৎ সোজা কথায় তার মন্ত্র, তার ঝাড়ফুঁক এবং তার অঙ্গভঙ্গী ও অদৃশ্য প্রেতকে উদ্দেশ্য করে তর্জন গর্জনের ভেতরে কতটুকু সত্যি আর কতটুকুই বা অভিনয়! আর কোন কালে পৃথিবীর কোন দেশেই বা ওঝার সৃষ্টি কেমন করে এবং কেন হয়েছিল...যদি সম্ভব হয় এই বিষয়টির ওপরে অনুগ্রহ করে আলোকপাত করবেন। আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার এই অহেতুক কৌতূহলের জন্য...আরও—আরও অনেক কথা ছিল মাস্টারমশাইয়ের চিঠিতে, সেসব অপ্রাসঙ্গিক—

দেখুন মাস্টারমশাই, এ বিষয়ে আমি আর কী বলব! আপনি, অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী শিক্ষক। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ওঝা শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল—যে মন্ত্র পড়ে সাপের বিষ নামায়, কিম্বা নামাতে চেষ্টা করে। আবার ওঝা—ব্রাহ্মণদের উপাধিবিশেষও এবং যারা মন্ত্রাদির সাহায্যে ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসা করে।

সমগ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ওঝাকে বলে ঘোষ্ট ডক্টর আর আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি আদিবাসী অধ্যুষিত দেশগুলোতে যেখানে সমাজ জীবনের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে 'ডাইনী' সেখানে বলে উইচ ডক্টর। কিন্তু যে ভূখণ্ডে যাই বলা হোক, পৃথিবীর সব দেশেই আছে ওঝার অস্তিত্ব। আপনি

শুনলে নিশ্চয়ই অবাক হবেন মাস্টারমশাই, ওঝা সম্প্রদায় মানবসভ্যতার প্রায় সমবয়সী—Ghost doctor is of same age with human civilisation এই উক্তিটি শ্রদ্ধেয় ডক্টর এরিখ ম্যাপলের। ম্যাপলেসাহেব পৃথিবীর দেশে দেশে ঘোস্টডক্টরদের গতিপ্রকৃতি এবং তাদের উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করেছেন।

আদিযুগে মানুষের জীবনে যা কিছু অভিনব বা বিস্ময়কর তাকেই যাদুর প্রভাব বলে মনে করা হত। যেমন তার জন্ম আর মৃত্যু—দুটোই ছিল তার কাছে খুব আশ্চর্য ঘটনা। এবং এই দুটি ঘটনার আড়ালে আছে ঈশ্বরের যাদুর কলাকৌশল। অতএব ঈশ্বরকে প্রসন্ন করার জন্য এবং অশুভ ও দুঃখজনক ঘটনাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই সে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ জীবন পরিক্রমাকে অসংখ্য ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল—এই পর্যন্ত বলে ডক্টর এরিখ আরও জানিয়েছেন, আদিমযুগের মানুষের নানা বিচিত্র অলীক বিশ্বাস থেকে তার যে চিন্তাধারা যে ধ্যানধারণার জন্ম হত, তার ভেতরে থাকত অদ্ভুত এক একটা কুসংস্কার। যেমন, যার জন্য মঙ্গল কামনা করা হবে তারই একটি মূর্তি তৈরি করে পুজো আর্চা করলেই তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে। কিম্বা যে জন্তু শিকার করা হবে, তারই একটি 'ডামি' বা মডেল তৈরি করে নকল শিকারের অভিনয় কিছুক্ষণ করলেই মনস্কামনা পূর্ণ হবে। সফল হবে শিকারে ঠিক—

ঠিক এমনি করে প্রেতকে বিতাড়িত করার জন্য এবং ভূতের ভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই তার সেই অবাস্তব বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বহুবিধ উপায় অবলম্বন করেছে। আদিপ্রস্তর যুগের কবর খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে, খুব দামী সুখাদ্যের ভগ্নাংশ এবং পানীয়ের জন্য সুদৃশ্য মৃৎভাণ্ড। এসব হল—মৃতের প্রেতাত্মার আক্রোশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে আদিকালের মানুষ কবরের ভেতরে খাদ্য এবং জল রাখত—তারই পাথুরে প্রমাণ। আরও কিছু পরবর্তীকালের মানুষ তার প্রিয়জনের প্রেতাত্মাকে প্রসন্ন করার জন্য বলি দিত সুন্দরী যুবতী এবং ক্রীতদাস। তাদের তাজা রক্ত আর মাংসের উপচার মৃতদেহের সামনে সযত্নে সাজিয়ে রেখে তাকে সমাধিস্থ করত। আবার কখনো কখনো তারা ঠিক কবরের ওপরে বলি দিত। এইজন্যে দিত যে বলির পশুর কি মানুষের তাজা আর উষ্ণ রক্ত মাটির ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিচে যেয়ে নিরক্ত পাণ্ডুর শবদেহকে ফোটা ফোটা করে খাওয়াবে। প্রসন্ন হবে মৃতের আত্মা। সে আর কখনো প্রেতাত্মা হয়ে তাকে উৎপীড়ন করবে না—এই রকম আরও অজস্র আর অফুরান ক্রিয়ানুষ্ঠানের কথা বলা যায়। সেসবের মূলে কিন্তু আছে একটাই কথা—

ভূতের ভয়!

প্রাচীন পৃথিবীর দেশে দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর নরগোষ্ঠীর ভেতরে প্রেতাত্মার

আক্রোশ থেকে বাঁচার জন্য যে নানা বৈচিত্রময় পদ্ধতি ছিল—সেসবের আলোচনা নিঃসন্দেহে নৃতত্ত্বের বিষয়বস্তু—প্রেততত্ত্বের নয়, ভূতের অস্তিত্ব নিয়ে এক প্রেস কনফারেন্সে বলেছিলেন ডক্টর এরিথ—Innumerable variations among the technique employed to keep away the ghosts belong to the field of anthropology than a study of ghosts…

তবে ভূতের ভয়কে কেন্দ্র করে পৃথিবীর এক একটি দেশের এক একটি জাতির ভেতরে যে সংস্কার আর বিশ্বাসগুলো মানবসভ্যতার সেই আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত চিরন্তনকালের কোন নদীর স্রোতের মতই প্রবহমান, শুধু সেই সবগুলোরই আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। কেননা, অদ্ভুত আর বৈচিত্রময় সেইসব সংস্কারের ভেতর থেকেই হয়েছে প্রেত-চিকিৎসক বা ওঝার সৃষ্টি—এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু সেই সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্য প্রেততত্ত্ববিদদের তুলনায় তাঁর বক্তৃতাই ছিল সবচাইতে দীর্ঘ। এখানে সংক্ষেপে তাঁর জবানীতেই বলা হল তাঁর বক্তব্য—

আমি পৃথিবীর দেশদেশান্তরে ঘুরে ঘুরে শুধু আকুল হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছি—ভূতের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন জাতির এক একটি অদ্ভুত পদ্ধতি বা বৈচিত্রময় কলাকৌশল।

গেলাম জেরুজ্যালেমে। জর্ডন নদীর পাড়ে এক প্রাচীন জনপদ সাফো। সাফোতে ইহুদীদের বাস। এই গ্রামে ঢুকতে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল—সারি সারি খেজুর গাছের নীলাভ ছায়ার নিচে এক বয়োবৃদ্ধ ইহুদী কৃষকের অতিকায় মূর্তি।

এই মূর্তি কার?

আমাদের গ্রামপ্রধানের সাহেব, স্থানীয় বাসিন্দারা বলল, মোড়ল দেহ রাখার পর তার মূর্তি তৈরি করে গ্রামে ঢুকবার মুখে রাখা হয়েছে—

কেন?

তিনি ভূত হয়ে আমাদের ওপরে অত্যাচার করতে আসবেন না—

অবাক হয়ে গেলাম। পরে শুনেছিলাম—প্রেতের হাত থেকে আত্মরক্ষার এই কৌশল বা 'প্রটেক্টিভ ডিভাইস' কালে কালে হয়ে গিয়েছিল একটা অত্যন্ত 'রিজিড' অর্থাৎ কঠোর একটা সংস্কারে। সেই সংস্কারই আবার সময়ের ব্যবধানে হয়ে যায় একটা নিয়ম—শুধু গ্রামের মোড়ল নয় যে কেউ মারা গেলেই তার মূর্তি তৈরি করে রেখে দেওয়া হয় গ্রামপ্রান্তে। তারপর একদিন গ্রামের বৃদ্ধ পুরোহিতের নির্দেশে মৃতের প্রতিমূর্তির সামনে ধূপধুনো আর আলো জ্বালিয়ে তার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করা শুরু হয়। এমনি করেই পরলোকগত ব্যক্তির প্রতি এই বিনম্র শ্রদ্ধা আর ভক্তি থেকেই ইহুদীদের সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল নৈতিকতার (মর‍্যালিটি) প্রাচীনতম নীতি এবং আইন শৃঙ্খলা—From the vigid taboos earliest principle of

morality and law were derived in the society of Hebrideans (Jews or Hebrew).

জেরুজ্যালেম, ইজরাইলের যেখানে গিয়েছি—দেখেছি একদা পৃথিবীর আদিমতম সুসভ্য জাতি হীব্রুদের এইসব দেশে এখনও প্রচলিত আছে—প্রেতাত্মার প্রতিহিংসা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এইসব সংস্কার। আর তখুনি আমার কেন যেন মনে হয়েছিল—সম্ভবত ভূতের ভয় থেকেই মানবমনীষার জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। আর প্রেতের সেই তীব্র ভীতি থেকেই তার মৃত্যু সম্বন্ধে একটা পরিস্কার ধারণা হল আর মৃত্যুর সেই ধ্যানধারণা থেকেই একটু একটু করে গড়ে উঠল তার সুস্পষ্ট একটি জীবন দর্শন। কিন্তু এখন থাক সেসব কথা—

উত্তর ইউরোপের অরণ্যসমাকীর্ণ বিভিন্ন পার্বত্যপ্রদেশের আদিবাসীদের যুগযুগান্তরের স্থির বিশ্বাস—পশ্চিম মহাসমুদ্রের তীরে বৃটেনদ্বীপপুঞ্জের দেশে কেল্টিকদের (পশ্চিম ইউরোপের প্রাচীন জাতি) পবিত্র সমাধিভূমির বেদীই হল মৃতের আত্মার শেষ বাসস্থান : তাই আজও উত্তর ইউরোপের আদিবাসীরা তাদের প্রেতবিশেষজ্ঞ পুরোহিতের (ভূতগ্রস্থ ব্যক্তির চিকিৎসকও) নেতৃত্বে সেই মৃতদেহ বহন করে চলে যায় সুদূর দ্বীপের পবিত্র ভূমিতে।

আধুনিককালের বৃটেনের পশ্চিমের সমুদ্র সান্নিধ্যের কোন কোন গ্রামের অধিবাসীরা আজও করে চলেছে একটি বিপদ সংকুল ও অতি গুরুভার কর্তব্য—তাদের মৃত আত্মীয়-পরিজনদের বহন করে নিয়ে যায় সাগরের উত্তাল ঢেউ পাড়ি দিয়ে মৃতের শেষ বিশ্রাম স্থল—সুদূর পূর্বসমুদ্রের তীরের পবিত্র সমাধিভূমিতে। তাদের বিশ্বাস—তাদের নৌকোর ছলাৎ ছলাৎ শব্দে, জলের একটানা কলোল্লাসে, তাদের টুকরো টুকরো কথায় কবরভূমির সুপ্ত প্রেতাত্মারা জেগে উঠবে। আর নৌকোর দাঁড়ের অবিরাম ঝপ—ঝপ—শব্দের সেই সংকেতে বুঝতে পারবে—এইবার তাদের গ্রহণ করতে হবে—গভীর শোকের বিষাদ মাখানো সেই পণ্য—নিষ্প্রাণ শীতল এক একটা মৃতদেহ। শব দেহগুলোকে প্রেতাত্মাদের হাতে সঁপে দিয়ে (এখানে সমাধিস্থ করলে তাদের স্পিরিট কখনো অত্যাচার করবে না) তারা ভারাক্রান্ত মনে ফিরে আসবে সেই মৃত্যুর দেশ থেকে। কিন্তু—

শুধু বৃটেনের পশ্চিম উপকূলের বাসিন্দারা নয়, মধ্যযুগে অর্থাৎ পনের এবং ষোলর শতকে সারা গ্রেটবৃটেন জুড়েই প্রেতকে বিতাড়িত করার জন্য এত অজস্র বৈচিত্র্যময় প্রথা এবং ক্রিয়ানুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছিল যে সমস্ত দেশটাকেই প্রাক-খ্রীষ্টান ধর্মীয় ধ্যানধারণার যাদুঘর বলে মনে হত :—

কোন বাড়িতে কেউ মারা গেল। সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হতো প্রেতবিশেষজ্ঞ ওঝা বা ঘোষ্টডক্টর। তার নির্দেশে বাড়ির প্রতিটি জানলা হাট করে খুলে দিতে হত। কেন ?

খোলা দরজা দিয়ে প্রেতাত্মা স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারবে যথাস্থানে—

পরলোকের দেশে। কোথাও বাধা পাবে না।

শুধু দরজা-জানলার ব্যবস্থা করলেই হবে না, মাথা নেড়ে নেড়ে ঘোষ্টডক্টর বলত প্রেতের মত অদৃশ্য ও ভয়ানক এবং মানুষের চরম শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হলে আরো অনেক প্রস্তুতি নিতে হবে তোমাদের—

বলুন আর কি করতে হবে স্যার?

বাড়ির যেখানে যত আয়না আছে—সেইসব আয়নার কাঁচ মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও—

কেন স্যার?

ঘোষ্টডক্টর কথা বলে না। কটমট করে তাকায়। একটু পরে গম্ভীর আর কঠোর গলায় বলে, প্রেতাত্মার চেহারাটা আয়নায় প্রতিফলিত হতে পারে—তার মায়ায় সে এখানে আটকেও যেতে পারে—বিঘ্ন ঘটতে পারে তার শেষ যাত্রায়—

বেশিদিনের কথা নয়। চারশো বছর আগের ইংল্যাণ্ডেই দেখা যেত—শবদেহ নিয়ে সমাধিভূমিতে যাওয়ার সময়ই একটানা বেল বেজে যেত—ডিং—ডং ডিং—ডং—ডং—

সেই ঘণ্টাধ্বনি জীবিতদের স্মরণ করিয়ে দিত তাদের অনিত্য নশ্বর জীবনের কথা। বেলের সেই শব্দ বাতাসের সওয়ার হয়ে গ্রামগ্রামান্তরে প্রতিধ্বনিত হত। আর তার শোকার্ত আত্মীয়পরিজন ছুটে এসে তাকে শেষবারের মত দর্শন করত। কখনো কখনো তাদের ভেতরে কেউ কেউ ইচ্ছে করেই সেই শীতল শবদেহের পাণ্ডুর মুখে এঁকে দিত চুম্বন! তাদের ছিল অন্ধ বিশ্বাস—মৃতের মুখে চুমু খেলে আর কখনো পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে না তার প্রেতাত্মা!

ইংল্যাণ্ডের কথা বলেই থেমে গিয়েছিলেন ডক্টর ম্যাপলে। বেশ কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে আবার আস্তে আস্তে বলেছিলেন দুই গোলার্ধেরই বহু দেশে গিয়েছি কিনা—ভূত তাড়ানোর কলাকৌশল এবং ক্রিয়ানুষ্ঠান, প্রেতকে কেন্দ্র করে অন্ধবিশ্বাস এবং সংস্কার এক এক দেশে এক এক রকম—এত বেশি তার ভ্যারাইটিজ যে তার সব কিছু বলা মুখে মুখে একেবারেই সম্ভব নয়, একটু থেমে আবার বলেছিলেন, আমি শুধু ইটালীর কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব—

পিসা—ইটালীর শান্ত আর সুন্দর প্রাচীন এক শহর। ভরদুপুর। নির্জন রাস্তা ধরে চলেছেন ডক্টর এরিথ। হঠাৎ তার নজরে পড়েছিল রাস্তার ধারে একটা ঘোড়ার গাড়ির মত একটা গাড়ি। (সেটা ঘোড়ার বদলে প্রয়োজন হলে বলদেও টানতে পারে)। নানা রঙে চিত্র বিচিত্র তার ছইতে (বাখারী দিয়ে তৈরি অর্ধ গোলাকার ছাদ) সুদৃশ্য এক একটি নকসার মনোরম কারুকার্য!

গাড়িটা কাদের? এই কথাটা আর কষ্ট করে ম্যাপলেসাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে হল না। তার আগেই চারিদিক কাঁপিয়ে তুমুল শব্দে ড্রাম বেজে উঠল—ডমর—ডমর্—ডম্—ডম্—তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেজে উঠল কাড়ানাকড়া। বেজে উঠল বাঁশী। সেই সুমধুর ঐকতানের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে উদ্দাম বেগে নাচতে লাগল একদল নওজওয়ান ছেলেমেয়ে। তাদের পরণে নানারঙের বর্ণাঢ্য পোশাক। হিপিদের মত এলোমেলো বড় বড় চুল।

স্থানীয় লোকের কাছে খোঁজখবর নিয়ে জানলেন ডক্টর এরিক—এরা রোমান জিপসি (যাযাবর)। এরা সারা 'মে' মাস ধরে নাচেগানে উৎসবের আনন্দে মাতিয়ে রাখে সমস্ত দেশ। এই যাযাবরদের মত প্রাচীন পন্থী রোমানরাও এখনও বিশ্বাস করে—মে মাসের এই উৎসবের সমারোহ যত বেশি হবে তত লারভে বা লেমুররা (প্রেত) শান্ত হয়ে থাকবে। এবং ড্রামের একটানা আওয়াজও কাড়ানাকড়ার প্রবল শব্দ সহ্য করতে না পেরে দেশ ছেড়ে দূরে পালিয়ে যাবে লেমুররা।

লক্ষ্য করলেন আরও একটা মজার ব্যাপার—নাচতে নাচতেই নাচিয়েদের কেউ কেউ কৃষ্ণবর্ণ মটরশুঁটির বীজ আগুনে পুড়িয়ে হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

এটা না কি ভূতের বিরুদ্ধে ডবল প্রিকশান! মটরশুঁটি পোড়ার উৎকট-গন্ধ লারভেদের একেবারে অসহ্য। যেখানে পোড়ানো হয় তার ধারপাশে কখনো ঘেসে না তারা। আজও বহু বহু যুগের ব্যাবধানে এসেও 'মে' মাস সম্বন্ধে কুসংস্কারটা বেঁচে রয়েছে ইটালীর আধুনিক সমাজে—Still it is unlucky to marry in May, the month of dead…মে মাস—মৃত্যুর মাস বলেই বিয়ে অশুভ।

জার্মানীতেও ঘোষ্টডক্টরদের সারভে করেছিলেন ম্যাপলেসাহেব।

বার্লিনের উপকণ্ঠে একটি গ্রামে তিনি দেখেছিলেন এক বহুদর্শী ও প্রবীণ ঘোষ্টডক্টর বা ওঝাকে। সে ভূতে ধরা অসুস্থ এবং অবসন্ন তরুণী মেয়েটির চারিদিকে ঘুরে ঘুরে এবং নানা অঙ্গভঙ্গী করে নাচছিল। আর থেকে থেকে অদৃশ্য প্রেতকে শাসিয়ে তর্জন গর্জন করছিল। সেইসঙ্গে চলছিল প্রবল শব্দে ড্রাম আর বাঁশীর একটানা বাজনা।

—আচ্ছা আপনি নাচছেন কেন, বলুন তো?

ওঝা থামিয়ে দিল নাচ। আমার দিকে কটমট করে তাকালো। অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি নিভু নিভু গলায় বললাম, আমি বিদেশী। তাই আমার কৌতূহল—

মশাই, আপনি কোন দেশের লোক জানি না, কাঁধদুটো ঝাঁকিয়ে খুব ভারিক্কী চালে বলল, যে দেশেরই লোক হন না কেন, জেনে রাখুন, ভূতের মত ধরা ছোঁয়ার বাইরের এক অলীক শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হলে নানা

অঙ্গভঙ্গী করে নাচ আর বাজনা খুব প্রয়োজন স্যার, একটু থেমে সে আবার বলেছিল, এইগুলোই তো আমাদের আধ্যাত্মিক বা আধিদৈবিক হাতিয়ার যা দিয়ে প্রেতলোকের অশরীরিদের আঘাত করলেও করতে পারা যায়। কিন্তু তলোয়ার কি তীরধনুক দিয়ে আপনি কিছুই করতে পারবেন না—

আঃ—উঃ—উঃ তীব্র কোন যন্ত্রণায় মর্মান্তিক আর্তনাদ করে উঠল অসুস্থ মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল তার খিঁচুনী। সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

আশ্চর্য। ওঝা কিন্তু একটুও বিরক্ত হল না। তাকে ধমকালো না (যেটা ঘোস্টডক্টররা সচরাচর করে থাকে)। একটা কথাও বলল না। করে বসল অদ্ভুত একটা কাণ্ড—

কয়েকমুহূর্ত মেয়েটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। দেখতে দেখতে তার চোখদুটো কেমন তন্ময় আর অগাধ হয়ে উঠল। ঝপ করে মাটিতে বসে পড়ল। বসল মেয়েটির কাছে ঘেসে। যেন বহুকালের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে যেয়ে ফিস ফিস করে কি সব বলতে শুরু করল। আর সেইসঙ্গে পরমযত্নে তার গায়ে মাথায় আলগোছে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। দানিয়ুবের জলে রোদ পড়ল বাঁকা হয়ে। আর সেই জলে আবির ছিটিয়ে সূর্য অস্তও গেল। চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে কথা আর হাত বুলানো চলতেই লাগল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হয়ে আসতেই মেয়েটি শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তারপরে আর কিছু বলেন নি ম্যাপলে।

তবে তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরে মেয়েটি নাকি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কেমন করে? কি তাকে কানে কানে বলেছিল জার্মান ঘোস্টডক্টর—কি বলতে পারে? তার রোগীর গায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়ার ভেতরেই কি অকাল্ট—

থেরাপিউটিক্সের বা গুপ্তবিদ্যায় চিকিৎসার কোন রহস্য আছে?

এসব কথা ডক্টর এরিথ ম্যাপলে কিছুই বলেন নি।

মাস্টারমশাই, ম্যাপলেসাহেব কিছু না বলুক, আমি আপনাকে বলতে পারি। বলতে পারি আমারই অভিজ্ঞতা থেকে কেমন করে মেয়েটি সুস্থ হয়ে উঠেছিল। কি কথাই বা কানে কানে বলতে পারে ঘোস্টডক্টর আর কি রহস্য বা কি যাদুইশ্বা ছিল তার হাতের স্পর্শে। সত্যি বলতে কি মাস্টারমশাই ম্যাপলের ঘোস্টডক্টরদের নিয়ে সারভের ভিত্তিতে ইউরোপীয় ওঝাদের কথা বলতে বলতে বারে বারে আমার মনের ভেতরে আনাগোনা করছিল আমাদের দেশের গুণিনদের কথা। আর মনে হয়েছিল—পৃথিবীর দেশে দেশে ভূতের যেমন কোন জাত নেই, ভূতের ভয়েরও নেই কোন রকমফের—

তেমনি ওঝাদের বা ঘোস্টডক্টরদের ভেতরেও নেই কোন পার্থক্য! যদি বলেন কেন?

তাহলে তো আপনাকে অনেক—অনেক কথাই বলতে হয় মাস্টারমশাই। কিন্তু ঠিক কোন জায়গা থেকে শুরু করি ভেবে পাচ্ছি না। সুদূর আসামের কামরূপ জেলার সেই পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা একটি নিভৃত গ্রাম—বোকোপাথরা—পাড়ার প্রতিমাবিবি···তম্বী। ধারালো ঝকঝকে চেহারার মেয়ে··· কিন্তু কেমন উদভ্রান্ত দৃষ্টি···অব্যক্ত যন্ত্রণার একটানা গোঙানি। প্রতিমার স্বামী ময়দান আলী—তার ছোট ছোট দুটো ধূর্ত চোখ আর ওঝা আলাউদ্দীন আমেদ—শুধু এইসব টুকরো টুকরো ছবি ভেসে উঠছে আমার চোখে। আবার মনের ভেতরে মিছিল করে আসছে মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জের সুরমা। মানসিক রোগে প্রায় উন্মাদ। প্রশান্ত সৌম চেহারার সেই গুণিন—যাঁর পেশার সঙ্গে মেলানো তার নামও—গুণিন কর্মকার!

কার কথা আগে বলব, বলবই বা কোন ঘটনাটা আগে! যাক শুনুন, মাস্টারমশাই, বেশি চিন্তা করতে গেলে সব কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কোন গৌরচন্দ্রিকা না করে আপনাকে পরিষ্কার বলছি—যে দুইটি ঘটনায় আমি ওঝাদের আশ্চর্য অলৌকিক ক্ষমতা দেখেছি—সেই দুটোই আমি এখানে সংক্ষেপে বলছি—

বেশিদিন আগের কথা নয়। গত জুন মাসে গিয়েছিলাম আসামের পাণ্ডুতে। পাহাড় দিয়ে ঘেরা ব্রহ্মপুত্রের তীরে ছবির মত সুন্দর শহর। দূর থেকে দেখা যায়, ঝাপসা কুয়াশায় আচ্ছন্ন ভুসো কালির মত রঙের খাড়া পাহাড়ের ওপরে কামাখ্যার মন্দিরের চুড়ো।

যাঁর বাড়িতে উঠেছিলাম, সেই বন্ধু বললেন, আমরা তিনবন্ধু মিলে একটা প্ল্যান্টেশান করেছি—কৃষি উদ্যোগও বলতে পারেন—যাবেন না কি—আসামের গ্রাম তো কখনো দেখেন নি—

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। পাণ্ডুর চারিআলি (চৌরাস্তা) থেকে ডিলাক্স বাসে চেপে চললাম গোয়ালপাড়ার দিকে। এ. টি রোড বা আসাম ট্রাঙ্ক রোডের দুইদিকেই ছোট বড় পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘন সবুজ বনদেহের অপরূপ স্নিগ্ধ শ্যামল শোভা দেখতে দেখতে চলেছি। মনটা কেমন আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হয়ত আসামের এই সুন্দর দৃশ্যের সুখস্মৃতিটুকুই মৃগয়া শেষ করে বাড়ি ফিরে আসতাম। কিন্তু—

তখনো জানতাম না আমার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে একটা দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে বোকোতে এসে নামলাম। বোকোতে থানা, রেজিস্ট্রি অফিস আছে! পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং অফিস এবং আরো দু-একটা সরকারী অফিস নিয়ে বেশ ছোটখাটো একটা মফস্বল শহর। বোকো থেকে এলাম সেই গ্রামে—বোকো পাথরাপাড়ায়।

সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুর জমির চাষীরা ছুটতে ছুটতে এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। তাদের ভেতরে একজনকে দেখিয়ে আমার বন্ধু বললেন, এর নাম ময়দান আলী। ওর ওপরেই আমাদের চাষবাষ এবং জমি দেখাশোনার দায়দায়িত্ব—

ময়দান আলী খুব বেঁটে। বামনই বলা যায়। ছোট ছোট দুটো ধূর্ত চোখ। গাট্টা গোট্টা পাকানো চেহারা। অর্হময়লা গামছা নেংটির মত করে পরা।

চলুন বাবু—জমিতে—হাতজোড় করে বলল ময়দান।

কয়েকগজ দূরেই এলাম জমিতে। ঘন সবুজের ছবির মত বিস্তীর্ণ ক্ষেত। চারিদিকে আসামি সবরী কলাগাছের ঝাড়। মাঝখানে বেশ কয়েক একর জায়গাজুড়ে বেগুন, কাঁচালঙ্কা, উচ্ছে—ইত্যাদি আরও নানারকমে ফসলের সম্ভার।

গাছে গাছে পাখি ডাকছে। বাতাসে কলাগাছের পাতায় পাতায়—সড়—সড়—সড়—শব্দ উঠছে।

তোকে আমি খুন করব—তোর রক্ত খাব, এক নারী কণ্ঠের তীব্র আক্রোশের চিৎকারে চারিদিকের নিথর স্তব্ধতা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

কি ব্যাপার?

ও কিছু নয় বাবু, তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল ময়দান, ওই আমার বিবি। মনে হয় জীনপরীতে ধরেছে—ওর মাথাটাই কেমন বিগড়ে গিয়েছে বাবু— তার কথা শেষ হওয়ার আগেই কৌতূহলী হয়ে আমরা ছুটে গেলাম বাড়ির ভেতরে। আর চমকে উঠলাম—

ধারালো ঝকমকে চেহারার এক তরুণী। তার দীঘল দেহে খরযৌবন। হাতে মাছ কাটা এক বঁঠি নিয়ে মর্মান্তিক আক্রোশে কঁকিয়ে চিৎকার করে চলেছে—শালা—তুই জারুয়া (জারজ)—তুই বাংলাদেশী বলে তোকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে জেল খাটাবো—আরো অনেক—অনেক কটু কুৎসিত কথার ঝড় ছুটে আসছিল।

ময়দান আলী আর প্রতিমাবিবির সাদী হয়েছিল বছর তিনেক আগে। প্রেম মহব্বতের সাদী। কিন্তু মাত্র তিনটা—তিনটা বছর যেতে না যেতেই মহব্বতের গাঢ় রঙ ফিকে হয়ে এসেছিল। দেখতে দেখতে এমন হয়ে গেল যে কেউ কাউকে সহ্যই করতে পারত না। মুখোমুখি হলেই দুজন পরস্পরের দিকে হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বীর মত তাকাত। শেষে তো প্রায় পাগলই হয়ে গিয়েছিল প্রতিমা। কিন্তু—

কেন এমন হয়েছিল সত্যিই কি ময়দান আলী যেমন বলেছিল প্রতিমাকে কোন দুষ্টু প্রেতাত্মা ভর করেছিল। প্রতিমার এই ভয়াবহ করুণ পরিণতির আড়ালে কি শুধু আছে প্রেতাত্মার রহস্যময় প্রভাব, না, কি আছে গুরুতর জাগতিক কারণ, যা ওদের দাম্পত্যজীবনে অভিশাপের বিষ ঢেলে দিয়েছিল।

সেসব জানতে হলে একটু পেছিয়ে যেতে হবে—

ময়দান যখন মাত্র দেড় মাসের শিশু তখন তার বাবা-মা দুইজনেই হঠাৎ কলেরায় মারা গিয়েছিল। ময়দানকে মানুষ করেছিল তাদের এক মুসলমান প্রতিবেশী। মুসলমানের ঘরে বড় হয়েছে। তাই সে নিজেকে মুসলমান বলেই জানত আর নিজের পরিচয়ও দিত অহমিয়া মুসলমান বলে।

প্রতিমার বাপজান বছির মিঞার ছিল নদীর খেয়া পারাপারের কাজ। ময়দান বছিরের সঙ্গে মাঝির কাজ করত। তারপরে যা হয় ব্রহ্মপুত্রের ধারে পাহাড় আর গাছগাছালির ছায়ায় ছায়ায় তাদের প্রেম একটা বন্যলতার মতই বেড়ে উঠেছিল। আর ময়দান অসম্ভব পরিশ্রমী এবং উচ্চাভিলাষী বলে বছিরও তেমন কোন খোঁজ খবর না করেই সাদী দিয়ে দিয়েছিল।

সাদীর পরে প্রথম দুটো বছর বেশ সুখেই দিন কেটেছিল। হার্টের অসুখে হঠাৎ বছির মারা গেল। ময়দানকে বাধ্য হয়েই নৌকোর কাজ ছেড়ে চাষবাসের কাজ নিতে হল। তারপরেই কেমন দিনে দিনে একটু একটু করে পাল্টে যেতে লাগল ময়দান। কারণটা—একেবারে যে আঁচ করতে পারে নি প্রতিমা—তা নয়। এখানেই শুধু নয়, সারা আসামেই আদিবাসী রাভা এবং বোরোরাই বেশি চাষবাসের কাজ করে থাকে। অতএব এদের সঙ্গে মাখামাখি হয়েছিল ময়দানের। নতুন নতুন সঙ্গীসাথী জুটেছিল। তাই হয়ত তার মনটা কেমন উড়ু উড়ু হয়ে উঠেছিল—এর চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে পারে নি প্রতিমা। এমন কি—মোটাসোটা সাদা এক একটা বিড়ালের মত ওই রাভা আর বোরো ছুঁড়িগুলোর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতেও দু'একবার দেখেছিল। তবুও—তবুও কিছু মনে করেনি। দিনেরবেলায় ক্ষেতের মজুরণীদের সঙ্গে যা খুশি তাই করুক—রাতে কিন্তু তার আদরে ভালবাসায় —মানে পাগলের মত পেয়ারের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠত কিন্তু—

ময়দান প্রায়ই রাত করে বাড়ি ফিরতে শুরু করল। প্রতিমা জিজ্ঞাসা করলে বলত—কাজ ছিল। একটু বেশি খোঁচালে ময়দান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। সময় সময় প্রতিমাকে মারধোরও করত।

একদিন গভীর রাতে তাদের চিৎকার করে ঝগড়া, কান্নাকাটিতে অতিষ্ঠ হয়ে পাড়ার লোক পঞ্চায়েত বসালো। আর সেই সভাতেই বোকো-পাখড়ার মুসলমান পাড়ার গ্রাম্যপ্রধান পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ সাইমুল্ল্যা তাদের ঝগড়ার বিস্তারিত বিবরণ এবং রাভা-বোরোদের সঙ্গে মাখামাখির কথা শুনে একটু মৃদু হেসেছিল। তারপর আস্তে আস্তে এমন আশ্চর্য একটা কথা বলেছিল—যে তার ধাক্কাতেই কেমন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল প্রতিমা বিবি—

যা—যা—জাবুয়া—তোর সেই রাভা মাগীটার কাছে যা—তোর রক্ত খাব আবার প্রতিমার মর্মতন্তু ছেঁড়া চিৎকারে তার তীব্র আক্রোশের কথাগুলো ভেসে এল, তোর রক্ত গায়ে মেখে তোর লাশের ওপরে মা কালীর মত ধেই ধেই করে নাচব—

তোমাদের গ্রামপ্রধান কি বলেছিল ময়দান ?

কোন কথা বলল না ময়দান। মাথা নিচু করল। তীব্র একটা যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল তার মুখে।

—তুমি তোমার বিবিকে ডাক্তার দেখাও নি ময়দান ?

—ডাক্তার বদ্যির পয়সা কোথায় বাবু। সিঙ্গারার এক বড় ওঝা—মস্ত বড় গুণিনকে খবর দিয়েছি বাবু—

ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং—সাইকেলের ঘণ্টির শব্দ বেজে উঠল।

ওঝা এসেছে রে—ওঝা—পাড়ায় চাঞ্চল্যের সাড়া জেগে উঠল।

অন্যান্য সব ওঝাদের মত বুড়োথুড়ো নয়। বত্রিশ তেত্রিশ বছরের স্মার্ট ইয়ংম্যান। পরণে সাদা ট্রাউজার। গায়ে লাল টকটকে হাওয়াই সার্ট। যুবক এই গুণিন—আলাউদ্দীন আহমেদের নাম বোকো থানার লোকের মুখে মুখে।

আলাউদ্দীনকে দেখেই আরও হিংস্র হয়ে উঠল প্রতিমা। দুহাতে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে চিৎকার করে বলতে লাগল—ওই জারুয়াটা ওকে নিয়ে এসেছে—আমাকে খুন করবে বলে—

এই মাগী চুপ কর, বলেই গুণিন তার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এসে উঠোনের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিল। আর অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইল প্রতিমার দিকে। আমার মনে হল আলাউদ্দীনের চোখের দৃষ্টি চুম্বকের মত তীব্র বেগে আকর্ষণ করছে তাকে ; কিম্বা যেন একটা ময়াল সাপ একটু একটু করে গ্রাস করছে তাকে—সেই ভয়ংকর দৃষ্টির সামনে মুহূর্তের জন্য কেমন জড়োসড়ো হয়ে গেল প্রতিমা। কিন্তু তারপরেই আবার হঠাৎ ফুঁসে উঠল—

তবে রে মেয়ে, বলেই তার সাইকেলের ফর্কে বাঁধা চাবুক নিয়ে এসে সপাং করে তার পিঠে বসিয়ে দিল আলাউদ্দীন। তারপরে প্রায় মিনিট কুড়ি ধরে সে পাগলের মত একটানা মেরেই চলল তাকে। আশ্চর্য একবারও যন্ত্রণায় আর্তনাদ করল না প্রতিমা! আর তাতেই পাড়ার লোকের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল নিশ্চয়ই ভূতেই ধরেছে !

আমার কিন্তু মনে হল—হিস্টিরিয়া! মানসিক রোগের চিকিৎসা এবং বিভিন্ন ওঝাদের ট্রিটমেন্টের ওপরে লেখা একটি বইতে পড়েছিলাম—হিস্টিরিয়ার তীব্রতায় ব্যথা অনুভব করা যায় না। সারা শরীরে আংশিক অবশতা আসে। কিন্তু আমিও যে ভুল করেছিলাম—সেটা বুঝলাম, একটু পরেই—

বেদম প্রহার বা অনেকক্ষণ ধরে বেত্রাঘাতে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল প্রতিমা। পিঠের জায়গায় জায়গায় কেটে রক্ত ঝরছিল। সেই অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল —আলাউদ্দীন তখন তার গায়ে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বিড় বিড় করে যেন কিসের মন্ত্র পড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পরে তার হাত বুলানো আর মন্ত্র পড়া থেমে গেল। তখন তার কানের খুব কাছে মুখ নিয়ে যেয়ে

চাপা গলায় ফিস ফিস করে কি সব বলতে লাগল আলাউদ্দীন। হঠাৎ দেখলে মনে হবে—যেন দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু গল্পে মেতে উঠেছে।

হঠাৎ চোখ খুলল প্রতিমা। সুস্থ আর স্বাভাবিক দৃষ্টি। অনেক—অনেক দূর থেকে অস্পষ্ট আর ঝাপসা গলায় বলল, কিন্তু গুণিন—মোড়ল বুড়ো যে বলেছিল ওর শরীরে রাভা আর বোরো—দুই জাতেরই রক্তের মিশেল আছে—

তা হোক, হয়ত ময়দানের মা—রাভা, বাবা বোরো ছিল গুণিন খুব জোর গলায় পরিষ্কার করে বলল, কিন্তু ও পালিত হয়েছে মুসলমানের ঘরে—,একটু থেমে আবার বলল, মুসলমান ছাড়া ওর আর কোন পরিচয় নেই—থাকতে পারে না—হঠাৎ থেমে গেল সে। তারপর চোখ দুটো কুঞ্চিৎ করে নিভু নিভু আলোয় যেমন করে পুঁথি পড়ে তেমনি করে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলল, হ্যাঁরে তুই ওকে পেয়ার করিস তো?

ঝিক—করেযেন হেসে উঠল তার জলে ভেজা বড় বড় চোখদুটো। চোখের জলে আর হাসির আলোয় অন্ধ হয়ে এল প্রতিমাবিবির চোখদুটো—

বিদায় নেবার সময় সেলাম জানিয়ে বলেছিল, গুণিন আলাউদ্দীন না মারলে ওর মনের ভেতরের জটটা কিছুতেই খুলত না স্যার—একটু থেমে আবার বলল, তারপর মন্ত্র পড়ে বশ করে জেনে নিলাম—ময়দানকে ও এখনও পেয়ার করে—ব্যস—আর কখনো প্রতিমা পাগলামী করবে না—

কেমন করে বশ করলেন, কি মন্ত্র বললেন, আলাউদ্দীনসাহেব, একটু যদি বলেন, আমার বন্ধুটি আমার জন্যই (এই বিষয়ে বই লিখছি—জানতো) অনুরোধ করেছিল—

আমার ওস্তাদের নিষেধ আছে সাহেব—বলতে পারব না মাফ করবেন—

মাস্টারমশাই, কোন গুণিনই কখনো তাদের মন্ত্র বলে না (আদৌ কোন মন্ত্র আছে কি?)। বলে না কখনও রোগীকে হিপনোটাইজ বা বশ করার কলাকৌশল—এসব তাদের ট্রেড সিক্রেট বা মন্ত্রগুপ্তি। তবে আমি আপাতত শুধু এইটুকু বলতে পারি—ওঝা আলাউদ্দীন আহমেদের সেই প্রচণ্ড ও নির্মম বেত্রাঘাতটা কিন্তু 'প্র্যাকটিক্যাল' ব্যাপার। নৃশংসভাবে প্রহার ও উৎপীড়ন যে মানসিক রোগীর অব্যর্থ দাওয়াই—এই ঐতিহাসিক সত্যটি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসাবিশেষজ্ঞের এই উক্তির ভেতরে, History of 2000 years of continuous violence in the treatmeut of mentally disturbed···অসুস্থ মানুষটির ওপর এই অত্যাচারকে সমষ্টিগত এবং ব্যাপকভাবে বলা হয় শক ট্রিটমেন্ট। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, দারুণ আঘাতে রোগীর 'এমোশান' বা ভাবাবেগের ভেতরে প্রচণ্ড আলোড়ন ওঠে, সেই ধাক্কাতেই মনের গহন অন্ধকারে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা সমস্যাটা বেরিয়ে

পড়ে। দিনের আলোয় অবারিত হয়ে যায়। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় শকট্রিটমেণ্টের নাম—

সোম্যাটোথেরাপি (Somato therapy)।

এবার মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জের সুরমার কথা শুনুন।

আজিমগঞ্জের রাজা (সাম্প্রতিককালে পদ্মশ্রী) বিজয়সিংহ দুধুরিয়ার একমাত্র কন্যা। অসামান্য সুন্দরী। খুব দীঘল ছিপছিপে—খানিকটা যেন ভাটিয়ালী গানের সুরের মত দীর্ঘ চেহারা। গভীর কালো ডাগর দুটো চোখ। আর সেই চোখেই গভীর বিষাদের ছায়া। নিদারুণ কোন দুশ্চিন্তায় মিষ্টি মুখখানা একেবারে কালি মাড়া। কারো সঙ্গে একটা কথা বলে না। রাতে দিনে কখনো এক ফোঁটা ঘুমায় না। শুধু ঘরের এমাথা থেকে ও মাথা পায়চারি করে। লোকজন দেখলে ভয় পায়। দৌড়ে গিয়ে দরজায় খিল দেয়।

ওই তো দেখছ বাবা—ওর অবস্থা—আমাকে ইঙ্গিত করে বললেন কাকাবাবু (বিজয়া সিংহ) তুমি তো সব জানো—আমার ওই একটাই সন্তান। বিয়েও প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলাম—কিন্তু মেণ্টালি ডিরেল্ড মেয়েকে—বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন। গভীর ব্যথার উজান ঠেলে আর কিছু বলতে পারলেন না।

বলা দরকার, ওয়েস্ট বেঙ্গলে ডোমিসাইল্ড রাজপুত জমিদার বিজয়সিংহদের সঙ্গে আমাদেব কয়েক পুরুষ ধরে পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা আমার ঠাকুরদার আমল থেকে। তাই কাকাবাবু তাঁর এই আকস্মিক বিপদে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আর এখানে এসে খুব লাভই হয়েছিল মাস্টারমশাই। এমন একজন 'হাইলি এডুকেডেট' এবং মার্জিত রুচির ওঝার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল যে তাঁর কথা 'ডিটেলস' শুনলে আপনি খুব অবাক হবেন। তিনি আমাকে তাঁদের অনেক গোপন ক্রিয়া বিধির কথাও ফ্র্যাংকলি বলেছিলেন। কিন্তু থাক সেসব কথা। আগে ঘটনাটা বলি—

কিন্তু কাকাবাবু, কেমন করে এমন হল ?

আর বল কেন বাবা, বহরমপুরে আমার ছোট শালা মানে ওর ছোটমামার বিয়েতে গিয়েছিল, একটু থেমে আবার বললেন, তোমার কাকীমাও ছিলেন। সেই বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরেই একেবারে অ্যাবনরম্যাল, বলেই দূরে গঙ্গার গৈরিক জলরাশির দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে বসে রইলেন।

কি চিকিৎসা করেছেন ?

আর সেসব কথা শুনে কি করবে ? হাকিমী, কবরেজী, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি—যে যা বলেছে করেছি বলতে বলতে তীব্র জ্বালায় যেন দগ্ধ হতে হতে বললেন—এখন কেউ কেউ বলছে বাতাস লেগেছে—ভূতে ধরেছে, থেমে গেলেন। মনে হল, হতাশার অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে অস্ফুটস্বরে বললেন দেখি এক ওঝাকে ডেকে পাঠিয়েছে—গঙ্গার একেবারে তীর ঘেঁসে ওঠা

রাজপ্রাসাদের মত বিশাল বাড়ির দোতলায় ব্যালকনিতে ডেকচেয়ারে বসে কথা বলছিলেন কাকাবাবু। হঠাৎ নিচে তাকিয়ে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ওঝা এসে গিয়েছেন—আমাকে এই খবরটা দিয়েই তর তর করে নিচে নেমে গেলেন তাঁকে রিসিভ করতে।

ওঝার চেহারাটা বেশ বুদ্ধিদীপ্ত। টাক মাথা। তার এদিকে সেদিকে দু'এক গাছি চুল কোনরকমে লড়াই করে এখনও টিকে আছে। গায়ে গেরুয়ারঙের খদ্দরের বেনিয়ান। পরণে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি। খাড়া নাকে, বড় বড় দুটো উজ্জ্বল চোখে মনস্বীতার ছাপ।

তোমার কি কষ্ট মা? সুরমার হাতদুটো নিজের হাতের ভেতরে নিয়ে বললেন ওঝা—গুণিন কর্মকার। এমন মিষ্টি করে মধুর মৃদু কণ্ঠে বললেন যে আমার মনে হল যেন গান করছেন। কিন্তু—

কোন লাভ হল না। এক ঝটকায় তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে সুরমা বলল, আমার কোন কষ্ট নেই—আমার কিছু হয়নি—যান—যান—আপনি চলে যান—

ওঝা কিছুই বললেন না। শুধু উজ্জ্বল দুটো চোখের তীক্ষ্ণ আর স্থির দৃষ্টির সুঁচ দিয়ে তাকে যেন বিদ্ধ করতে লাগলেন। কেন যেন আর এক পাও নড়তে পারল না সুরমা। যেন সফল কোন শিকারী ব্যাধের তীরে জখম হয়ে গিয়েছে হরিণী। ঠিক কতক্ষণ হবে, বলতে পারব না। হয়ত দশ-বিশ মিনিট কি আধঘণ্টাও হতে পারে। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ল সুরমা।

এইবার গুণিন তার মুখোমুখি বসলেন। অত্যন্ত গম্ভীর আর কঠোর কণ্ঠে বললেন, আমার চোখের দিকে তাকাও—অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দেবে না—সুরমা তাই করল। আমাদের মনে হল, গুণিনের দুটো চোখের স্থিরদৃষ্টি থেকে নিঃশব্দে ক্ষরিত হচ্ছে অদৃশ্য চুম্বক প্রবাহ। আর তাতেই আবদ্ধ হয়ে গিয়েছে সুরমা। সেই অবস্থাতেই অর্থাৎ তার দিকে চোখ রেখেই তার হাতদুটো নিজের হাতের ভেতরে নিয়ে মৃদু চাপ দিতে শুরু করলেন। একটু একটু করে কেমন নিস্তেজ হয়ে এল সুরমা। হঠাৎ গুণিন উঠে দাঁড়াল। দ্রুত পায়ে সুরমার পিছনে গিয়ে হাঁটু ভেঙ্গে বসে জোরে জোরে তার পিঠটা ওপর থেকে নিচে ডলে দিতে লাগল। আর থেকে থেকে রোগিনীর ব্রহ্মতালুতে খুব জোরে জোরে ফুঁ দিতে থাকল। আমি—

আমি স্পষ্ট দেখলাম মাস্টারমশাই, সুরমা যেন এক স্নিগ্ধ, মধুর অনুভবের সুখে কেমন আবিষ্ট হয়ে গেল। তার কয়েক মুহূর্ত পরেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেল সে।

এইবার কোথাও যেন কোন শব্দ না হয়, এতটুকু গোলমাল না হয়, কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন গুণিন, এমন কি রাস্তা থেকেও যেন কোন আওয়াজ না আসে—প্রগাঢ় স্তব্ধতা নেমে এল ঘরে।

ঘুমন্ত সুরমার কাছে ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইলেন গুণিন। মনে হল, তিনি মনে মনে কোন মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন। তার কিছুক্ষণ পরেই রোগিনীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত আলতো করে স্পর্শ করে হাত বুলিয়ে দেওয়ার মুদ্রা করলেন বার কয়েক। তারপরেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলেন।

সুরমার দিকে ঝুঁকে পড়ে ঠিক তার বুকের ওপরে জোরে জোরে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। আমার মনে হল যেন ঝড়ের মত নিশ্বাসের বাতাসে উড়িয়ে দিতে চাইছেন সুরমার বুকের ভেতরে জমে থাকা কোন গোপন গ্লানির অপচ্ছায়া।

না—না আমি কোন পাপ করিনি। কোন অন্যায় করিনি, ঘুমের ঘোরে বিড় বিড় করে বলতে লাগল সুরমা···চিরকিশোর আর আমি বিয়ে বাড়িতেই কোণের দিকে একটা ফাঁকা ঘরে বসে শুধু গল্প করেছিলাম···কিশোর— থেমে গেল সুরমা। তার মুখের ওপরে নুয়ে পড়ে ব্যাকুল হয়ে বললেন, গুণিন, বল—বল—বলে যাও—সব বল তোমারই ভাল হবে—

কিশোরের চেহারাটা যেমন তেমনি কথাও বলে সুন্দর···ওর কথা শুনতে শুনতে কখন রাত পুইয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারিনি···হ্যাঁ—দুটো—দুটো তক্তাপোষ ছিল ঘরের দুদিকে। মাঝখানে টেবিলে জ্বলছিল কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্প। তার জোরও কমানো ছিল—কিশোর ছিল একদিকের খাটে, আমি ছিলাম আর একদিকেরটায়। যথেষ্ট—যথেষ্ট ফারাক থাকলেও সেই দূর থেকেই ল্যাম্পের নিভু নিভু আলোয় আমি দেখেছিলাম—···দেখেছিলাম— এই পর্যন্ত বলেই থেমে গেল সুরমা। ঘুম ভেঙ্গে গেল তার।

কি দেখেছিলে মা? সস্নেহে তার মাথায় হাত রেখে গুণিন বলল, সব ফ্র্যাংকলি বল—

কিশোরের দুর্বলতা বুঝতে পেরেছিলাম, স্পষ্ট তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল সুরমা, কিন্তু আমি প্রশ্রয় দেইনি—নিজেকে শক্ত করেছি—শুধু একটা ঘরে রাত্রে থাকার জন্যই—আমার—বলতে বলতে অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল গুণিনের পায়ের কাছে।

ওঠো মা—ওঠো—কেঁদো না, পরম আদরে তাকে ধরে বসিয়ে দিলেন। তার মাথায় হাত রেখে বললেন, তুমি কোন অন্যায় করোনি মা—কোন পাপ করোনি—একটু থেমে আবার বললেন, অন্যায় আর পাপের জন্ম তো হয় মানুষের মনে—সমস্ত ব্যাপারটাকে সহজ করে নিলেই হল—তোমার এই কমপ্লেক্সটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও—

পারব?

নিশ্চয়ই পারবে! গুণিনের দৃঢ় কণ্ঠে কঠিন প্রত্যয়ের সুরে গমগম করে উঠল ঘরটা। স্মিত প্রসন্ন হাসির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুরমার মুখখানা। সে ভেতরে চলে যাচ্ছিল—

শোনো—মা—বেনিয়ানের পকেট থেকে কাগজের মোড়ক বের করে, বললেন

গুণিন, এটা আমি স্বপ্নের ভেতরে দৈবাদেশে পেয়েছিলাম—এই ওষুধটা কবজ করে ধারণ করবে—যে কোন মঙ্গলবার ভোরে স্নান করে—

মোড়কটা নিয়ে মাথা নেড়ে যেন বাতাসে পা ফেলে ভেতরে অন্তর্হিত হয়ে গেল সুরমা।

চিরকিশোর কে ?

আমার মেজশ্যালকের স্ত্রীর পিসতুতো ভাই—বললেন কাকাবাবু—কেন, তার সঙ্গে কি সুরমার কিছু—

না—না—সেরকম কিছু নয়, গুণিন হেসে বলল, তবে তার সম্বন্ধে আপনার মেয়ের একটু উইকনেস আছে। তাকে মাঝে মাঝে ডাকবেন বাড়িতে—ওদের ফ্রিলি গল্প করতে দেবেন—দেখবেন, মেঘ কেটে যাবে—

আচ্ছা তাহলে ভূতে ধরার ব্যাপারট্যাপার কিছুই নেই ? আমি বললাম।

এক ঘরে কোন পুরুষের সঙ্গে রাত্রে থাকলে মেয়েমানুষ অসতী হয়ে যায়, যুগযুগান্তরের এই সংস্কারটারই ভূত ওর ঘাড়ে চেপেছিল বলতে পারেন—

আপনি কেমন করে ওকে হিপ্নোটাইজ করলেন ? কেন ওর ব্রহ্মতালুতে ফুঁ দিলেন—কেন ওর বুকের নিশ্বাস ফেলে ফেলে—হয়ত আরও অনেক—অনেক প্রশ্নই করতাম। কিন্তু তিনি মৃদু হেসে আমাকে হাত তুলে ইঙ্গিত করলেন। আর ওঝারা যা কখনো বলে না—তাও বেশ বুঝিয়ে বলেছিলেন। এখানে বলা হল তার দীর্ঘ বক্তব্যের সারসংক্ষেপ—

ওঝারা সাধারণত যে পদ্ধতিতে মানসিক রোগগ্রস্ত বা চলতি গ্রাম্য ভাষায় ভূতে ধরা রোগীকে চিকিৎসা করে তাদের গভীর হতাশার অন্ধকার আলোতে নিয়ে আসেন, তাকে বলে গুপ্তবিদ্যা বা যাদুবিদ্যার চিকিৎসা—অর্থাৎ 'Occult Therapeutics'—এই চিকিৎসা হয় সাধারণত দুই রকম ভাবে (ক) চুম্বক শক্তিতে এবং (খ) আধ্যাত্মিক উপায়ে। কিন্তু—এই ট্রিটমেণ্টের আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার আগে জানা দরকার মানুষের দেহের শরীরবৃত্ত বা ফিজিওলজি—

মানুষের দেহ অসংখ্য কোষ বা 'সেল' নিয়ে গঠিত। আর প্রত্যেকটি কোষের আছে একটি প্রাণ, আছে একটি মন। তারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র সত্ত্বা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। বেঁচে থাকে এবং দেহের প্রতিটি কর্মকাণ্ডই নির্বিঘ্নে এবং সুচারুভাবে করে যেতে পারে। আর প্রতিটি কোষই কিন্তু কেন্দ্রীয় মনের নিয়ন্ত্রাধীন। সেই মনের আদেশ শোনার জন্য এক পায়ে খাড়া হয়েই আছে। কোষগুলো কিন্তু অত্যন্ত বেশি অ্যাক্টিভ বা সক্রিয়। দিবানিশি ছুটোছুটি করে কাজ করে চলেছে। তাদের কাজেরও আবার অদ্ভুত সিস্টেম আছে—কোষগুলো ছোট ছোট এক একটা দলে বা গ্রুপে বিভক্ত। এই দলগুলো আবাব একটা বড় সমষ্টিতে যুক্ত হয়ে গড়ে তুলেছে একটি ছন্দোবদ্ধ অখণ্ড সমগ্রতা—বা মানব দেহ।

মনে রাখতে হবে মস্তিস্কের কোষগুলো স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা।

তাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় হল—ব্রেন বা মস্তিষ্ক। আর স্নায়ুতন্ত্রগুলো হল টেলিগ্রাফের তার। এই তারগুলোর সাহায্যে ব্রেন দেহের বিভিন্ন অংশে যখন যেমন প্রয়োজন অনুভূতির বার্তা পাঠিয়ে দেয়। অনেক—অনেকক্ষণ ধরে অবিরাম সুখকর স্পর্শে (আলগোছে হাত বুলানো) বা মিষ্টি আর স্নিগ্ধ কোন অনুভূতি দিয়ে এখানকার নার্ভগুলোকে শান্ত ও নিস্তেজ করতে পারলেই মস্তিষ্কের কোষগুলো সাময়িকভাবে ঘুমিয়ে পড়ে কিংবা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। রোগী সম্মোহিত বা হিপনোটাইজড হয়ে যায়।

'হিপনোটাইজ' করার আর একটা মোক্ষম অস্ত্র হল—চোখ। বহুদর্শী ও সুদক্ষ ওঝার চোখের দৃষ্টিতে থাকে চুম্বকের মত আকর্ষণী শক্তি। (বিভিন্ন ওঝার ক্ষেত্রে এই শক্তির তারতম্য আছে এবং কম বেশি নির্ভর করে তাঁদের দীর্ঘ অনুশীলনের ওপরে)। এখানে ওঝার চোখের দৃষ্টি থেকে নিসৃত চুম্বক প্রবাহ দিয়েই যেন স্নান করিয়ে দেওয়া হল রোগিনীর চোখদুটোকে। শান্ত স্তিমিত আর নিস্তেজ হয়ে গেল তার চোখদুটো—হয়ে গেল প্রায় সম্মোহিত।

হাত বুলিয়ে দেওয়া কিংবা বুলানোর মুদ্রা করাকে ইংরেজীতে বলে—Passes, একজনের হাতের স্পর্শে আর একজনের দেহে চুম্বক শক্তি সঞ্চারিত হয়ে থাকে। কি রকম?

একটা শিশু খেলতে খেলতে হঠাৎ পড়ে গেল। আঘাত পেল। তার মা ছুটে এল। বাচ্চাটির ব্যথার জায়গাটায় হাত বুলিয়ে দিল। ছোট্ট করে একটা চুমুও খেল। ছেলেটি শান্ত হয়ে গেল। আর বেশ চাঙ্গাও হয়ে উঠল। এর ভেতরের রহস্যটা হল মায়ের স্পর্শের চুম্বকশক্তিটা তার সন্তানের প্রতি অপরিসীম স্নেহের সওয়ার হয়ে ওপরে চালিত হয়েছিল—যা শিশুটিকে শান্ত এবং সুস্থ করে তুলেছিল।

এই পাসেজের বা স্পর্শের চুম্বকপ্রবাহের অত্যন্ত মৃদু ও স্নিগ্ধ একটা প্রভাব আছে স্নায়ুতন্ত্রের ওপরেও। রোগীর গায়ে যদি ওপর থেকে নিচে হাত বুলিয়ে (Downward passes) দেওয়া যায় বা তার মুদ্রা করা যায় তাহলে তার ভেতরে একটা শান্ত, সুমধুর ঘুমের আবেশ সৃষ্টি হয় এবং ঘুমিয়েও পড়ে। আর যদি নিচ থেকে ওপরে অর্থাৎ Upward passes করা যায় তাহলে পেশেণ্টের ভেতরে জেগে ওঠে সুপ্ত অনুভূতিগুলো। জাগে তীব্র কর্মচাঞ্চল্য —এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিলেন মনস্বী ওঝা, গুণিন কর্মকার। কিছুক্ষণ তার চিন্তার ভেতরে মগ্ন থেকে খুব আস্তে আস্তে বলেছিলেন, সুরমার মাথায় অল্প অল্প গোলমাল দেখা গিয়েছিল। তাই তার বুকের ভেতরে জমেছিল কতগুলো অলীক ও মিথ্যা সংস্কারের যন্ত্রণা—এই দুটো জায়গায় জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলেছিলাম—Occult Therapeutics-এ আছে—This shower of breath on the affected parts of the patient's body is known by the technical name Phoonk অর্থাৎ

জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলা হল 'ফুঁক' আর হাত বুলানো বা passes হল ঝাড়—। এই দুই যে মিলে 'ঝাড়ফুঁক' কথাটি এখনও এই উপমহাদেশের প্রতিটি গ্রামেগঞ্জে জনপদে বহুল প্রচারিত, থেমে গেলেন গুণিন।

দূরে গঙ্গার বুকে বিকেলের রোদ পড়েছে বাঁকা হয়ে। আবির মাখানো সেই জলে ঝপ ঝপ করে দাঁড় ফেলে আলোড়ন তুলে দুলতে দুলতে চলেছে এক একটা নৌকো। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আবার থেমে থেমে বললেন, মহাভারতে আছে, থেরবাদী বৌদ্ধ দর্শনেও আছে প্রতিটি কোষের মন অন্য ব্যক্তির মনের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। তারা তখন রোগীর কেন্দ্রীয় মনের কোন নিয়ন্ত্রণ মানে না—কোন তোয়াক্কা করে না ফলে বিশৃঙ্খলা বা সংঘাত দেখা যায়—

তখন—আবার থেমে গেলেন, মনে হল তাঁর মনের ভেতরে কিছু নিয়ে নাড়াচাড়া চলছে। সসঙ্কোচে বলল, মনে কিছু করবেন না—এখানে সুরমার দেহের কোষের মনগুলো সেই ছেলেটির মনের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছিল—আমাদের কাজ হল—সেই ফরেন এলিমেণ্টকে তাড়িয়ে রোগীকে সুস্থ করা—একটু থেমে আবার বললেন—

Occult Therapeutic-এ বলে, যাবতীয় অসুখই cell diseases এবং আরোগ্যলাভের একমাত্র উপায়—কোষগুলির মনের চিকিৎসা। তাকে প্রেরণা দিতে হবে উদ্দীপ্ত করতে হবে স্বাভাবিক কাজ কর্মে—আরও বলে গুপ্তবিদ্যার চিকিৎসা—যে কোন অসুখই দেহে নয়, মনে—

কবচ দিলেন কেন ?

দৈবওষুধের প্রতি মানুষের যুগযুগান্তরের বিশ্বাস। ওর উপকার হতে পারে—একটু হেসে বললেন, আসলে ওর ভেতরে তেমন কিছুই নেই—

দেশেবিদেশের ওঝাদের নিয়ে তো অনেক কথাই হল—মাস্টারমশাই। হয়ত এই রহস্যময় বিষয়টি সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল কিছুটা চরিতার্থ হয়েছে। তবুও—

তবুও আমার মনে হয় মাস্টারমশাই, এমন একটি প্রসঙ্গ এখনও বলা হয়নি, যা না বললে যাদুবিদ্যায় চিকিৎসা বা ওঝাদের বিষয়টা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে—

আর সেই প্রসঙ্গটি হল—

ইলেকট্রিক শক।

প্রেতাবিষ্ট বা ভূতগ্রস্ত তথা মানসিক রোগের রোগীদের চিকিৎসায় ইদানিংকালে খুব শোনা যায় ইলেকট্রিক শকের কথা। কৌতূহল হয়—হওয়া স্বাভাবিক—কবে কোথায় প্রথম বিদ্যুৎপ্রবাহ দিয়ে চিকিৎসা শুরু হল। সোজা কথায়—ইলেকট্রিক শকের হিস্ট্রি কি ? আর—

তাহলেই চলে যেতে হয় একটি ঘটনায়। নির্ভেজাল সত্যি ঘটনায়।

কিন্তু তার আগে বলা দরকার সেই সর্বকালের চিরন্তন সত্য কথাটি—Necessity is the mother of invention…অর্থাৎ নিত্যনতুন আবিষ্কারের জন্ম হয়েছে প্রয়োজন থেকে। কার প্রয়োজন হয়েছিল বিদ্যুততরঙ্গের প্রবাহ দিয়ে মাথার চিকিৎসার।

হ্যাঁ হয়েছিল। বড় করুণ আর মর্মান্তিক সেই প্রয়োজন। মাঝবয়সী সেই মহিলা। স্বাস্থ্যটা বেশ ভাল। তাই যৌবনটা যেন এখনও বেলাশেষের রোদের মত ঝিকমিক করছে। তাকে সুখী—যথেষ্ঠ সুখী বলতেই হবে। স্বামীর আছে বিশাল খামার। কৃষিখামার। অঢেল পয়সা। ফিলাডেলফিয়া শহরের অভিজাত পাড়ায় বিশাল বাড়ি। দুটো গাড়ি। একটি মাত্র সন্তান। পুত্র। এখন বেশ বড় হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে পড়ছে। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে বাবার কাজে সাহায্য করে। স্বামীর গভীর ও আকণ্ঠ ভালবাসা আর পুত্রের নিবিড় শ্রদ্ধাভক্তি দিয়ে গড়া লরার বড় সুখের সংসার। কিন্তু—

বেশ বড় একটা অদৃশ্য কিন্তু আছে সালিভান স্টেইনবেকের আপাত সুখের সংসারে। সেটা হল স্বামীর ওপরে লরার অদ্ভুত টান। সাংঘাতিক আকর্ষণ। মনে হয় যেন সেদিন বিয়ে হয়েছে তার। খামার থেকে একটু দেরি করে ফিরলেই রেগে কেঁদে কেটে অনর্থ করে লরা। সালিভান বিরক্ত হয়। কিন্তু খুব শান্তভাবে ধীরে ধীরে বলে—নতুন ট্রাক্টারটা গোলমাল করছিল লরা—

থামো—থামো—সব সময় তোমার অজুহাত—একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, তোমার ট্রাক্টার আর জমি-ক্ষেতখামার নিয়েই পড়ে থাকবে যদি বিয়ে করেছিলে কেন ?

আর কথা বলে না সালিভান।

তার দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে যায়। অদ্ভুত একটা আক্রোশে তার চোখদুটো দপ দপ করছে। ও কি পাগল হয়ে যাবে ?

হয়েছিল পাগল কিছুদিন পরে। তবে ঠিক পাগল কি ? এখন সেকথা থাক। আগে আর একদিনের ঘটনাটা বলি—

দুপুরে লাঞ্চ করতে এসেছে সালিভান। খাওয়ার পরে ডাইনিং টেবিলে বসেই কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে পাইপে ধূমপান করে। তারপরেই আবার চলে যায় ফার্মে। সেদিন হঠাৎ সামনে দাঁড়াল লরা। তার চওড়া বুকের ভেতরে মাথা ঘষতে ঘষতে বলল, আর তোমার যাওয়া হবে না ডার্লিং, বলেই তার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এল বেডরুমে। পাগলের মত চুমুতে চুমুতে সালিভানের মুখখানা একেবারে আচ্ছন্ন করে দিয়ে কেমন ঝাপসা, অস্পষ্ট কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, বল তো ডার্লিং—কত—দিন—ক—ত কা—ল আমাকে আদর কর না—বলতে বলতেই একটানে খুলে ফেলল ব্লাউজ। অবারিত করল তার বুকের ঐশ্বর্য। কিন্তু যেই স্কার্ট টান মেরে খুলে ফেলে তার অন্তর্বাস সরিয়ে দিতে উদ্যত হল অমনি শক্ত করে হাত দুটো চেপে ধরল সালিভান, কী করছ—কী করছ তুমি—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে,

উত্তেজিত দ্রুত কণ্ঠে বলল, এই দিন-দুপুরে এক্ষুণি জ্যাক এসে পড়বে—

না—না আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না ডার্লিং, বলতে বলতেই তার প্রায় নগ্ন দেহটাকে সালিভানের দেহের ওপরে ঢেলে দিল। তবুও—তবুও সালিভানের প্রৌঢ় রক্তে ঝড় উঠল না। কামনার জ্বালায় জ্বলতে লাগল না চোখদুটো। বরং তার গা-টা রি রি করে উঠল। লরাকে মনে হল, কামনার জ্বরে বিকারগ্রস্থ একটা মাদী জন্তু—

খট—খট—খট—ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে জ্যাক ফিরে এল—

শীগগীর—পাশের ঘরে গিয়ে জামা কাপড় পরে নাও—উত্তেজনায় চিৎকার করে বলল সালিভান—এসে গিয়েছে—বলেই ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে শোনা গেল তার অস্ফুট খেদোক্তি—বাইশ বছরের ছেলের মা—ছিঃ ছিঃ—

অতএব স্বামীর প্রতি শুধু যে অ্যাটাচমেণ্টই ছিল তা নয়। ছিল অতিরিক্তমাত্রায় কামুকও—এই হল লরা। দিনে দিনে তার বয়স বাড়তে লাগল ততই তার মেজাজ তিরিক্ষি হতে শুরু করল। তুচ্ছ কারণে রেগে কেঁদে কেটে নিজের চুল নিজে ছিঁড়ত। তার সেই ইরিটেটিং টেম্পারেণ্টের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠল সালিভান আর জ্যাক।

হঠাৎ হার্টস্ট্রোকে সালিভান মারা গেল। প্রায় আধপাগল লরা এবার একেবারে পুরোপুরি পাগল হয়ে গেল। তবে তার পাগলামির রকমটা ছিল অদ্ভুত।

কারো সঙ্গে একটা কথা বলতে না। যেন বোবা হয়ে গেল। লোকে ভাবল, আহা, বেচারী স্বামীকে বড় ভালবাসত। তাই বড্ড আঘাত পেয়েছে। টেম্পোরারী শক—সব দুদিনেই ঠিক হয়ে যাবে—

কিন্তু হল না। একমাস পেরিয়ে গেল। কোন উন্নতি তো হলই না। বরং পরিষ্কার পাগলামির লক্ষণ দেখা দিতে লাগল। অকারণে হেসে গড়িয়ে পড়ে। আবার কখনো বা রোশে, ক্ষোভে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে রক্ত ঝরিয়ে ফেলে। আর বেশির ভাগ সময় সে গুম মেরে বসে থাকে। কিম্বা শুধু জোরে জোরে পা ফেলে পায়চারি করে। রক্তজবার মত দুটো চোখে কেমন উদভ্রান্ত দৃষ্টি। মনে হয়, তীব্র কোন যন্ত্রণায় তার ভেতরটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।

অনেকবারই ডাক্তার দেখিয়েছে জ্যাক। তাঁরা যে যাঁর মত অনেক ওষুধ বিষুধই খাইয়েছেন। কোন ফল হয়নি। তাই এবার জ্যাক নিয়ে এল ফিলাডেলফিয়ার সবচেয়ে বড় ডাক্তার—সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানী এবং উন্মাদ রোগবিশেষজ্ঞ—ডক্টর কপশিন।

ডাক্তারবাবুর লম্বা চওড়া চেহারা। তার ধারালো মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির দিকে তাকিয়ে মনে হল, লরা যেন ভয়ে কুকড়ে গেল।

তার চোখদুটোর দিকে তীব্র স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল কপশিন।

আপনার কি অসুবিধা, কি কষ্ট বলবেন ম্যাডাম।

আমি সবসময় সালিভানের গলার স্বর শুনতে পাই ডাক্তারবাবু, আশ্চর্য নরম আর করুণ গলায় বলল লরা।

হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, জাকিও বলল, বাবা ডাকছে মনে করে কখনো ছাতে কখনো নিচে সিঁড়ির ঘরে দাপাদাপি করে ছুটে বেড়ায় মা—

তাকে হাত তুলে থামতে ইঙ্গিত করল ডাক্তারবাবু।

এ বাড়িতে থাকলে আমি বাঁচব না ডাক্তারবাবু, লরার কথাগুলো কান্নার মত শোনাল।

ডক্টর কপিশন চিন্তামগ্ন হল ঃ পেশেণ্ট মোস্ট নরম্যাল। চোখের দৃষ্টিতে এবং কথাবার্তার ভেতরে নেই এতটুকু অসংলগ্নতা। শুধু Association of remniscence…এই বাড়ির সঙ্গে জড়ানো তার স্বামীর স্মৃতিই ওঁর কাছে শকিং—

অতএব লরার আড়ালে জাকিকে বলল ডাক্তার, সমুদ্রের ধারে কি পাহাড়ের কোন নির্জন জায়গায় মাকে নিয়ে গিয়ে কিছু দিন ঘুরে আসুন—কয়েকমুহূর্ত কি ভেবে আবার যেন নিজের মনকেই শুনিয়ে বলল, যদি ইমপ্রুভ না করে—আমাকে খবর দেবেন।

কিন্তু ডক্টর কপিশনের বুঝতে অনেক বাকি ছিল। থাক সে কথা—আগে ঘটনাটা শুনুন—

সমুদ্রের ধারে একটা সুন্দর বাংলো প্যাটার্নের বাড়িতে লরাকে নিয়ে এল জাকি। বারান্দা থেকেই দেখা যায় ধু ধু নীল সমুদ্র। নীল আকাশ। দূরে থেকে ভেসে আসা পাখির ডাক—সব মিলিয়ে অপূর্ব।

লরা খুব খুশি। জাকি আরও খুশি—মা এবার সুস্থ আর স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। ডক্টর কপিশনের অ্যাডভাইসে জায়গা বদল করে যে এতটা ফল পাওয়া যাবে—ভাবতে পারেনি সে। কিন্তু—

মানুষের জীবনের গুটিগুলো নিয়ে যিনি চাল দিয়ে চলেছেন তিনি নিশ্চয়ই হেসেছিলেন। চার-পাঁচ দিন পরেই হঠাৎ কি যে হল, কে জানে, আবার আগের মত নিদারুণ আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল লরা। দৌড়ে এল জাকি, এল গভরনেস। কিন্তু কেউ আর তাকে শান্তই করতে পারল না। শুধু তাই নয়—

দিনের পর দিন আরো উদ্দাম—আরো ভয়ানক হয়ে উঠল লরা। আগে দিনে চারপাঁচবার ক্ষেপে উঠত। এখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় মাথায় ছাঁটা ওঠে। পায়ের শ্লিপার খুলে নিজের গালে চটাস চটাস করে মারতে থাকে। কেউ বাধা দিতে এলে ফল আরও খারাপ হয়। ব্লাউজ আর স্কার্টের বোতাম পট পট করে ছিঁড়ে একেবারে উলঙ্গ হয়ে যায় ছেলের সামনেই।

দারুণ দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেল জাকি। মাকে নিয়ে এই অবস্থায় সে ফিলাডেলফিয়াতে ফিরবে কি করে। মাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে গেল

লোক্যাল ডাক্তারের কাছে। এসে দেখল, অমন শক্ত দড়ির বাঁধন খুলে ফেলে দিয়ে 'স্টার্ক নেকেড' হয়ে ঘুরছে মা।

ওঝা এল।

স্থানীয় ডাক্তারও এল।

তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি দিয়ে লরাকে অনেকক্ষণ দেখে ওঝা বলল, মনে হয় কোন ভয়ানক দুষ্ট প্রকৃতির প্রেতাত্মা ভর করেছে—

আর আধুনিককালের তরুণ ডাক্তার পেশেন্টের কেসহিস্ট্রি পড়েই একটুও চিন্তা না করে বলল, ফিলাডেলফিয়াতে নিয়ে গিয়ে ইলেকট্রিক শক দিন—সব ঠিক হয়ে যাবে—

এসব ১৮৬৬—৬৭ সালের ঘটনা।

ঠিক যখন ইলেকট্রিকের জনক ফ্যারাডেসাহেব দুনিয়ার মানুষকে তাদের সভ্যতাকে জোর কদমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা সাংঘাতিক উপকরণ—'বিদ্যুত' উপহার দিয়ে সবে দেহ রেখেছেন, যখন বৈদ্যুতিকশক্তি অনেক কাজেই অসাধ্য সাধন করছে—সেই সময় লরার মানসিক রোগ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল মনোবিজ্ঞানী চিকিৎসকেরা। আর এখন কেই বা বলতে পারে, ফিলাডেলফিয়ার এই পেশেন্ট মিসেস লরা স্টেইনবেককে কেন্দ্র করেই হয়ত পৃথিবীতে প্রথম শুরু হয়েছিল, ইলেকট্রিক শক ট্রিটমেন্ট।

মাস্টারমশাই, আপনি তো শিক্ষক—আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ইতিহাসের সেই চিরন্তন নিয়ম—সাবেকদিনের পূর্বসূরীদের কেউ মনে রাখে না। শুধু তাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফসলটুকু নিয়ে লোকে মাতামাতি করে। ডঙ্কানিনাদ করে তারই প্রচার হয়। আর সেই সমারোহে হারিয়ে যায় গবেষক।

ইলেকট্রিক শক ট্রিটমেন্ট কে প্রথম শুরু করেছিল জানা যায় না। ইতিহাসে শুধু আছে ইলেকট্রিক শক ট্রিটমেন্টের আর এক নাম—ইলেক্ট্রোকনভালসিভ থেরাপী বা সংক্ষেপে ই. সি. টি.। ই. সি. টির ইতিহাস শুরু হয়েছিল সেদিন থেকে যেদিন প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল বাইরে থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি চার্জ করে ব্রেনের সূক্ষ্ম কর্মকাণ্ডের কিছুক্ষণের জন্য বা স্থায়ীভাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে—কিন্তু—

ব্রেনের চিকিৎসায় ইলেট্রিক চার্জ কে প্রথম প্রয়োগ করেছিল জানা না গেলেও ফিলাডেলফিয়ার প্রবীন মনোবিজ্ঞানী—ডক্টর কাপশনই হয়ত প্রথম লরার মাথায় ইলেকট্রিক শক দিয়ে ট্রিটমেন্ট করেছিলেন তার বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় তাঁর নিজের জবানীতে বলা বিবৃতিতে—

আমি আমার চিকিৎসক জীবনের গোড়া থেকেই পাগলদের ট্রিটমেন্ট করে আসছি। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার—অনেক উন্মাদ রোগীর ব্রেন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি, বিকলতা বা কোন বিকৃতি পাইনি। সুস্থ একটা মানুষের ব্রেনের সঙ্গে পাগলের ব্রেনের নেই এতটুকু পার্থক্য। তাহলে

এই ভয়াবহ ব্যাধির মূলে কি ?

রক্তদুষ্টি বা টকেসমিয়া ।

কিন্তু টকেসমিয়া হল কেন? তার কোন ব্যাসিলি অনুসন্ধান করেও পাইনি। তবে অনেকদিনের অভিজ্ঞতায় আমার মনে হয়েছিল মানুষের ব্রেনের বাঁদিক—যেটা ডমিন্যাণ্ট পার্ট বা প্রধান অংশ, যেখানে বুদ্ধিবৃত্তি এবং কথা বলার নানা সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রপাতি থাকে সেখানকার কোষগুলো টকেসমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বিকল হয়ে যায়। ব্রেনের ছোট খাটো অংশ বা পার্টসগুলো জট পাকিয়ে যায়। ঠিক সেইখানে—সেই জটের ওপরে যদি প্রচণ্ড একটা ধাক্কা বা শক দিয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন তোলা যায়, তাহলে রোগীর উপকার হতে পারে। কিন্তু দারুণ শক্তিশালী সেই শক এমন হবে রোগীর প্রচণ্ড খিঁচুনি বা কনভালসান শুরু হবে, বা তড়কার মত হবে, হবে স্নায়বিক আক্ষেপ। পেশেণ্টের ভেতরে দারুণ কনভালসান করিয়ে দিতে পারে, আমাদের শাস্ত্রে আছে এমন একটা ওষুধ—

পেণ্টিলেনিটেট্রাজল ।

এই অদ্ভুত ওষুধটির 'এফেক্ট' একটু বলা দরকার। রোগীকে এই ওষুধটি খাওয়ানোর কিছুক্ষণ পরেই শুরু হয়ে যায় তার প্রচণ্ড অস্থিরতা। কখনো হাতদুটো মুঠো করে দাঁত কিড়মিড় করে, আবার কখনো বা থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে এলিয়ে পড়ে। লালা গড়িয়ে পড়ে মুখের দুপাশ দিয়ে অর্থাৎ এক কথায় কনভালশান! কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পেশেণ্ট শান্ত হয়ে যায়। তারপরে—লক্ষ্য করা যায়, তার মাথার অনেক উপকার হয়েছে—হতাশা নেই, অসংলগ্ন কথা নেই, নেই অস্বাভাবিক ব্যবহার—মনোবিকলনের কোন চিহ্নই নেই। অতএব—

অতএব আমার পেশেণ্ট মিসেস লবা স্টেইনবেক-কে দেব পেণ্টিলেনিটেট্রাজল। দিতে হবে। সব ঠিক। হঠাৎ এমন সময়—

লণ্ডন থেকে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে ঘোষণা করা হল—পেণ্টিলেনিটেট্রাজলের যে এফেক্ট, অবিকল সেইরকম ফল পাওয়া যায় পেশেণ্টের মাথায় ইলেকট্রিক শক দিলে! অবশ্যই ঠিক কতটা পরিমাণ বৈদ্যুতিক প্রবাহ দিলে রোগীর মাথার এবং দেহের ক্ষতি হবে না—তার পরিমাপ দেওয়া ছিল। তাই কোন অসুবিধাই হল না।

ইলেকট্রিক শক দিলাম।

পেশেণ্ট সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

ইলেকট্রোকনভালসিভ থেরাপী। বা—

ইলেকট্রিক শক ট্রিটমেণ্ট সম্বন্ধে আরও খুঁটিনাটি জানা গেল জনৈক ফ্র্যাঙ্ক জেমসের চিকিৎসার সময়। জেমসের জার্মান ডাক্তার—কিন্তু—ওয়াশিংটনের স্থায়ী বাসিন্দা, ডক্টর জিবেনের ডায়েরী থেকে এখানে হুবহু

তুলে দেওয়া হল তাঁর চিকিৎসার এবং রোগীর কেস হিস্ট্রির বিস্তারিত বিবরণ—

আঠারো বছরের দামাল ছেলে। ফ্রাঙ্ক জেমস। বড়লোকের ছেলে। সুন্দর স্বাস্থ্য। অতএব হাসিখুশি যে হবেই তাতে আর আশ্চর্য কি! দিনরাত মটরবাইকে চেপে ভট ভট শব্দ তুলে টোটো করে ঘুরে বেড়ায়। এটাই তার 'হবি' কিন্তু—

সেই মটরসাইকেলই হল তার কাল। একদিন বুঝি ওয়াশিংটন থেকে দূরে কোথাও যাচ্ছিল। একটা ট্রাকের পাশ কাটাতে গিয়ে ছিটকে পড়ে গেল রাস্তায়। প্রচণ্ড চোট পেল। কিছু রক্তপাতও হল। সেখানকার ডাক্তারবাবু একটা ব্যাণ্ডেজ করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে বলেছেন—ইণ্টারন্যাল হেমারেজ হচ্ছে কিনা বলতে পারব না—ওয়াশিংটনে বড় ডাক্তার দেখাবেন—

অদৃশ্য রক্তক্ষরণ নয়। হল আরও বড়, আরো আরো অদ্ভুত একটা ব্যাপার, যে ছিল শান্ত বিনীত ও নম্র এবং অমায়িক, সে আমূল পাল্টে গেল। হয়ে উঠল দুর্বিণীত, অভদ্র এবং লোফার। শেষ পর্যন্ত চুরি ডাকাতি করতে শুরু করল। একবার কোথায় ছিনতাই করতে গিয়ে ধরা পড়ল। পুলিশ অল্পবয়স বলে রিফর্মেটরী জেলে পাঠালো। ছয়মাস জেলের ঘানি ঘুরিয়ে এসেও যে কে সেই। স্বভাব একটুও বদলালো না। শেষে পাগল হয়ে গেল। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ।

"সেই অবস্থায় আমার চেম্বারে এসেছিল ফ্রাঙ্ক। তার বাবা মিঃ জেমস নিয়ে এসেছিল—ডায়েরীতে লিখেছেন ডক্টর জিবেন—তার হাত দুটো লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা। চোখদুটো জবাফুলের মত লাল। আর সেই চোখে হিংস্র দৃষ্টি। আর যেন কঠিন কোন যন্ত্রণার পীড়নে মুখখানা কেমন বিকৃত আর কুৎসিত হয়ে উঠেছে।

তোমার কষ্ট কি?

কিছু না—কিছু না—যেন যন্ত্রণায় কঁকিয়ে চিৎকার করে ফ্রাঙ্ক বলল, আমার হাতের বেড়ি খুলে দিন—আমাকে ছেড়ে দিন—

ছাড়া পেলে তুমি কি করবে?

যাকে সামনে পাব খুন করব—রক্তের নদী বইয়ে দেব—উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল ফ্রাঙ্ক।

মিঃ জেমস তার কেস হিষ্ট্রিটা (যা আগে বলা হয়েছে) আমাকে আস্তে আস্তে বলে থেমে গেলেন। আবার বেশ কিছুক্ষণ অনেক ইতস্তত করে বললেন, আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বলি, দুএকজন সিনিয়র ডাক্তার বলছেন মটরসাইকেল থেকে পড়ে যখন মাথা জখম হয়েছিল তখুনি কোন ক্রিমিন্যালের স্পিরিট ওর ওপর হয়ত ভর—

নো—নো, অ্যাবসার্ড, আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, স্পিরিট পজেশানের কেস নয় মিঃ জেমস। বললাম বটে। কিন্তু জেমসের কথার ভেতরেই পেয়ে গেলাম একটা সাংঘাতিক ক্লু—

মটরসাইকেল থেকে পড়ে যেয়ে মাথায় চোট খাওয়ার আগে যে ছিল ভদ্র, নম্র, বিনীত সে যদি আঘাত পাওয়ার পরেই সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে তাহলে অবিকল এরকম একটা ধাক্কা বা শক তার মাথায় দিলে সে আবার তার পুরানো স্বভাব ফিরে পেয়ে সুস্থও তো হয়ে যেতে পারে। রোগীর অভিভাবককে কিছুই বললাম না। শুধু কয়েকদিন পরে পেশেণ্টকে নিয়ে এবং হাতে সময় নিয়ে আসতে নির্দেশ দিলাম—

আমার মনে হয়েছিল, মাথায় চোট পেয়ে একটা ভয়ের কমপ্লেক্স—একটা অবসেসানের জন্ম হয়েছে পেশেণ্টের মনে এবং সেটাই হল তার আমূল বদলে যাওয়ার কারণ। অতএব যদি ঐ অবসেসানটাকে কোনভাবে তাড়ানো যায়। যাক সেসব কথা।

নির্দিষ্ট দিনে ঠিক সময়ে পেশেণ্ট এল।

মিঃ জেমসকে বাইরে বসতে বলে পেশেণ্টকে চেম্বারে নিয়ে এলাম। আমার অ্যানেসথেটিস্টকে ইঙ্গিত করতেই সে রোগীকে অ্যানেসথেসিয়া প্রয়োগ করতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পরেই সে অজ্ঞান হয়ে গেল। পেশীগুলো এলিয়ে দিয়ে পড়ে রইল। আর এই সময়টাই হল ইলেকট্রিক শক দেওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়—Most appropriate time। ১৫০ ভল্টের বিদ্যুত প্রবাহ ২০০ থেকে ৫০০ মিলিয়ন পিয়ারসে (ইলেকট্রিকের ইউনিট) মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্য চার্জ করলাম। চার্জ ফ্রাংকের ব্রেনের ডানদিকে। যদিও বাঁদিকে ডোমিন্যাণ্ট পার্টস (আগে বলা হয়েছে)। কিন্তু এই একদিকে বা ওয়ানসাইডেড ইলেক্ট্রোকনভালসিভ ট্রিটমেণ্টের মজা হল—মাথার বাঁদিকে বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের—যেখানকার সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রপাতি থেকে তৈরি হয় স্মৃতিভ্রংশ, ধৈর্যচ্যুতি, অসংলগ্ন ব্যবহার অর্থাৎ পাগলামি তাদের প্রকোপ কমিয়ে দেয়।

সপ্তাহে মাত্র চারবার ঠিক ঐভাবে এবং সেই পরিমাণে বৈদ্যুতিক চার্জ করতেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল ফ্রাংকস।

মাস্টারমশাই ওঝার বিষয়টিতে এইখানেই ছেদ টেনে দিতে পারতাম। উত্তর ইউরোপ, ইংল্যাণ্ড থেকে শুরু করে জার্মানী, ইটালী পৃথিবীর নানা দেশের এবং ভারতীয় ওঝাদের নিয়ে অনেক আলোচনাই তো হল। কিন্তু—

মানসিক ব্যাধির সঙ্গে ওঝা ওতপ্রোত জড়িত বলেই বলা দরকার প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডক্টর ব্রুকস এবং ডক্টর অ্যাণ্ড্রু উইলসনের ব্রেন ডিজিজের বা মস্তিষ্ক বিকৃতি—সম্বন্ধে নতুন থিওরী সুদীর্ঘকাল গবেষণা করে ব্রুকস-সাহেব জানিয়েছেন, মানুষের ব্রেনের অত্যন্ত প্রত্যন্ত প্রদেশে এমন কতগুলো অরগ্যান বা যন্ত্র আছে যাদের অ্যাক্টিভিটি বা কার্যকারিতা জানেই না শরীরবিদ্যার সাধারণ মনোবিজ্ঞানীরা। এই সম্পূর্ণ অজানা যন্ত্রগুলো সম্বন্ধেই ডক্টর অ্যাণ্ডু উইলসন জানিয়েছে একটি অভিনব তথ্য—মস্তিষ্কের এই গহন

প্রদেশের একটি অরগ্যান হল—শঙ্কুর মত আকৃতি, মসৃণ গোলাকার তলবিশিষ্ট, চোখের মতই তার গঠন সৌকর্য—নাম পিনিয়্যাল গ্ল্যাণ্ড বা থার্ড আই। হয়ত আমাদের অতীত বংশধর গরিলা এবং বানরদের একসময় এই তৃতীয় চোখ ছিল। মাছেদের মাথার ওপরে যে আর একটি চোখ বা মধ্যমা ছিল—সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছর আগে, কোন সুদূর প্রস্তরযুগে আমাদের পূর্বসূরীদেওর থার্ড আই ছিল কিনা—সেটা দুরূহ ও বিপদ সঙ্কুল দীর্ঘ গবেষণার বিষয়।

এসব কথা বলে উইলসন এবং ডেসকার্টসও জানিয়েছেন, এই তৃতীয় চোখই কিন্তু আত্মার আবাসস্থল—This gland is the physical seat of the soul, মস্তিষ্কে বিকার দেখা দিলে এই পিনিয়্যাল গ্ল্যাণ্ডেই দেখা দেয় সব চেয়ে বড় বিপর্যয়…

মাস্টারমশাই, আশা করি মানবসভ্যতার প্রায় সমবয়সী ওঝাদের তাৎপর্য বুঝতে পেরেছেন। কেমন করে তাদের সৃষ্টি হয়েছিল, কি তাদের মন্ত্রশক্তি এবং জটিল কলাকৌশলের রহস্য ইত্যাদি কিছুটা আপনার কাছে পরিষ্কার হলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

কিন্তু মাস্টারমশাই! আপনি শিক্ষক বলেই জানা দরকার, বা জেনে রাখা উচিত—মানুষের মনস্তত্ব তথা তার মানসিক বিশৃঙ্খলা, মনোবিকলন তার অবসাদ, বিষাদ, বিকৃতি অর্থাৎ মানসিক রোগের প্রতিকার নিয়ে দুনিয়ার তাবড় তাবড় চিন্তাশীল মনীষিরা মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন খৃষ্টের জন্মের আড়াই হাজার বছর আগে থেকে। চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াস (৫৫১—৪৭৯ খৃ: পূ:) বলেছেন কোনরকম উত্তেজনা বা সংঘাতের ভেতরে না গিয়ে চারিদিকে সামঞ্জস্য রেখে (Balance এবং Harmon) শুদ্ধ এবং ছন্দোময় জীবন কাটাতে হবে। তারও আগে মিশরের চিকিৎসক ইমহোটেপ জানিয়েছেন মনের রোগের একমাত্র ওষুধ হল—ঘুম।

তারও অনেক—অনেক, প্রায় ছয় হাজার বছর আগে প্রাচীন দিনের ইতিহাস বিশেষজ্ঞদের মতে মানবসভ্যতা পৃথিবীর যেখানে প্রথম চোখ মেলেছিল সেই তাইগ্রীস আর ইউফ্রেতিস নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ড—মেসোপটেমিয়াতে মস্তিষ্ক বিকৃতির ওষুধ (Psychosomatic) অজানা ছিল না। এই ওষুধ হল ব্যাবিলনের, ইজরাইলের ধর্মগুরু এবং যীশুখৃষ্টের সমসাময়িককালের খৃষ্টান পুরোহিতদের দৈবওষুধ। যে কোন রকমের মানসিক অসুস্থতার জন্য তারা দায়ি করত শয়তান বা অশুভ শক্তিকে। আর সেই অদৃশ্য শয়তানকে তারা বিতাড়িত করত মন্ত্রবলে এবং ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠান করে—

মাস্টারমশাই এই যাদুশক্তি, দৈবওষুধ, অশুভশক্তির কার্যকারীতার প্রতি গভীর বিশ্বাস এই ধ্যানধারণা, এই ঐতিহ্য বহু—বহু যুগের ব্যবধান পেরিয়ে এই রকেট অ্যাটমের যুগে এসেও আজও অব্যাহত আছে আধুনিক

কালের দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসী সোনাদের ভেতরে।

সোনাদের ওঝাকে বলা হয়—'নাগাঙ্গা' (Nganga) দক্ষিণ রোডেশিয়ার সরকারী ডাক্তার মাইকেল জেলফ্যাণ্ড লিখেছেন "আমি একটানা ষোলবছর ধরে সোনাদের ভেতরে কাজ করেছি। তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করেছি—খুব কাছে থেকে দেখেছি তাদের প্রতিদিনের বিচিত্র জীবনচর্যা।

সোনাদের সমাজে ওঝা বা নাগাঙ্গারা যে কেন প্রায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মহিমাতেই বিরাজ করে থাকে তা বুঝতে পারবেন এই ঘটনা থেকে—

ঝাপড়া উইলো গাছের নিচে পঞ্চায়েতের বৈঠক বসেছে। গ্রামপ্রধান বৃদ্ধ নাগাঙ্গা আসর আলো করে বসে রয়েছে। তার পরণে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলানো লাল টকটকে জোব্বা। তার ভেতরে ভেতরে রুপোলী রাংতার চমকি বসানো। গলায় দুলছে রঙ বেরঙের কড়ির মালা। সেই মালার নিচে লকেট হয়ে শোভা পাচ্ছে কোন মরা জন্তুর হাড়। হয়ত ওটাই নাগাঙ্গার যাদুশক্তির উৎস। তার মাথায় ধনেশ পাখির পালকের টুপি।

নাগাঙ্গা গাঁয়ের লোকের এক একজনের এক একটা সমস্যার কথা খুব মন দিয়ে শুনছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বাতলেও দিচ্ছে সেই মুস্কিল আসানের উপায়।

আমি এককোণে বসে শুনছি। খুব ইণ্টারেস্টিং এক একটা কেস। হঠাৎ ভিনগাঁয়ের একটা উটকো লোক দলবল নিয়ে সেখানে এল।

নাগাঙ্গার কোঁচকানো চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ন হয়ে উঠল। কয়েকমুহূর্ত সেই মানুষটার আপাদমস্তকে সেই দৃষ্টির সূঁচ বিঁধিয়ে মাথা নিচু করল। যেন ধ্যানমগ্ন হল। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে আসরেব সবাইকে শুনিয়ে হেঁকে বলতে লাগল, তোমরা শুনছ, এই লোকটার নাম—কয়াসি। ওর গ্রামের নাম কাটমুর—

মতলবটা কি ?

বলছি—বলছি। একটু সবুর কর, একটুক্ষণ কি ভেবে নাগাঙ্গা বলল, এই লোকটার একটা খুব দরকারী জিনিস চুরি গিয়েছে, ও তার একটা ফয়সালা করতে এসেছে আমার কাছে, থামল সে। আবার লোকটাকে ইঙ্গিত করে বলল, কি রে সব ঠিক ঠিক মিলেছে কি না।

কয়াসি কথা বলল না। বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় তার চোখদুটো অগাধ হয়ে উঠল। সমবেত জনতাও নিস্তব্ধ। তাদের মুগ্ধ দৃষ্টি। আমিও অবাক হয়ে ভাবছিলাম, দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রামের নিরক্ষর এক নাগাঙ্গার কী অসাধারণ দিব্যদৃষ্টির শক্তি—(Power of clairvoyance) লোকটাকে দেখেই বলে দিল তার নাম, কেন এসেছে—আশ্চর্য।

কি করে চুরি হল বল ?

ওই হাতিয়ারটা দিয়েই আমি মাঠে কাজ করছিলাম। যেই একটু দূরে কুয়ো থেকে জল খেতে গিয়েছি—ফিরে এসে দেখি—নেই বলতে বলতে একেবারে ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল কয়াসি। কান্নাজড়ানো গলায়

বলল, বাঁশের হাতল লাগানো কোদাল এই সেদিন বাজার থেকে—কান্নার দমকে আর বাদবাকী কথা বলতে পারল না।

হাত তুলে তাকে থামতে ইঙ্গিত করে নাগাঙ্গা বলল, এবার বল কি চাস তুই ?

দয়া করে তুমি মন্ত্র করে বের করে দাও আমার কোদাল। কোন গাঁয়ের কোন চোর নিয়েছে সেটা, বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল কয়াসি, কোথায় লুকিয়ে রেখেছে আমার কোদাল—

তুমি যদি যাদুবলে কয়াসির কোদালটা বের করে দিতে পার, কয়াসির সঙ্গীরা বলল, তাহলে তোমাকে মোটা বখশিষ—

ওসব পরের কথা, আগে ওর হাতিয়ারটা তো উদ্ধার করি, বলেই উঠে দাঁড়াল নাগাঙ্গা। ঘনায়মান সন্ধ্যার রাশি রাশি তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন অনেক দূর থেকে বলল, এস আমার সঙ্গে—

শুরু হল অভিযান।

রাতের ঘন অন্ধকারে গ্রামের মেঠো পথ ধরে সবচেয়ে আগে চলেছে নাগাঙ্গা। ঠিক তার পিছনে কয়াসি। তারপর তার সঙ্গীরা, আর তারপরে আশেপাশের আরও পাঁচ-দশটা গ্রামের কৌতুহলী এক একজন মানুষ ঠিক পর পর সুদীর্ঘ এক সরলরেখায় মিছিল করে চলতে লাগল অজানা সেই গ্রামের উদ্দেশ্যে।

কারো মুখে একটা কথা নেই।

আমার মনে হল—মনে হয়েছিল, হয়ত নাগাঙ্গারই যাদুশক্তির প্রভাবে নিস্তব্ধ সেই বিশাল শোভাযাত্রা রাত্রির অন্ধকারে কোন রাজ্য জয় করতে চলেছে।

প্রত্যেকের মনের ভেতরটা যন্ত্রণায় চিন চিন করে জ্বলে যাচ্ছে—কোথায় কতদূরের গ্রামে যাচ্ছে নাগাঙ্গা ; সেখানে কি কয়াসির কোদালটা পাওয়া যাবে—চোরকে হাতে নাতে কি ধরা যাবে ?

এইখানে থাম সব—সামনের ঘন থকথকে অন্ধকার ফুঁড়ে যেন ভেসে এল নাগাঙ্গার কণ্ঠস্বর।

থেমে গেল মিছিল। কয়াসি দেখল, তারই পাশের গ্রাম—জাদুমারু। সে কিছু বলার আগেই নাগাঙ্গা তাদের নিয়ে এল বিশাল এক গমের ক্ষেতের পাশে এঁদোজলের একটা ডোভার ধারে। সেই ডোভার পাড়ে একটা আলগা মাটির উঁচু ঢিবির দিকে ইঙ্গিত করে ঘোষণা করল—এইখানে—এইখানেই কয়াসির কোদালটা পুঁতে রেখেছে—

কি ব্যাপার—কি ব্যাপার—কি হয়েছে ? সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ছুটে এল জাদমারুর মোড়ল। তাকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে নাগাঙ্গা তাকে অনুরোধ করল, তোমার সামনেই জায়গাটা খোঁড়া হবে—তুমি সাক্ষী থাকবে—হঠাৎ থেমে গেল সেই অলৌকিক শক্তিধর নাগাঙ্গা।

কেরোসিনের ডিবের ছায়া কাঁপা নিভু নিভু আলোয় জনতার অস্পষ্ট জটলার ভেতরে ঘুরে ঘুরে কাকে যেন খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—এই যে পেয়েছি—বলেই সাপের মত হিলহিলে চেহারার একটা লোকের ঘাড় ধরে হিঁড় হিঁড় করে টেনে নিয়ে এসে জাদমারুর মোড়লের পায়ের কাছে ফেলে দিল।

সত্যিই আশ্চর্য! সেই মাটির ঢিবিটা খুঁড়তেই বেরিয়ে পড়ল সেই পাকা বাঁশের হাতল লাগানো কোদাল! সেই লোকটার দিকে ইঙ্গিত করে গম্ভীর হয়ে বলল নাগাঙ্গা—ও—ই কয়াসির কোদাল চুরি করেছিল—

জাদমারুর মোড়ল একটা কথা বলতে পারল না। কাটমারুর নাগাঙ্গার সাংঘাতিক যাদুশক্তি—বড় শক্ত ঠাঁই। কথা বলবে কি? ধরা পড়া লোকটাও আর উচ্চবাচ্য করল না। অপরাধ স্বীকার করল।

কয়াসি কোদাল ফিরে পেল।

জাদমারুর মাতব্বর চোরকে জরিমানা করল পঞ্চাশটাকা মত। আর সেটাই হল নাগাঙ্গার ফি!

আরো একদিন।

কাটমারুর নাগাঙ্গার কাছে এল এক মাঝবয়সী সোনা মহিলা। কোলে একটা বাচ্চা। বছর দেড়েক বয়স হবে।

আমার ছেলেকে বাঁচাও—বাঁচাও—নাগাঙ্গা—তোমার পায়ে পড়ি, কাঁদতে কাঁদতে তার পায়ের ওপরে আচড়ে পড়ল স্ত্রীলোকটি।

কি হয়েছে বলবি তো?

শুকনো কাশি—নাগাঙ্গা—ভীষণ শুকনো কাশি। ঘুমায় নি। কাশতে কাশতে গলা চিরে রক্ত—

হাত তুলে থামতে বলল নাগাঙ্গা। তার সামনে বাচ্চাটাকে শুইয়ে দিতে ইসারা করল। শিশুটির বুকে কান পেতে, কে জানে, হয়ত কাশির সাঁই সাঁই শব্দ কিম্বা হৃদপিণ্ডের ধুকধুকি শুনতে চেষ্টা করল নাগাঙ্গা। তার হাত পা টিপে টিপে বেশ কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে চাপা গলায় ফিস ফিস করে তার অ্যাসিস্ট্যাণ্টকে কি যে বলল নাগাঙ্গা।

সেই সহকারী তখুনি ছুটল জঙ্গলের দিকে। আর একটু পরেই তুলে নিয়ে এল একটা অজানা গাছের শিকড়। নাগাঙ্গার নির্দেশে সে শিকড়টা গুঁড়ো করে একটা পাত্রে রেখে তার ভেতরে একটু জল দিল। সেই মিকশ্চারটা আবার বাচ্চার খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে আমার সামনেই খাইয়ে দিল।

শিকড়টার কি নাম?

গুয়েনডোরি, নাগাঙ্গা গম্ভীর হয়ে বলল আরও অনেক—অনেক নাম আছে সাহেব।

আমি পরে জেনেছিলাম শিকড়টার নাম—অ্যাসক্লিপিয়াস।

অসুস্থ বাচ্চাটার দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বলল নাগাঙ্গা, তার মাকে—শোন এই ওষুধ সকাল—সন্ধ্যা দুবেলা খাওয়াবি দুইদিন হঠাৎ থেমে

গেল। আবার মনের ভেতরে আরো হাজারটা ওষুধের নাম নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, যদি না কমে, তাহলে ওষুধ বদলে দেব—

দুদিন কেটে গেল।

কাঁদতে কাঁদতে এল মেয়েটি। বলল নাগাঙ্গাকে—একটুও কমেনি কাশি।

তার বিবরণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনে এবার নাগাঙ্গা তাকে দিল 'চিপারিওয়াঙ্গোয়া' গাছের শিকড় (উদ্ভিদবিদ্যায় তার নাম—ডরিরিয়া ডিব্রাচিয়াটা)।

তার—পরদিনই—

সুস্থ হয়ে গেল বাচ্চাটি—এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে ডক্টর মাইকেল জেলফ্যাণ্ড লিখেছেন, এই হল দক্ষিণ আফ্রিকার ওঝা বা নাগাঙ্গা। তারা অসুখে বিসুখে ডাক্তার, ধর্মীয়, কাজে পুরোহিত, চুরি ডাকাতি বা অসামাজিক কার্যকলাপের তদন্তে এবং অপরাধ দমনে পুলিশ, এবং মাঠে মাঠে অপর্যাপ্ত ফসলের প্রাচুর্য সৃষ্টিতে অলৌকিক শক্তিধর। সোনাসমাজে নাগাঙ্গার প্রয়োজন বড় মর্মান্তিক।

ইউরোপীয় সমাজে নাগাঙ্গাদের মত এমন কোন মানুষ নেই যাঁর কাছে মানুষ যে কোন অসুবিধায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে! European soceity has no one quite like the Nganga an individual to whom people can turn in every difficulty.···

আরও লিখেছেন নাগাঙ্গারা যেমন বনৌষধি বিশেষজ্ঞ বা হারব্যালিস্ট তেমনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং ভূতপ্রেত বা অশুভশক্তির প্রতিরোধে বিশেষজ্ঞ। যতদিন সোনাদের ডাইনী এবং ভূতপ্রেত পিশাচের ওপরে বিশ্বাস থাকবে ততদিন নাগাঙ্গাদের অস্তিত্ব থাকবে···

মাস্টারমশাই, ডক্টর জেলফ্যাণ্ডের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসী সোনাদের নাগাঙ্গারা হাজার হাজার বছর আগের সভ্যতার সেই আদিকালের মেসোপটেমিয়ার পুরোহিত বা ওঝাদেরই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে আজও।

চিঠিটা দীর্ঘ হয়ে গেল। নমস্কারান্তে—

পঞ্চম প্রেতমণ্ডল

> Varieties of ghosts are perhaps the oldest and most sophisticated of all human skills... Leadbeater.
>
> —হয়তো নানারকমের প্রেতের কল্পনাই মানুষের প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে জটিল শিল্পনৈপুণ্য—

মহাশয়,

আমি কলকাতা থেকে বহুদূরে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে পাণ্ডাপাড়ায় এক সামান্য গ্রামসেবিকা। আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন।

প্রেততত্ত্বের ওপরে বিশেষ করে বিভিন্ন শহরের ভুতুড়ে বাড়ি নিয়ে লেখা বইগুলো খুব যত্ন নিয়ে পড়েছি। আর তখুনি মনে হয়েছে, আপনি আমার কৌতূহল নিরসন করতে পারবেন। অনেক—অনেকদিন ধরে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে গরীব, মূর্খ, হাজারো রকমের অন্ধ কুসংস্কারের ডিপো এই মানুষগুলোর মুখে শুনেছি—ভূতপেত্নী, শাকচুন্নি, পিশাচ, কন্দকাটা, খেচর, আলেয়া, দানোভূত, ব্রহ্মদৈত্যি ইত্যাদি আরও কত রকমের ভূতের কথা।

ভূত আছে কিনা, প্রেতাত্মার অস্তিত্বই আদৌ আছে কিনা—সেটাই যেখানে রহস্যের অন্ধকারে ঘেরা সেখানে এত রকমের ভূতের কথা—প্রেতের এত ক্ল্যাসিফিকেশনের কথা ওঠে কি করে? সত্যিই কি বিভিন্ন শ্রেণীর ভূতকে। অর্থাৎ ভূতদের ভেতরে জাতিভেদ আছে? না কি সবটাই মানুষের মনগড়া? ভূতের কুলপঞ্জিকা সম্বন্ধে যদি অনুগ্রহ করে কিছু বলেন তাহলে বড় উপকৃত হব।

নমস্কারান্তে—

ইতি—বিনীতা—পর্ণা দাসগুপ্তা

চিঠির নিচে আবার লালকালিতে 'পুনশ্চ' লিখে বলেছেন পর্ণাদেবী, আপনাকে আরও 'বলা দরকার নানা জাতের ভূতের কথা শুধু যে গ্রামের লোকের মুখে শুনেছি তা নয়। নিজের চোখে দেখেওছি একটা অদ্ভুত ঘটনা—

একদিন ফালাকাটার কাছে একটা গ্রামে প্রোগ্রাম ছিল। কিন্তু আমি গ্রামে ঢুকতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। অনেকদূর থেকে কান্নাকাটি, চিৎকার এবং একসঙ্গে বহু মানুষের সোরগোল শুনতে পেলাম।

কি ব্যাপার ?

কেউ আর কিছু বলে না। ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-বৌ সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে গাঁয়ের শেষ মাথায় বাঁশবনের দিকে। আমিও সেদিকে হাঁটতে শুরু করলাম। একটু এগিয়ে যেতেই দেখলাম, অনেক লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছে—

কি হয়েছে ?

দিদি রাজবংশী পাড়ার মোড়ল নাটু বর্মনের জওয়ান ব্যাটাটা বাঁশ খোপোত মরি পড়ি আছে—

সত্যিই বিশ বাইশ বছরের একটা তাগড়া চেহারার ছেলের লাশ পড়ে আছে। তার মুখের দুপাশ দিয়ে রক্তের লালচে কষ গড়িয়ে পড়ছে।

কেউ খুন করেছে ?

না।

সাপে কেটেছে ?

না দিদি—না—

তাহলে ?

—এটা হল ঝারুয়া (ঝেরু) ভূতের কাজ দিদিমণি—

—ঝারুয়া ভূত মানে ?

আপনি টাউনেতে থাকেন দিদিমণি—আপনি কি করি জানমেন ঝেরু ভূত কি ? একটু থেমে লোকটা আবার বলতে শুরু করেছিল, এই জাতের ভূত থাকে বাঁশঝাড়ে। নিশি রাতে ঘুরি বেড়ায়। নিন্দে (ঘুমিয়ে) থাকা জওয়ান ব্যাটা বেটীদের নাম ধরে ডাকে। যেই তারা ঘরোরথে বারিয়ে আসে অমনি ঝেরুভূত তাদের গলা টিপে মারে—স্থির বিশ্বাসের আলোয় জ্বলজ্বল করছে লোকটির চোখদুটো।

আরও আছে তাদের কত রকমের কুসংস্কার—জানেন, ধু ধু দিগবিস্তীর্ণ কোন বিল বা জলার ধারে কিম্বা দিগন্তবিসারী ধানের মাঠে যদি কারও মৃতদেহ দেখা যায় তাহলে এরা আর কিছু ভাববে না। মৃত্যুর অন্য কোন কারণ তাদের মাথাতেই আসবে না। বলবে এটা বাপু আলেয়া ভূতের কাজ !

শুধু তাই নয়। হাত পা নেড়ে চোখদুটো বড় বড় করে তাদের দেশী ভাষায় যা বলবে তার মর্মার্থ হল—নিশি রাতে ধুধু মাঠের ঘন অন্ধকারের সমুদ্রে নাকি বুদ্বুদের মতই দপ করে জ্বলে ওঠে আলেয়ার আলো। জ্বলে উঠেই আবার অন্ধকারে ডুবে যায়। এই আলো পথিকদের দিকভ্রান্ত করে। আলোর মায়ায় পথ ভুলে উটকো জায়গায় গিয়ে মারা পড়ে—

নজির বাড়িয়ে আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। সংক্ষেপে বলা যায়, বেশ কয়েকবছর ধরে গ্রামজীবনের খুব কাছাকাছি থেকে দেখেছি, হাজারো রকম ভূতের ভয়ে আর অনুশাসনে এদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে।

সধবা মেয়েমানুষ নাকি মরে হয় শাঁখচুন্নি বা শঙ্খী। তারা শাঁখা পরে। পরণে লালপেড়ে শাড়ি। বেদজ্ঞ, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ মারা গিয়ে হয় ব্রহ্মদৈত্যি। এদের গলায় পৈত্যে ঝকমক করে। খড়ম পায়ে দিয়ে পোড়ো বাড়ির ছাদে খট খট শব্দ তুলে ঘুরে বেড়ায়। শশ্মানে ঘুরে বেড়ায় পিশাচ। পচা মাংস খায়। কন্দকাটা ভূতের মুণ্ডহীন ছায়াদেহ নাকি কোন পোড়ো বাড়ির আনাচে কানাচে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। গভীর রাতের অন্ধকারে মাঠে ঘাটে নাকি ভয়ানক রাগী ভূত কালজঙ্ঘের চোখদুটো দপদপ করে জ্বলতে দেখা যায়—এমন কি—

গোরু মোষও বাদ পড়ে না। গোরু মরে নাকি হয় গোভূত। অন্ধকার রাত্রে ভাগাড়ের কাছে শিং উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে—এইরকম আরও কত অজস্র অলীক বিশ্বাস আর মনগড়া কল্পনা তাদের ধ্যানধারণায় বহন করে চলেছে যুগযুগান্তর ধরে পুরুষানুক্রমে। কিন্তু—

সত্যিই বিভিন্ন জাতের ভূত এবং তাদের বৈচিত্রময় রকমারি কাণ্ডকারখানা কি একেবারেই ভিত্তিহীন আর অলীক?

ব্রহ্মদৈত্যি, শাকচুন্নি আর ঝেরু ভূতের মতই বাস্তুভূত, নিশি খেচর, বেতাল, গলাসীভূত (গলায় দড়ি দিয়ে মরলে হয়) ইত্যাদি, নানা অদ্ভুত ধরনের ভূতের কথা এদের কল্পনায় এল কি করে—এসবের যদি কোন যুক্তিসম্মত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকে—তাহলে অনুগ্রহ করে জানাবেন—

আরও অনেক কথাই লিখেছিলেন পর্ণাদেবী। তাঁর স্বামীকেও গ্রামে বাস করতে হয়। তিনি নদী সেচপ্রকল্প বা রিভার লিফ্টিং ইরিগেশানে কাজ করেন। তাঁর মুখেও অনেক রকম ভূতের কথা শুনে আমাকে করেছেন একটা অত্যন্ত জরুরী প্রশ্ন—

"দেখুন আমাদের স্বামী-স্ত্রীর দুজনেরই কাজ গাঁয়ের গরীব কিষান মেয়েপুরুষদের নিয়ে। এরা নানারকমের অদ্ভুত সংস্কারে আর বিচিত্র এক এক ধরনের ভূতের ভয়ে এমন আড়ষ্ঠ হয়ে থাকে যে তাদের দিয়ে কোন কাজ করানো যায় না। যেমন ধরুন সন্ধে লাগল কি আর তারা যে পথে বেলগাছ আছে কখনো যাবে না। সেখানে কি ব্রহ্মদৈত্যি বসে আছে। রাত ঘোর হয়ে এলে কখনো বড় মাঠ কি জলার ধারে তারা যাবে না। আলেয়াভূত আলোর হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যেয়ে গলা টিপে মেরে ফেলবে—এইরকম আর কি।

আপনি অনেকদিন থেকে প্রেততত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। এমন কিছু যুক্তিনির্ভর তথ্য আমাদের জানান যার ভিত্তিতে আমরা এদের বোঝাতে পারি—এসব একেবারে মিথ্যা। অবাস্তব! তাহলে আমাদের কাজের অনেক সুবিধা হয়। অনুগ্রহ করে এই উপকারটুকু করবেন…

পর্ণাদেবী! আমাকে অত্যন্ত গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন। সেই লাক লাক-

বছর আগে মানুষের সভ্যতা যেদিন প্রথম ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, সেইদিন থেকে পৃথিবীর সব দেশের মানুষের ধ্যানধারণায় যার অস্তিত্ব আছে—সেই প্রেত বা ভূত কিম্বা ভূতের বিভিন্ন জাত একেবারেই মিথ্যা এবং অবাস্তব এত সহজে বলা যায় না।

প্রাচীন ইতিহাসের পণ্ডিতেরা বলেছেন, মানুষ যেদিন প্রথম মৃত্যুকে উপলব্ধি করেছিল সেইদিন থেকেই ভয়—মৃত্যুভয় বাসা বেঁধেছিল তার মনে। আর সেই ভয় থেকেই প্রেতের জন্ম হয়েছিল। ডক্টর ফ্ল্যামারিয়ন, বিশপ লীডবিটার, এরিখ ম্যাপলে প্রমুখ সুবিখ্যাত পরলোকবাদীরা আরও জানিয়েছেন, সেই স্মরণাতীতকাল থেকেই মানুষের বুদ্ধি প্রজ্ঞা বা মনীষার অনেকটাই নিয়োজিত হয়েছে সেই রহস্যময় ছায়ামূর্তিকে (তা সে প্রেতই হোক আর শয়তানই হোক) সংযত করতে। ভূতকে বিশ্লেষণ করা এবং বুঝতে পারার প্রচেষ্টা চলেছে সেই আদিযুগ থেকে। হয়ত প্রেতের কল্পনাই মানুষের প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে জটিল শিল্পনৈপুণ্য—The art of ghosts is perhaps the oldest and most sophisticated of all human skills…

পর্ণাদেবী এইসব উক্তির ভেতরে নিশ্চয়ই আভাস পাচ্ছেন, পৃথিবীর দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংস্কৃতি ধ্যানধারণা এবং বিশ্বাস আর সংস্কার দিয়েই যুগযুগান্তর ধরে রচিত হয়েছে রকমারি প্রেতের বৈচিত্র্য। তাই দেখা যায় সাঁওতাল পরগণার নির্জন এক ডাকবাংলোর প্রেতিনী আর ইংল্যাণ্ডের এক রেললাইনের ধারের ওম্যান ঘোষ্টের ভেতরে মৌলিক কোন পার্থক্যই নেই। দুজনেই সংসার জীবনে বঞ্চিত। দুজনেই কোন দুষ্টপ্রকৃতির লোকের কাছে থেকে চরম লাঞ্ছনা পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত হয়ত আত্মঘাতী হতে হয়েছে। তাই তাদেরই বিদেহী আত্মা প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা নিয়ে সাবেক জায়গায় আনাগোনা করে। আর সেই দুর্বৃত্তকে শাস্তি দিতে চেষ্টা করে।

হ্যাঁ। এটাই হল পৃথিবীর সব দেশেরই ভূত সম্বন্ধে প্রচলিত এবং জনপ্রিয় ধারণা—Popular notion in all the countries of the world —those who die a violent and unnatural death become ghosts. They obviously remain earth bound, এই কথাটাই বলেছেন ক্যালকাটা ইউনাইটেড স্পিরিচুয়্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশানের প্রাক্তন সম্পাদক সুবিখ্যাত পরলোকবিদ প্যারীচাঁদ মিত্র। বলেছেন সাঁওতাল পরগণার প্রেতিনীর ঘটনাটা শুরু করার ঠিক আগে।

কিছুই ঠিকঠাক না করেই তরুণ ব্যারিস্টার অনিমেষ হঠাৎ দুম করে চারপাঁচজন বন্ধু নিয়ে হুল্লোড় করে চলে গেল সাঁওতাল পরগণায়। উদ্দেশ্য —আর কিছুই নয়—একটু চেঞ্জ। হাওয়া বদল। তার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের একটা বাংলো বাড়ি আছে। সারা বছর তালা দেওয়াই পড়ে থাকে।

বাড়িটার চারিদিকেই শালবন। দূরে আকাশের গায়ে নীলাভ পাহাড়ের

ধূসর ছায়া। কলকাতার হৈ হৈ হট্টগোলের ভেতর থেকে এই জনমানবহীন নির্জন জায়গায় এসে তারা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। কি অবিচ্ছিন্ন স্তব্ধতা। পাখির ডাক, গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের মর্মরধ্বনি কী স্পষ্ট। প্রথম চারপাঁচটা দিন তাদের বেশ স্ফূর্তিতেই কাটল। কিন্তু—

একদিন ছোকরা ব্যারিস্টার অনিমেষের বুঝি বা সামান্য শান্তিভঙ্গ হল। হবো হবো সেই সন্ধেতে সে একলাই ছিল বাড়িতে। বন্ধুরা কাছে পিঠে কোথাও হয়ত বেড়াতে বেরিয়েছিল।

সে বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে পশ্চিমের আকাশে রঙের খেলা দেখছিল। হঠাৎ তার নজর পড়ল করিডোর দিয়ে তার দিকেই ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে এক মহিলা। তার পরণের শাড়িতে জরির কাজ আবছায়া অন্ধকারে ঝিকমিক করছে। কিন্তু মুখখানা সাদা ওড়নায় ঢাকা।

কে—কে আপনি? বলে অনিমেষ যেই তার দিকে এগিয়ে গেল অমনি সেই রমনীমূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনিমেষ বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার। ভূতপ্রেত কখনো বিশ্বাস করে না। তাই ভয় পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সে স্পষ্ট নিজের চোখে দেখেছে সেই স্ত্রীলোককে। কি রকম হল? ডাকবাংলোর কেয়ারটেকার বুড়ো এক আদিবাসী। তার কাছে খোঁজখবর করতে সে জানালো—এবাড়ির ত্রিসীমানায় কখনো কোন মেয়েমানুষকে সে আসতে দেখেনি—

তখন অনিমেষের মনে হল—সিম্পলি অপটিক্যাল ইলিউশান—দৃষ্টিবিভ্রম। কিন্তু খুব নিশ্চিন্ত থাকতে পারল না সে। আবার ঠিক চারদিন পরে ঠিক সেই সময় সেই জায়গাতেই এবং অবিকল সেই পোশাকে আবার দেখল সেই রমনীকে। এবার একটু চিন্তিত হল। তবে যুক্তিবাদী মন তো। মনেব ভেতরে অনেক অনেক যুক্তি খাড়া করে এবার ঠিক করল—মায়া বা হ্যালুসিনেশান। এই ভেবেই মনটাকে শান্ত রাখল। কিছুতেই তাকে বিঘ্নিত বা ভয়ার্ত হতে দিল না। কিন্তু—

না দিলে কি হবে? ব্যারিস্টারের কপালে শান্তিতে থাকা ছিল না। পরের দিন নিশিরাতে বাংলোর চারিদিকে ঘেউ ঘেউ করে কুকুর ডাকতে লাগল। দূরের পাহাড়ের নিচে জঙ্গল থেকে শিয়ালের করুণ কান্নার শব্দ ভেসে এল। এসব তো নাকি আসন্ন কোন ভয়ানক অমঙ্গলের আভাস। বাড়িতে আরজেন্ট টেলিগ্রাম করল উত্তর এল—সকলেই কুশলে আছে।

পরদিনই আবার এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। বাংলোর মাঝখানে যে বড় হলঘরটা অষ্টপ্রহর বন্ধ থাকে, কেউ কখনো যায় না সেটা খুলতেই দেখা গেল মেঝেতে বড় বড় পাথরের টুকরো পড়ে আছে। অনিমেষ সেটা নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করল না। কিন্তু—

চেপে যাবে আর কত? ঠিক তার পরদিন ব্যারিস্টারসাহেব বাথরুম থেকে স্নান সেরে বেরোচ্ছে অমনি তার পায়ে ঠেকল গোরুর একটা হাড়। কী

আশ্চর্য এখানে গোরুর হাড় কে নিয়ে এল? চুপচাপ সরিয়ে ফেলল। বন্ধুরা চিন্তিত হবে। ভয় পাবে।

কিন্তু তার মনের ভেতরটা খচ্ খচ্ করতে লাগল—যদিও সে সাহেবমানুষ। এসব মানেটানে না। তবে বাপঠাকুরদ্দার কাছে শুনেছে—যাদের ইহলোকের দিকে আকর্ষণ খুব বেশি—সেইসব প্রেতাত্মাই নাকি বিক্ষুব্ধ হয়ে গোরুর হাড় ছোঁড়ে—Widely belived that earthbound souls do pelt cowbones…কিন্তু কেন? তা কেউ বলতে পারে না।

যাই হোক, ব্যারিস্টার এবং তার বন্ধুরাও কয়েকদিন পরে বুঝতে পারল খুব একটা নিরাপদ বাড়িতে তারা আসেনি।

ব্যারিস্টারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিনয়। ইয়া তাগাড়া চেহারার জওয়ান। সেদিন পোশাক পরতে ঘরে ঢুকেছিল। কিন্তু একটু পরেই ছুটে বেরিয়ে এল আর্তনাদ করতে—করতে। ভয়ে ছাইয়ের মত সাদা মুখ। থর থর করে কাঁপছে সে।

কি হয়েছে। কি হল? বন্ধুরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কিন্তু একমাত্র অনিমেষই কিছু বলল না। তার মনের ভেতরে চকিতে দুলে উঠল সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে সেই রমনীমূর্তি। পরণে জরির কাজ করা শাড়ি। মুখখানা সাদা ওড়নায় ঢাকা।

তখুনি বন্ধুরা এবং ব্যারিস্টার আলোচনা করে ঠিক করল ওই ঘরেই রাত কাটাবে তারা। ভয় পেয়ে হেরে গেলে চলবে না। কিন্তু বিনয় বলল, ভাই আমি কিন্তু একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখব—

কেউ কোন আপত্তি করল না। বুঝতে পারল সে মন থেকে ভয়টাকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না—

বিছানায় যেতে না যেতেই সবাই ঘুমিয়ে গেল। কিন্তু মাঝরাতে হঠাৎ ব্যারিস্টার জেগে গেল—

উঃ বাবা রে—আ—আ—ঘরের কোণ থেকে গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। ছুটে এসে যা দেখল তাতে তার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। তার বন্ধু বিনয়। বিনয়ের বুকের ওপরে একটা ভারি পাথরের খণ্ড। চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। মুখের দুপাশ দিয়ে গ্যাজলা গড়িয়ে পড়ছে।

অনিমেষ তাড়াতাড়ি তার বুকের ওপর থেকে পাথরটা সরিয়ে দিল। তাকে তুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার দেহটা শবদেহের মত ভারি মনে হল। চোখদুটোও কেমন বিস্ফারিত আর স্থির মনে হল। তাহলে মরেই গিয়েছে, না ভয়ে অজ্ঞান হয়েছে!

ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিল তার চোখে মুখে। একটু পরেই বন্ধুবর নড়েচড়ে পাশ ফিরল। অনিমেষ খুশি হল। কিন্তু একী!

বিনয় তার চোখদুটোকে এমন ভয়ানক ভাবে বড় বড় করে তার দিকে তাকিয়ে রইল যেন মনে হল তার চোখদুটো ছকেট থেকে ঠিকরে বেরিয়ে যাবে।

বিনয়—আমি রে—আমি অনিমেষ—ব্যারিস্টার আরও কি যেন বলতে

চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার গলাকে ছাপিয়ে হঠাৎ বেশ বদমেজাজে কর্তাব্যক্তির মত ভারিক্কির গলায় চিৎকার করে বলতে লাগল বিনয়—তুমি কি ভাবছ তোমার বন্ধু বিনয় কথা বলছে? সে অনেক—অনেক আগে মারা গিয়েছে। হ্যাঁ—আমি—আমিই তাকে খুন করেছি। তার দেহে ভর করে আমি কথা বলছি—প্রত্যেকটি কথা আমার। মরে পচে ঢোল হয়ে যাওয়া তোমার সেই বন্ধুর আর কোন গতি নেই—

অনিমেষ ভূতে বিশ্বাস না করলেও এটা বিশ্বাস করল যে এইভাবে কথা বিনয় বলে না। কণ্ঠস্বরটাও তার নয়। হয়ত এই বাংলোবাড়ির কোন প্রেতাত্মাই ভর করেছে তার ওপরে। কিন্তু—

সত্যিই কি সেই অশরীরি আত্মা খুন করেছে তার বন্ধুকে। যদি হত্যা করেই থাকে তাহলে তো এতটুকু সাহায্য করবে না—

"শোন আমি তোমাদের একটা উচিৎ শিক্ষা দিতে চাই। খুব সাবধান, আবার বিনয়েব মুখ দিয়ে প্রেতাত্মা বলতে লাগল, কেমন ঘ্যাসঘেসে—অস্পষ্ট আর মনে হল যেন স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর—তোমরা শুনে রাখ, তোমরা এবাড়িতে এসে আমার শান্তিভঙ্গ করেছ। আর আমি যে বিক্ষুব্ধ হয়েছি—সেটা তোমাদের নানাভাবে বুঝিয়েছি। তবুও তোমরা এখান থেকে নড়ছ না আর আমারই বুকের ওপরে বসে দিব্যি মাংস রান্না করে খাচ্ছ—

আমাদের সব অপরাধ ক্ষমা করে নিয়ে বন্ধুটিকে বাঁচিয়ে দিন দেবী, ব্যারিস্টারের এক মাঝবয়সী বন্ধু মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত বাড়িয়ে প্রার্থনা করার ভঙ্গিতে বলল, আমরা ওর বাবা—মাকে কি বলব—

না—হবে না। ও ভয়ানক অন্যায় করেছে। তাই ওকে খুন করে ওর ওপর ভর করেছি—তীব্র যন্ত্রণায় কঁকিয়ে বলল প্রেতিনী, একটু থেমে আবার আদেশ করার মত করে বলল, এখুনি—ওর শবদেহের চারিদিকে ধূপ জ্বালিয়ে দাও—গন্ধধূপ!—এক্ষুনি—

এই মাঝরাত্রে ধূপ কোথায় পাব?

কেন তোমরা সিগারেট খাও না?

সিগারেট!

হ্যাঁ—হ্যাঁ—তোমাদের সিগারেটের মশলার বাক্সটা খোলো না—

তারা দৌড়ে গিয়ে বাক্স খুলতেই দেখল তামাকের গুঁড়োর বদলে হলুদ পাউডারে ভর্তি? কি আশ্চর্য সিগারেটের মশলা কোথায় গেল? সাংঘাতিক তো! সিগারেটের তামাককে ধূপ বানিয়ে দিল! প্রেতিনীর ক্ষমতা আছে। আর ধূপ-টুপ নিয়ে যখন মাথা ঘামাচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই ধর্ম ভাবটাব এখনও আছে তার—

তোমরা কি ভাবছ, সুগন্ধী ধূপ আমি ভালবাসি? মোটেই না। ইহলোকের একটা তরতাজা মানুষকে খুন করতে পেরেছি—সেই উল্লাসেই আমি ধূপ জ্বালাতে বলেছি—থেমে গেল প্রেতিনী।

বড় দমে গেল ব্যারিস্টার। তাহলে বিনয় আর বেঁচে নেই ?

কৈ দেরি করছ কেন—জ্বালাও ধূপ—প্রেতাত্মার বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর ঝন ঝন করে বেজে উঠল।

তারা তাড়াতাড়ি সেই হলুদগুঁড়োতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। কিন্তু—কোথায় সুগন্ধ? মরামানুষের দেহ পোড়ানোর মত ভয়ানক উৎকট সেই দুর্গন্ধে ঘরের বাতাস ভারি হয়ে উঠল। ব্যারিস্টারের বন্ধুরা কেউ নাকেমুখে রুমাল চাপা দিয়ে এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল। আবার কেউ বা ওয়াক ওয়াক শব্দ তুলে বমি করত লাগল। আর ঠিক সেই সময় অনেক—অনেক দূরে থেকে প্রহর ঘোষণা করে শিয়াল ডেকে উঠল—হুক্কা—হুয়া—হুক্কা—হুয়া—সেই সঙ্গে কুকুর ডাকতে লাগল ঘেউ ঘেউ করে। তাদের মনে হল যুযুপ্ত লোকালয় থেকে অনেক—অনেক দূরে তারা যেন কোন শ্মশানভূমিতে এসে পড়েছে—

আমাকে একটু মদ খাওয়াতে পার, প্রেতিনীর কণ্ঠে করুণ মিনতি ফুটে উঠল—উঃ কতদিন—কতকাল সেই বাবু চোখ বোঁজার পর আর খাইনি—খেতে পাইনি—

সর্বনাশ। সে বন্ধুদের কোথায় নিয়ে এসেছে ? বিদ্যুৎচমকের মত মনে হল অনিমেষের অনেক অনেকদিন আগে ভাসা ভাসা শুনেছিল তার এক জ্যাঠামশায়ের নাকি ব্র্যান্ডী-টাঙ্গিজীর নেশা ছিল। পশ্চিমের কোন শহরে না কি একটা সুন্দর বাংলোবাড়ি বানিয়ে সেখানে রেখেছিলেন তার বিলাসের এক সহচরীকে। তারপর—

কৈ, আমাকে মদ খাওয়ালে না ?

এত রাত্রে মদ কোথায় পাব বলুন, অধৈর্য হয়ে উঠল ব্যারিস্টার। আছে—আছে অদৃশ্য সেই প্রেতাত্মা একটু হেসে বলল, তুমি যে তক্তাপোষটায় শুচ্ছো, তার নিচে দেখবে দুটো বোতল আছে। তার একটা খালি আর একটায় একটু আছে—

ছুটে গেল অনিমেষ। দেখল, সত্যিই দুটো বোতল আছে। তারা তো কেউ মদ খায় না। হয়ত তাদের আগে যারা এই বাংলোবাড়িতে এসেছিল তারা—

কি করছ নিয়ে এস না বোতলটা তাড়া দিল প্রেতিনী। ছুটে সেই বোতলটা নিয়ে এল ব্যারিস্টার! সঙ্গে সঙ্গে ঢক ঢক শব্দ করে মদটুকু খেয়ে ফেলল সেই বিদেহী প্রেতাত্মা।

আঃ একটা পরম পরিতৃপ্তির শব্দ তুলে সে বলল, তুমি—তুমি যে আমাকে কি আনন্দ দিলে বাবা—থেমে গেল সে। আবার যেন তার খুব কাছে এসে গলা নামিয়ে বলল, তোমাদের বন্ধুদের এখান থেকে যেতে বলে দাও—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে—

ব্যারিস্টারের বুকের ভেতরটা শির শির করে উঠল। কি—কি বলতে

চায়, কি এমন বলতে পারে এই প্রেতিনী। এই কি তার জ্যাঠামশায়ের সেই রক্ষিতা? না—কি তার জ্যাঠামশায়েরই কোন অপকর্মের বোঝা তার ওপরে চাপিয়ে দিতে চায়?

সেই মুহূর্তে সে ভুলে গেল—সে বিলেতফেরৎ ব্যারিস্টার, ভুলে গেল সে প্রচণ্ড যুক্তিবাদী, কোন কালেই ভূতপ্রেতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সে সম্মোহিতের মত প্রেতিনী যা বলল, ঠিক তাই করল। বন্ধুদের বাইরে চলে যেতে বলল।

তুমি তোমার বন্ধুর জীবন ফিরে চাও? একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত বলল সেই রমনীর বিদেহী আত্মা।

হ্যাঁ হ্যাঁ, যে কোন মূল্যে—তুমি যা চাও আমি—আমি তাই করব।

ঠিক?

ঠিক সেই মুহূর্তে তার নিদারুণ অবস্থার সুযোগ নিয়ে একটি কঠিন শপথ তাকে দিয়ে করিয়ে নিল প্রেতিনী। বেশ খুশি হয়ে বলল, কখনো ভুলে যেও না যেন তোমার প্রতিজ্ঞা—তাহলে ভয়ানক বিপদে পড়বে—

তার কথা যেন শুনতেই পেল না ব্যারিস্টার। ব্যাকুল হয়ে বলল, তুমি বিনয়কে ফিরিয়ে দাও—ওকে বাঁচিয়ে দাও—

তোমরা সবাই এই ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যাও, বলল প্রেতিনী, যে ছাদের নিচে ওর লাশটা পড়ে আছে—সেই ছাদের নিচেই তোমরা কেউ থাকবে না—একটু থেমে বলল, তোমরা বাইরে থেকে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ শুনতে পাবে। শব্দ থেমে গেলে চারিদিকে গভীর স্তব্ধতা নেমে আসবে। তখন তোমরা ঘরে গিয়ে দেখবে—তোমাদের বন্ধু জীবিত—নিস্তব্ধ হয়ে গেল প্রেতিনীর কণ্ঠস্বর। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার অত্যন্ত কঠোর আর কর্কশ কণ্ঠে বলল, কিন্তু এই মুহূর্তে তোমাদের সবাইকে এ বাড়ি ছেড়ে বাইরে চলে যেতে হবে—

ব্যারিস্টার চিন্তিত হল।

এই ভয়ঙ্কর টাইপের প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রেতিনী Revengeful Ghost-এর কাছে বেচারী বিনয়ের 'বডিটা' সঁপে দিয়ে সবাই মিলে চলে যাওয়া কি ঠিক হবে? কিন্তু তাদের প্রাণটুকু নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাওয়া নির্ভর করছে এই প্রেতিনীর ওপরে। তাই বলব না বলব না করেও বন্ধুদের ডাকবাংলোর মাঠে বসে থাকতে বলল। কিন্তু—

সে গেল না। নিঝুম অন্ধকার ঘরে বিনয়ের শবদেহের শিয়রে প্রহরীর মত বসে রইল। হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাসের একটা ঝাপটা আছড়ে পড়ল সেই ঘরে। ব্যারিস্টারের বুকের ভেতরটা শির শির করে উঠল।

কি গো, বন্ধুকে ছেড়ে যেতে ভরসা পাচ্ছ না, অন্ধকার ঘরে দূর কোণ থেকে প্রেতিনীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কুকুরের কান্নার মত অদ্ভুত একটা শব্দ করে হেসে বলল সে, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি—তোমার বন্ধুর আর কোন ক্ষতি আমি করব না। একটু থেমে আবার যেন অনেক—অনেক দূর থেকে

খুব ক্ষীণ আর অস্পষ্ট গলায় বলল, ওই প্রতিজ্ঞা করে তুমি যে কি শান্তি দিয়েছ, তুমি জান না। উঃ কতদিন—কতদিন যে তোমাকে কত জায়গায় খুঁজে বেড়িয়েছি, থেমে গেল সে। মনে হল গভীর কোন ব্যথার উজান ঠেলে সে আর কিছু বলতে পারল না। কিন্তু—

আরও—আরও অনেক কিছু বলার ছিল তার—

তুমি কি আরও কিছু বলতে চাও তো বলতে পার। মোলায়েম কণ্ঠে ব্যারিস্টার বলল, তোমার সব কথাই আমি রাখব—

কি আর বলব বাবা, ভার ভার গলায় বলল প্রেতিনী, তুমি তার ভাইপো—তোমাকে সব কথা বলাও যায় না, বলেই হঠাৎ থেমে গেল সে।

প্রগাঢ় স্তব্ধতায় থমথম করতে লাগল ঘরটা। প্রাচীন সেই বাড়ির দূর কোণ থেকে একটা নিশাচর পতঙ্গ ডেকে উঠল—চিপ-চিপ-চিপ—

ব্যারিস্টারের মনে পড়ে গেল, তার ঠাকুমা, আশি বছরের বৃদ্ধা। তাঁর মুখের কোনো আগল ছিল না। ফোকলা দাঁতে কালো মিশি ঘষতে ঘষতে বক-বক করত ঘরে সোন্দরী বৌ থাকতে ঢেমনী নিয়ে, স্ফূর্তি করতে গিয়ে, ও (জ্যাঠামশায়) মরল। ওর সবস্ব যাবে—পথের ভিখেরী হতে হবে ওকে—অমন সতীলক্ষ্মী বৌয়ের শাপ যাবে কোথায়।

সেই বুড়ি দেহ রেখেছে প্রায় বছর দশেক হতে চলল। আজ পরিস্থিতিতে পড়ে বহুকাল আগে শোনা সেই বৃদ্ধার কথাগুলো তার কানের কাছে বাজতে লাগল।

আমাকে অনেক—অনেক লোভ দেখিয়ে শেষপর্যন্ত একগাদা ঋণ করে তিনি হঠাৎ দেহ রাখলেন বাবা, যেন অনেক—অনেক দূর থেকে খুব ক্ষীণ আর অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল স্বৈরিণীর প্রেতাত্মা, পাওনাদারদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে হয়ে গেলাম। সাবেক জীবনে ফিরে যাওয়ারও আর কোন উপায় ছিল না—শেষ পর্যন্ত আফিং খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছিলাম বাবা—থেমে গেল সে।

উঃ মাগো, আবার অস্ফুট আর্তনাদ করে সে বলল—আত্মহত্যাতে যে কি ভয়ানক নরক যন্ত্রণায় যে কি সাংঘাতিক কষ্ট, একটু থেমে আবার হেসে বলল, তাই তো তোমাকে বহুদিন—বহুকাল ধরে খুঁজছিলাম বাবা। তুমি ছাড়া আর কে আমাকে উদ্ধার করবে বল? তোমার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলো না কিন্তু—

আমার বন্ধু—বিনয়—

পাবে—যাও বাইরে যাও, শব্দ শুনলে আসবে—

যাব না, যাব না করেও অনিমেষ বাইরে গেল। শেষরাতের আবছায়া অন্ধকারে ভরা মাঠে উৎকণ্ঠিত বন্ধুদের পাশে এসে নিঃশব্দে বসল।

কি হল বিনয়ের?

তোরা তো জানিস। ওই স্পিরিট তার বডি ছেড়ে গেলে নাকি ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হবে—দেখা যাক—কি হয়, কেমন হতাশ হয়ে নিভু নিভু গলায় বলল অনিমেষ।

তার মনে হল, সাঁওতাল পরগণার এই বাংলো বাড়িতে আসার পর থেকে যে অসম্ভব আর অলৌকিক ঘটনার স্রোত বয়ে চলেছে তাতে সব কিছুই সম্ভব। হয়ত বিনয়কে শ্বাসরুদ্ধ করে নৃশংসভাবে হত্যাই করে ফেলেছে প্রেতিনী। আবার হয়ত—

পরলোকবাসিনী ওই প্রেতিনীর অনুগ্রহে বা কোন দৈব বলে বেঁচে যাবে—

কড়—কড়—কড়াৎ—হঠাৎ সেই বাংলোবাড়ির ভেতরে বাজ পড়ার মত ভয়ানক শব্দ হল। ডানা ঝটপট করে সভয়ে উড়ে গেল কোন নিশাচর পাখি। তারপরেই প্রগাঢ় স্তব্ধতার ভেতরে তলিয়ে গেল অভিশপ্ত বাড়িটা।

অনিমেষ বন্ধুদের নিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে গেল বাংলোর দিকে। তার বুকের ভেতরটা দুরু দুরু কাঁপছে—কি দেখবে, কি দেখতে পারে ঘরে গিয়ে? বিনয়ের অসাড়, নিস্পন্দ আর শীতল শবদেহ পড়ে আছে মেঝেতে। স্বৈরিণীর বিদেহী প্রেতাত্মার সঙ্গে তার কথাবার্তা, তার বন্ধুর জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস—সব—সব নিশীথকালীন দুঃস্বপ্ন মাত্র।

সব মিথ্যা। অবাস্তব! কিন্তু—

না। ঘরে ঢুকে দেখল, নিশ্বাসের তালে তালে ওঠানামা করছে বিনয়ের বুক। চাপা উল্লাসের ঝড় উঠল বিনয় বেঁচে আছে রে—বেঁচে আছে!

সত্যিই বিনয় বেঁচে আছে। শুধু ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল মাত্র। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতেই জ্ঞান ফিরে এল। চোখ মেলে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে ক্ষীণস্বরে বলল, বড্ড উইক লাগছে—জল খাব—জল—আমি কোথায় রে…

অনিমেষ তাকে বিগত রাতের ভুতুড়ে ঘটনার কোনকিছুই তাকে বলল না। বন্ধুদের সাহায্যে তাকে পাঁজাকোল করে—অন্য ঘরে নিয়ে গেল। আর সেইদিনই দুপুরে কলকাতায় রওনা হল।

পর্ণদেবী। হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিনের প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যায় এই ঘটনাটি লিখে কলকাতার ইউনাইটেড স্পিরিচুয়্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশানের সেক্রেটারি প্যারীচাঁদ মিত্র বলেছেন—১৯০১ সালের অক্টোবরের শেষে দশহারার ছুটির সময়ের ঘটনা এসব। প্রত্যক্ষদর্শী সেই ইয়ং ব্যারিস্টারই নিজে তাকে এই আশ্চর্য ভৌতিক ঘটনাটি বলেছিল এবং ভূতপ্রেতে ঘোরতর অবিশ্বাসী এই ভদ্রলোক পরে প্রেতের অস্তিত্বে প্রবলভাবে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল।

ঘটনাটি—সত্যি বলেই মনে হয়। কারণ, প্রেততত্ত্বের অনেক থিয়োরীর সঙ্গেই ঘটনার বিভিন্ন সিকোয়েন্সের বেশ মিল আছে।

(ক) অপঘাত মৃত্যুতে যে পরিমাণ তীব্র যাতনা নিয়ে দেহ থেকে প্রাণটা বেরিয়ে যায় পরলোকে তার বিদেহী আত্মাও সেইরকম কষ্ট পায়। মৃত্যুর পরে সে হয় প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রেত কিম্বা প্রেতিনী।

(খ) এখানে প্রেতিনী তার আত্মার শান্তির এবং নরকের অন্ধকার থেকে

উদ্ধার পাওয়ার জন্য তার প্রনয়িণীর ভাইপোর (ব্যারিস্টার) সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিল অনেক দিন ধরে। কিন্তু স্পিরিট কখনো সরাসরি জীবিত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। তাই সে ব্যারিস্টারের বন্ধু—বিনয়কে ভর করেছিল। তার মুখ দিয়েই সব কথা বলেছিল।

(গ) আবার কোন অশরীরি আত্মা কখনো হুট করে কাউকে পজেস বা ভর করতে পারে না। তার আগে বেশ কিছুদিন ধরে তাকে একটা ভয়াল পরিবেশ গড়ে তুলতে হয় (এখানে গোরুর হাড় এবং পাথর ফেলে করেছে) এবং যাকে ভর করবে তার মনে রীতিমত একটা obsession সৃষ্টি করতে হয়।

(ঘ) ঘরে বিনয় লণ্ঠন জ্বালিয়ে রেখেছিল। যতক্ষণ আলো ছিল সে পজেস করতে পারেনি। তেল ফুরিয়ে লণ্ঠন নিভে যায়। ঘর গাঢ় অন্ধকারে ভরে যায়—তখুনি বিনয়কে সে সম্পূর্ণ ভর করতে পারে।

এই সব ঘটনা থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়—এই প্রেতাত্মা—নিঃসন্দেহে প্রতিহিংসাপরায়ণা প্রেতিনী—As the lower spirits usually need darkness to manifest themselves.

আর ওপরের তথ্যগুলো সম্বন্ধেও বলেছেন সুদীর্ঘকাল ধরে প্রেতচর্চায় অভিজ্ঞ অধ্যাত্মবাদী প্যারীচাঁদ—এসবই প্রেতলোকের অলিখিত নিয়ম বা—Laws which control spirit communication.

পর্ণাদেবী! এবার শুনুন ইংল্যাণ্ডের রেললাইনের সেই প্রেতিনীর রোমাঞ্চকর বৃত্তান্ত—

ঝিক ঝিক—ঝিক—পু—উ—উ—রাতের হৃদপিণ্ডের মত ধুক ধুক ধ্বনি তুলে লিভারপুল লাস্ট লোক্যাল আসছে। আসছে হেড লাইটের উগ্র সাদা আলোর চাবুক দিয়ে সামনের জমাট অন্ধকারটাকে তাড়া করতে করতে। রাতের গাঢ় অন্ধতাকে ভেঙ্গে চুরে দীর্ণ বিদীর্ণ করে দিয়ে সেই লৌহদানব আসছে। সেই প্রবল ঝড়ের মত শব্দকেও ছাপিয়ে আবার তার তীব্র হুইসলের শব্দ শোনা গেল—পু—উ—উ—উ—উ—

ফায়ারম্যান অবাক হয়। ড্রাইভার ব্রিয়ারলিসাহেব লিভারপুলের কাছে এই বাঁকটায় এলেই বেশ চনমন করে ওঠে। কেন অকারণে হুইসিল বাজায় আর বাইরে ঝুঁকে লাইনের ধারে জোনাকীজ্বলা ঘন অন্ধকারে কি দেখে!

সে ভাবে। একদিন ড্রাইভারসাহেবকে জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু—সাহস পায় না। অনেক সিনিয়র মানুষ। তার চেয়ে উঁচু পোস্টে কাজ করে। যদি কিছু মনে করে বসে। কিন্তু—

আর ঘাঁটাতে হল না। জিজ্ঞাসাবাদ করে উত্যক্ত করতে হল না। সে একদিন নিজেই আবিষ্কার করল—ব্রিয়ারলি রেললাইনটা ঠিক যেখানে বাঁক নিয়েছে তার পাশে একটা কটেজের দিকে কেমন উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকে। গোটা বাড়িটা ঘন অন্ধকারে ভাল্লুকের মত জবুথবু হয়ে আছে। কিন্তু

তার আলোকিত দরজায় দেখা যায় এক রমনী। হাতের আলোটা দুলিয়ে দুলিয়ে কে জানে কিসের সঙ্কেত দেয়—কিন্তু—

ফোঁস ফোঁস করে দ্রুত নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে হুস করে পেরিয়ে চলে যায় লিভারপুল লাস্ট লোক্যাল। সেই বাঁক আর অন্ধকার সেই কটেজের আলোকোজ্জ্বল রহস্যময়ী সেই নারীমূর্তি কোন দূরের নিচ্ছিদ্র সেই সীমাহীন অন্ধকারে হারিয়ে যায়। কেমন থমথমে হয়ে ওঠে ব্রিয়ারলির মুখখানা। ফায়ারম্যানের মনে হয়, রাতের এই ঘন অন্ধকারটাই যেন চেপে নেমে এসেছে ড্রাইভার সাহেবের মুখে। তবুও—

তবুও দিন কাটে। মাস যায়। হয়ত এইভাবে বছরও ঘুরে যেত। ঘড়ির কাঁটায় যেই বারোটার নিশানা দেখা যেত অমনি ঝড়ের মত শব্দ তুলে আসত লিভারপুল লাষ্ট লোক্যাল। বাঁকের কাছে এসেই ইঞ্জিন ড্রাইভার বাইরে ঝুঁকে পড়ে তাকাতো। আর সেই সুন্দরীর হাত থেকে আলোর উপহারটুকু নিয়েই চলে যেতে পারত। কোন অসুবিধাই ছিল না।

রাত্রির মধ্যযামে কোথায় ঘনকালো অন্ধকারটাকে গ্রেহাউণ্ডের মত তাড়া করতে করতে কোন ট্রেন ছুটছে, কোথায় কোন অঘটনঘটন পটিয়সী নারী তার ড্রাইভারকে আলোর নিশানার মাধ্যমে প্রেম নিবেদন করছে—কে তার খবর রাখে আর তাই কি সম্ভব? তাই—

তাই বলছি হয়ত তাদের এই অভিনব গোপন অভিসারের কথা কোনদিনই কেউ জানত না। জানা একেবারেই সম্ভব ছিল না বলেই। কিন্তু—

জীবন জটিল।

সে কখনো সরলরেখায় চলে না। প্রেম—জটিলতর। তার বিপদ পদে পদে। কিন্তু এসব কথা এখন থাক। ঘটনাটা এখানে বড় নয়। আর সেই বৃত্তান্তও নেহাতই গতানুগতিক। ধূসর। সাদামাটা। একেবারেই বৈচিত্রহীন।

সবচেয়ে বড়—সবচেয়ে জরুরী হল—পরলোক থেকে বিদেহী আত্মা তার জীবনের বঞ্চনার, তার চরম ক্ষতির প্রতিশোধ নিতে ইহলোকে আসে। প্রতিহিংসার আগুন বুকে নিয়ে সাবেক জায়গায় আনাগোনা করে। আর এই ব্যাপারে লিভারপুলের রেললাইনের প্রেতিনীর সঙ্গে সাঁওতাল পরগণার ডাকবাংলোর সেই স্বৈরিণীর বিক্ষুব্ধ প্রেতাত্মার কোন পার্থক্যই নেই। প্রেতিনীর কোন দেশ নেই। কাল নেই। জাত নেই।

দুই বন্ধু।

দুই সহকর্মী।

দুজনে খুব ভাব। কেউ কাউকে না দেখলে থাকতে পারে না। তবুও—তবুও একদিন সেই সম্পর্কেই চিড় ধরল। ধরত না। কিছুই হত না। যদি জিম রবসন বিয়ে না করত। আর অ্যাগনিস যদি সুন্দরী না হত।

সংসার কি বিচিত্র। জীবন কত অদ্ভুত। বাঁধা ধরা পথে চলতে চলতে হঠাৎ কখন যে গর্তে পড়ে যাবে, থেমে যাবে জীবনের হাসি গান উল্লাস।

এমন কি স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে প্রাণের ধুকধুকিও। অথচ এরকম শোচনীয় আর শোকাবহ কিছু ঘটার কথাই নয়। তাই তো লণ্ডনের স্পিরিচুয়্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশানের প্রসিডিংসে এই ভুতুড়ে ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে গোড়াতেই লিখেছে—Engine driver Brierly was not at all a dishonourable man, rather very honest fellow.

হ্যাঁ। ওই ব্রিয়ারলিই একরকম জোরজোবরদস্তি করে জিমের বিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, তুই দস্তুরমত ভাল চাকরি করিস—লিভারপুর নাইট এক্সপ্রেস ট্রেনের সিনিয়র ড্রাইভার। মোটা মাইনে পাস—তুই ভবঘুরে বাউণ্ডুলে হয়ে থেকে জীবনটাকে নষ্ট করবি কেন?

আরও অনেক বলার পর রাজী হয়েছিল জিম বন্ধুর কল্যাণে বিয়ে করে সংসারী হল। আর সেই বন্ধুকৃত্য করতেই বুঝি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ওপরওয়ালাদের ধরাধরি করে ব্রিয়ারলিকে করে দিতে পেরেছিল একটা চাকরিও—লোক্যাল ট্রেনের ড্রাইভার।

বেঁচে গিয়েছিল বেচারী ব্রিয়ারলি। তিনতিনটা ছেলেমেয়ে আর বৌ নিয়ে গ্রসারিশপের (মুদীর দোকানের) সেলসম্যান ব্রিয়ারলি একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। নুন আনতে তেল ফুরিয়ে যাওয়ার সেই অনিশ্চয়তার অবস্থা থেকে বহুদিন বাদে যেন পায়ের নিচে শক্ত ডাঙ্গা পেয়েছিল। আর সেই হয়েছিল তার কাল—

প্রায় প্রতিদিনই যায় ব্রিয়ারলি বন্ধুর বাড়িতে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিয়েছে। জিম আর তার স্ত্রীও খুব খুশি হয়। গল্পগুজব হাসি ঠাট্টায় তাদের সান্ধ্য আসর জমে ওঠে।

জিমের ডিউটির টাইম হয়ে যায়। তার নাইট এক্সপ্রেস ছাড়ে রাত নয়টায়। আ'টটা বাজলেই সে বেরিয়ে চলে যায়। প্রথম প্রথম বন্ধুর সঙ্গেই ব্রিয়ারলিও চলে যেত। তার লাস্ট লোক্যাল। রাত দশটায় ছাড়ে। অতএব নয়টার ভেতরে তাকে বাড়িতে ফিরতেই হত।

দিনে দিনে তাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। আর তাদের ডেলি রুটিনের রদ বদল হয়ে যায়। জিম ডিউটিতে বেরিয়ে গেলেও ব্রিয়ারলি নড়ে না। অ্যাগনিসের সংগে কথা বলা যেন একটা নেশার মত তাকে পেয়ে বসে। তার সমস্ত চেতনার ভেতরে সমস্ত সত্তার ভেতরে যেন নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করে অ্যাগনিসের ধারালো ঝকঝকে দীর্ঘ চেহারাটা। তার হাসি হাসি মুখ।

ব্যাপারটা ব্রিয়ারলির কাছে কেমন আশ্চর্য মনে হয়—সে কী সত্যিই পরস্ত্রীর প্রেমে পড়েছে! আর সে জন্যই কি সে কঠিন Obsession-এ ভুগছে? পরক্ষণেই তার মন তাকে শাসিয়ে বলে—Why his own wife is a good woman. I love her.

অ্যাগনিসও ভাবে, এটা কি হচ্ছে! মনে মনে ঠিক করে আর ওকে 'এনকারেজ' করবে না। কিন্তু—পারে না। আর কখনো পারবে না।

সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। কখন যে তার মন জুড়ে বসে রয়েছে ওই লোকটা—তা সে জানতেই পারে নি। একদিন একটু দেরি করে ব্রিয়ারলি এলে তার মনটা খচ খচ করে। আর—

যেই রাত নামে, জিমকে খাইয়ে দাইয়ে ডিউটিতে পাঠিয়ে দেয় অ্যাগনিস। তারপর টানা একঘণ্টা দুজনে গল্পসল্প হাসাহাসি করেও তাদের আশা মেটে না। ছটফট করতে থাকে অ্যাগনিস—কখন—কখন দূরের অন্ধকার রাত্রির দিগন্তে গুরু গুরু ধ্বনি তুলে লিভারপুল লাস্ট লোক্যাল আসবে। আর একবার দেখতে পাবে তাকে।

এসব ভাবতে ভাবতেই ঝড়ের মত শব্দ তুলে এসে পড়ে লাস্ট লোক্যাল। অ্যাগনিসের মনে হয়, শব্দটা যেন তার বুকে বাজছে। অদ্ভুত একটা আনন্দে উত্তেজনায় যেন অসাড় হয়ে যায় তার চেতনা। বাইরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকা ড্রাইভারের দিকে নজর পড়তেই দুলে ওঠে তার হৃদপিণ্ডটা। ব্রিয়ারলি হেসে হেসে হাতছানি দেয়। আর অ্যাগনিস ক্রমাগত আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেই আলোকোজ্জ্বল সংকেতের মাধ্যমে তার অন্তরের ভালবাসা জানায়।

পাড়ার লোক আড়ালে আবডালে কানাঘুসো করে। এদের অবৈধ প্রণয়ের কথা লোকের মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে যায়। জিমের কানে পড়ে সব। আর কানে শুনতে হবে কেন, সে তো নিজেই দেখছে ওদের চালচলন হাবভাব যেন একটু কেমন কেমন। তার বন্ধু এলেই অ্যাগনিস কেমন চনমন করে ওঠে। খিলখিল হাসি আর গল্পের যেন ফুলঝুরি ফোটে। তার বুকের ভেতরটা পুড়ে যায়। বলি বলি করেও বৌকে বা বন্ধুকে—কাউকেই কিছু বলতে পারে না। কিন্তু—

পারলে হয়ত ভাল হত। এত বড় নৃশংস দুর্ঘটনা ঘটত না। মনে হয় শেষের দিকে তারা দুজনেই জিমের ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিল। হয়ত নিজেদের একটু সামলাতেও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু—

বড্ড দেরি করে ফেলেছিল। সেদিনও লিভারপুল লাস্ট লোক্যাল কাঁটায় কাঁটায় দশটায় ছেড়েছিল। ঢং-ঢং-ঢং-করে ঘণ্টি বেজেছিল। গার্ডসাহেব হুইসেল বাজিয়ে সবুজ আলোর সঙ্কেত দিয়ে ট্রেন ছেড়েছিল। কোথাও কোন ত্রুটি ছিল না। কোন বিঘ্নও ঘটেনি কোথাও এতটুকু। কিন্তু—

লিভারপুল স্টেশন ছাড়িয়ে কয়েক ফার্লং দূরে সেই বাঁকটার মুখে আসতেই ঘটে গেল মারাত্মক বিঘ্ন—গাঢ় অন্ধকারে ডুবে রয়েছে জিমের কটেজ। তার কোথাও নেই সেই হলদে আলোর হাতছানি—ব্রিয়ারলির বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। ওরা কি কোথাও চলে গেল। ভাবল, কালই খোঁজ নেবে—

কিন্তু খোঁজখবর নিতে হল না। জিমের বাড়িতে যেতেও হল না—পরদিনই লিভারপুল ডেলি এক্সপ্রেসের প্রথম পাতার হেড লাইনে খবর ছাপা হল—**Night express driver Jim Robson, suspecting adultery of his wife, killed her and then himself.**

একেবারে পাথর হয়ে গেল ব্রিয়ারলি। কিন্তু পুলিশ এল না তার কাছে। হয়ত বন্ধুকে বাঁচিয়ে দিয়ে গিয়েছিল জিম। পাড়ার লোকরাও কেউ তাকে কিছু বলল না। শুধু কেমন করে যেন তাকাতো। কিন্তু—

কেউ কিছু না বললেও নিজের বিবেকের যন্ত্রণায় জ্বলে যায় ব্রিয়ারলি। নেহাত কাজে যেতে হবে, তাই যায়। আর সেই রেললাইনের বাঁকে অন্ধকার কটেজটার দিকে তাকিয়ে তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। অ্যাগনিসের হাস্যোজ্জ্বল সুঠাম চেহারাটা, তাকে ঘিরে কত টুকরো টুকরো ছবি যেন তার মনের ভেতরে মিছিল করে চলে যায়। আর চোখদুটো জলে ভরে আসে।

আবার এক একদিন তার মন আচ্ছন্ন হয়ে যায় তীব্র অনুশোচনায়—তার জন্যই অকালে তাদের পৃথিবী থেকেই বিদায় নিতে হল। ছিঃ ছিঃ তার এতবড় মহাপাপের শাস্তি কিসে হবে! কিন্তু—

না। অ্যাগনিস বিদায় নেয়নি। নিতে পারে না। তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে না তার সুইটহার্ট অ্যাগনিস। তাই একদিন তার লাস্ট লোক্যাল রেললাইনের সেই কার্ভে আসতেই দেখল কটেজের আলোকিত দরজায় এক রমনীর আবছায়া কালো দেহরেখা। তার হাতের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে ইসারা করছে!

অ্যা—গ—নি—স—চলন্ত ট্রেনের সেই ঝড়ের মত শব্দকেও ছাপিয়ে চিৎকার করে ডাকল ব্রিয়ারলি। তার মাথার ভেতরে ফেটে পড়ছে রক্তের উচ্ছ্বাস!

মুহূর্তে আলো হাতে সেই নারীমূর্তিকে নিঃসীম অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ট্রেন চলে গেল। তবুও—তবুও বাইরে ঝুঁকে পড়ে পিছনে তাকিয়ে রইল ব্রিয়ারলি। তাকিয়ে রইল যতক্ষণ পর্যন্ত সেই আলোর বিন্দুটিকে দেখা যায়।

করছেন কি ড্রাইভারসাহেব, ফায়ারম্যান আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে, অত ঝুঁকেছেন কেন পড়ে যাবেন যে!

ব্রিয়ারলি ভেতরে এল বটে। মাথার ভেতরটা কেমন টলতে লাগল। অসাড় হয়ে এল স্নায়ুগুলো। মনে হল যেন সে শক্ত কোন অসুখ থেকে উঠেছে। ভয় হল সে কি লিভারপুল লাস্ট লোক্যালকে তার ডেস্টিনেশানে নিয়ে যেতে পারবে!

পেরেছিল। শুধু সেদিন নয়। পর পর কয়েকদিনই তার গাড়ি নিয়ে ঠিক মত পৌঁছেছিল। আর অ্যাবসলিউটলি সেফ অ্যারাইভ্যাল তো হতেই হবে। শুধু কটেজের দরজায় দাঁড়িয়ে আলোর সিগন্যাল দেখায় না অ্যাগনিস। ছুটে চলে আসে গাড়ির কাছে। তারপরই আলো হাতে ঝড়ের বেগে যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে গাড়ির পাশাপাশি ছুটতে থাকে—

অ্যা—গ—নি—স—অ্যাগনিস—পড়ে যাবে যে—পাগলের মত চিৎকার করতে থাকে লাস্ট লোক্যালের ড্রাইভার। পিছন থেকে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকায় ফায়ারম্যান। কাকে দেখে লোকটা চিৎকার করছে! আশ্চর্য তো—

কোত্থাও কেউ নেই! শুধু নিঃসীম মাঠ জুড়ে জোনাকী জ্বলা ঘন থকথকে অন্ধকার খাঁ খাঁ করছে।

ফায়ারম্যানের ভয় হয় এই রকম একটা অ্যাবনরম্যাল লোকের সঙ্গে ইঞ্জিনে থাকতে ভয় হয়। কার্ভ পেরোলেই গাড়ির স্পীড বাড়াতে হয়। অনেকগুলো লাইন চেঞ্জ করে করে তাদের নির্দিষ্ট লাইনটাতে যেতে হয়। এই সময়টা শক্ত করে ধরে রাখতে হয় হুইল—একটু আনগাইডফুল হয়েছে কি গাড়ি ছুটবে বেলাইনে। আর লোকটা কিনা ঠিক এই জায়গাটাতেই এসে বাইরে তাকিয়ে কে জানে কোন মাগীর নাম ধরে ষাঁড়ের মত চিল্লাচ্ছে। না সে কমপ্লেন করবে—লাস্ট লোক্যালের ইঞ্জিন ড্রাইভার রিয়ারলির সঙ্গে আর যে ফায়ারম্যানই যায় যাক, সে যাবে না—

কিন্তু কমপ্লেনের ঝামেলা আর করতে হল না।

সেদিন ছিল শনিবার। উইকএণ্ডের দিন ভিড় হয়। তাই গাড়ি একটু লেটে ছেড়েছিল। সেই বাঁকের কাছে আসতেই অন্ধকার কটেজ থেকে ছুটে বেরিয়ে এল অ্যাগনিস। আলো হাতে গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে লাগল। বাইরে ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। চারিদিক দিনমানের মত লাগছে। রিয়ারলি দেখল, অ্যাগনিসের পরণে সেই ধবধবে সাদা স্কার্ট ব্লাউজ। যেটা পরে তাকে শেষদিন দেখেছিল। কেমন উন্মাদের মত হয়ে গেল সে। আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে হুইল-টুইল, লিভার সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে চিৎকার করতে লাগল—অ্যাগ—নি—স—মা—ই—ডা—র্লিং—অ্যাগ—নি—স—

ড্রাইভারসাহেব—শীগগীর লিভারটা টেনে দিন—গাড়ি যে বেলাইনে চলে যাচ্ছে—এ—ফায়ারম্যান আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল। তার কথা শেষ হতে না হতেই বাজ পড়ার মত একটা ভয়ানক শব্দ হল। অন্যান্য—কম্পার্টমেণ্ট থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে শুধু ইঞ্জিনের বগীটা মাঠের ভলভলে কাদার ভেতরে মুখ থুসে পড়ে গেল।

রিলিফভ্যান এবং লোকজন এসে তোবড়ানো ইঞ্জিনের নিচ থেকে টেনে বের করল রিয়ারলির থ্যাঁতলানো বিকৃত দেহটা। আশ্চর্য। এতটুকু আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি ফায়ারম্যানের—এই বিবরণ দিয়ে লণ্ডনের স্পিরিচুয়্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশান দুটো ইণ্টারপ্রিটেশান দিয়েছে এই ভৌতিক ঘটনার—

(ক) রিয়ারলিকে গভীরভাবে ভালবেসেছিল অ্যাগনিস। তাই বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পরলোকে তার প্রণয়ীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

(খ) কিন্তু লণ্ডন স্পিরিচুয়্যালিষ্ট অ্যাসোসিয়েশানের অনারেবল প্রেসিডেণ্ট এবং ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা প্রেতবিশেষজ্ঞ ডক্টর ইলিয়ট ওডোনেল (Elliot Odonnel) বলেছেন—তা নয়—শেষের দিকে অ্যাগনিস নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করেছিল। রিয়ারলিকে আসতে নিষেধ করত। কিন্তু—মেয়েদের হাতের মুঠি যদি একবার আলগা হয়ে যায়, তাহলে পুরুষদের আর

কখনো সামলানো যায় না। শোনা যায়, একদিন হতভাগিনী রেগে গিয়ে নাকি বলেছিল—তুমি আমার জীবন নষ্ট করে দিয়েছ—তোমাকেও আমি ছাড়ব না—

তাই মনে হয়—প্রেম নয়, প্রতিহিংসা। কোন সুদূর লোকান্তপার থেকে অ্যাগনিসের বিদেহী আত্মা প্রতিশোধ নিতেই এসেছিল—As Brierly the Engine Driver spoiled her life she (Agnes) returning from the spirit world took a terrible revenge.

জানেন পর্ণাদেবী ওডোনেলসাহেব আরও একটা বেশ মজার কথা বলেছেন—প্রেতিনীরা প্রায়ই প্রতিহিংসার আগুন বুকে নিয়েই ছটফট করে ঘুরে বেড়ায়। তার সাবেক জীবনের প্রেমের সুখস্মৃতি বা মিষ্টি কোন অনুভূতি নিয়ে কখনো আনাগোনা করে না প্রেতিনী। তারা—

হিংস্র আর প্রতিহিংসা পরায়ণ—Fierce and revengeful !

পর্ণাদেবী—সেণ্টিমেণ্ট এবং মেণ্টাল স্ট্রাকচার বা মানসিক গঠনের দিক থেকে অনায়াসেই বলা যায়, পৃথিবীর সব দেশের প্রেতিনীই এক রকম। কেন বলছি জানেন ?

ইংল্যাণ্ডের লিভারপুল রেললাইনের বাঁকে দাঁড়িয়ে আলো নেড়ে নেড়ে ডাকত যেমন এক প্রেতিনী ঠিক তেমনি নাগপুর-ওয়ার্দ্ধা লাইনের ধার বরাবর আলো হাতে ছুটে যেত এক শাঁখচুন্নি।

প্রত্যক্ষদর্শী এক সিগন্যালার বা পয়েণ্টসম্যানের জবানীতেই ঘটনাটার বিশদ বিবরণ ছাপা হয়েছে বাঙ্গালি প্রেততত্ত্ববিদদের মুখপত্র হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিনে।

"রাত দুটোর সময় আমি বোম্বেমেল ভায়া নাগপুরের সিগন্যাল দিতে গিয়েছিলাম। ফিকে জ্যোৎস্না ছিল। তার মেটে মেটে আলোয় চারিদিক কেমন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল।

ওয়ার্দ্ধা স্টেশন থেকে বেশ একটু দূরে ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালটা। সময় হয়ে গিয়েছিল। আমি জোর পায়ে হাঁটছিলাম। হঠাৎ—থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। লাইনের ধার দিয়ে জোর পায়ে ছুটে আসছে একটা মেয়ে। তার এলোচুল বাতাসে দুলছে। পিঠ ছাপিয়ে পড়েছে নিচ পর্যন্ত। মনে হল, তার হাতে একটা আলো। কিন্তু আলোটা একবার দপ করে উঠেই আবার ফিকে অন্ধকারের সমুদ্রে বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যাচ্ছে।

আশ্চর্য তো! আলো হাতে নিয়ে রেলে গলা দিতে এসেছে! এখুনি—এখুনি ঝড়ের বেগে মেলট্রেন ছুটে আসবে। আমি—আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বললাম—কে ওখানে—কে—কে—কে ? বলেই আমার সিগন্যাল ল্যাম্পটা উঁচু করে ধরে আলো ফেললাম তার মুখের ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই ছায়ামূর্তি। শুধু দুটো দীর্ঘ কালো বিষাক্ত সরীসৃপের মত রেললাইনের ওপরে ধূসর অন্ধকার খাঁ খাঁ করতে লাগল। তাহলে

কি চোখের ভুল ? চারিদিকের ঝিঁঝিঁগুলো আমার মাথার ভেতরে ডাকতে লাগল।

আরে উ আউরাত তো র‍্যাণ্ডি আছে—র‍্যাণ্ডি, ব্যাপারটা বলতেই রেল-পুলিশের হেডকনস্টেবল খৈনি টিপতে টিপতে চোখের কোণা দিয়ে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, উ গার্ড রানিংরুমকা বাবুলোগ একটু স্ফূর্তি-টুর্তি করতে টাউনসে উ জেনানা লিয়ে আসে—

তার কথাটা আমার খুব একটা বিশ্বাস হল না। আমি আমার কোয়ার্টারে ফিরে এসে বাবাকে বললাম ঘটনাটা। বাবা পাক্কা ত্রিশটা বছর ধরে এই ওয়ার্ধাতেই সিগন্যালারের কাজ করে রিটায়ার করেছেন। সব শুনেই কেমন ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল মুখ। অস্ফুটস্বরে বলল,—খবরদার ওর পিছু নিবি না—ও খতরনাক পেতনী—ও হল পেত্তা জ্বালানো পেতি (পেত্নী)—

সে যখন জওয়ান, সবে চাকরিতে ঢুকেছে তখন একদিন রাতে আপ বোম্বেমেলের ক্লিয়ারেন্স দিতে গিয়ে আলো হাতে ওই মেয়েটিকে দেখেছিল। অমনি ছুটেছিল তাকে একেবারে হাতে নাতে ধরবে বলে। সে যত জোর ছোটে, মেয়েটাও তত যেন বাতাসে পা ফেলে উড়ে চলে। মাইলের পর মাইল ছুটছে—শুধু ছুটছেই। হঠাৎ তার মনে হল, তার পায়ের নিচে যেন মাটি নেই। শুধু ভলভলে কাদা। আর সেই পাঁকের ভেতরে একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে সে। কত—কত চেষ্টা করছে সে উঠতে। কিন্তু—কিন্তু কিছুতেই পারছে না। দেখতে দেখতে কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল তার। আর আশ্চর্য ! আলো হাতে সেই মেয়েছেলেটাও কোথাও নেই। শুধু চারিদিকের ঘুটঘুটে অন্ধকার তাকে গিলে খেতে আসছে। সে তখন ভয়ে আতংকে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল—কে আছ—আমাকে বাঁচাও—বাঁ—চা—ও—

তারপরে আর মনে নেই তার। পরদিন ভোরে গ্রামের চাষীরা এসে তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। মাথায় জলটল দিয়ে সেবাশুশ্রূষা করে জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিল—এই পর্যন্ত বলে আমার বাবা থেমে গিয়েছিলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার আস্তে আস্তে বলেছিলেন, শুনেছি, অনেকদিন আগে লোকোশেডের স্টাফরা শহর থেকে একটা বেশ্যাকে নিয়ে এসে এখানে কিছুদিন রেখেছিল। তারপর কে জানে, কি কারণে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হতভাগীকে খুন করা হয়। একটু থেমে আবার বলেছিল তারই জিন বা প্রেতাত্মা সেই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রেলের স্টাফকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে পাঁকে পুতে মারে—

পেত্তা জ্বালানো পেতি কি ? আমি বাবাকে প্রশ্ন করেছিলাম—

পেত্তা হল ওর হাতের আলো আর পেতি—পেত্নী—তার চেয়ে আর বেশি কিছু বলতে পারেনি পয়েণ্টসম্যানের বৃদ্ধ পিতা।

পর্ণাদেবী বৃদ্ধ ঠিক বলতে পারেনি। শুধু সে কেন, অনেকেই জানেও না গ্রামের ধু ধু ধানের মাঠে কি মরা হাজা পুকুরের স্যাঁতসেঁতে মাটি থেকে

মার্শগ্যাস ওঠে। সেই গ্যাস থেকে দপ করে জ্বলে ওঠে আলো—পল্লী অঞ্চলের মানুষ অজ্ঞতাবশত এই আলোকেই বলে পেত্তা বা আলেয়া। বলে পেতি (পেত্নী) জ্বালে পেত্তা।

শিবায়ন কাব্যেও আছে ভাগ্য বলে সন্ধ্যাকালে পেতি জ্বালে বাতি। আর প্রেতিনী যে একটা বিভীষিকা তারও আভাস পাওয়া যায় এই কাব্যেরই আর একটি শ্লোকে—ওথায় পেতিনী দানা খাইয়াছে সখের খানা একখানা পচা ঠ্যাং নিয়া···

পর্ণাদেবী বলা দরকার, ওয়ান্ধার রেললাইনের ঘটনাটি ১৮৮৮ সালের। নির্জলা সত্যি ঘটনা। অনেকদিন আগে এক বারোবিলাসিনীকে লোকোস্টাফরা শহর থেকে নিয়ে এসেছিল। বেশ কিছুকাল তারা আদিম লালসা চরিতার্থ করে পৈশাচিক উল্লাসে তাকে খুন করেছিল। সেই ডিসট্যান্ট সিগন্যালের নিচে কাশবনে হতভাগীর লাস ফেলে রেখেছিল। তারপর থেকেই নিশিরাত্রে সিগন্যালাররা লাইনের ওপরে সেই রমনীর ছায়ামূর্তি দেখতে পেত।

আসলে অপঘাত মৃত্যু হলে প্রেত বা প্রেতিনী হয়ে পৃথিবীতে আসে এই বিশ্বাস এবং অন্ধসংস্কার থেকেই ওয়ান্ধার রেললাইনের পেতনীর জন্ম হয়েছিল। আর লাইনের দুপাশেই জলা জমি ছিল—অতএব সেই আলেয়ার আলোর সঙ্গে প্রেতিনী আইডেন্টিফায়েড হয়ে গিয়েছিল।

আমার মনে হয়—মনে হয় পর্ণাদেবী পৃথিবীর সব দেশেই এই ভাবেই প্রেতিনীর উদ্ভব হয়েছে মানুষের যুগযুগান্তরের অন্ধ বিশ্বাস আর ভ্রান্ত ধারণা থেকে। আমাদের দেশে তো কথাই নেই। হিন্দু সংস্কৃতিতে ধ্যানধারণায় প্রেতিনী বা ডাকিনী, পিশাচী শাঁখচুন্নির অস্তিত্ব আছে স্মরণাতীতকাল থেকে। খোদ শিব দুর্গার অনুচরী হল ডাকিনী যোগিনীরা। অন্নদামঙ্গলে আছে—ডাকিনী যোগিনীগণ লয়ে সঙ্গে অগণন ভূত প্রেত নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়। কবিকঙ্কন বলছে—যোগিনীরা হলেন মা দুর্গার সহচরী। তারা সংখ্যায় চৌষট্টিজন—রণে অলক্ষিত হয়ে চৌষট্টি যোগিনী লয়ে উরিলেন শ্রীসর্বমঙ্গলা—অন্নদামঙ্গলে আছে শাঁখচুন্নির কথা—চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে চলে শাঁখিনী মুক্তকেশে···আবার শাঁখচুন্নি সম্বন্ধে এক দেশীয় প্রেতবিশেষজ্ঞ বলেছেন—রাতের অন্ধকারে যে কোন পথচারীর সামনে শেওড়াগাছ থেকে সড়াৎ করে নেমে আসে শাঁখচুন্নি। মিশমিশে কালো। মুখের ফাঁকে সাদা ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে হাসে। সেই হাসিতে পথিকের দেহের রক্ত হিম হয়ে যায়···কিন্তু কোন তথ্যের ওপর ভিত্তি করে শাঁখচুন্নির এই চিত্র এঁকেছেন তা তিনি বলেননি। অতএব বলা যায়, প্রেতিনী সম্বন্ধে যুগযুগান্তরের সেই প্রচলিত জনপ্রিয় ধারণা থেকেই তিনি শাঁখচুন্নির ছবি তৈরি করেছেন।

পর্ণাদেবী আপনি উচ্চশিক্ষিতা—নিশ্চয়ই জানেন অন্নদামঙ্গল, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের মনসামঙ্গল এবং সমগ্র মঙ্গল কাব্যেই প্রেতিনী, ডাকিনী যোগিনী শাঁখচুন্নির ছড়াছড়ি। আজও দূর গ্রামের পুজোমণ্ডপে পালাগানের আসর

বসে। অন্নদামঙ্গলের গান শুনতে শুনতে কৃষক বধূর চোখদুটো অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। নিঃসন্দেহে মনে হয়, এই অসামান্য জনপ্রিয় লোককাব্যগুলো রকমারি ভূতপেত্নীর কল্পনাকে শত শত বছর ধরে সমৃদ্ধ করেছে। করেছে দূরপ্রসারী! কিন্তু—

লোককাব্যে বা লোকসাহিত্যেই বা প্রেত-প্রেতিনী এল কি করে? এই প্রশ্ন আপনার মনে জাগছে পর্ণাদেবী। ভাবছেন ভূতের অরিজিন কি। শুনুন তাহলে বলি, প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরানো এই দেশের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ সেই বেদেও প্রেতের কথা আছে। সেখানে প্রেতকে বলা হয়েছে 'পিশাচ' অথর্ববেদের অষ্টাদশ কাণ্ডের ২—৪ অনুবাকে পিশাচ সম্বন্ধে বলছে মাংসভক্ষক যে পিশাচগণ অমাবস্যার অর্দ্ধরাত্র কালে অপরকে হিংসা করতে ইচ্ছা করেছিল...ইত্যাদি। আবার প্রেত পিশাচ তাড়ানোর মন্ত্রই রয়েছে এই অথর্ববেদেই। সেখানে স্পষ্টই বলা হয়েছে পিশাচ হল সেইসব প্রেতযোগী যারা মাংস খেতে অত্যন্ত অভ্যস্ত। পিশাচ কথাটার অর্থই অবশ্য যারা পিশিত বা মাংসের আশ ভক্ষণ করে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও আছে—ধিয়া তা ধিয়া তা ধিয়া ভূত নাচে—উলঙ্গী উলঙ্গী পিশাচী পিশাচে—

কিন্তু পর্ণাদেবী, এসব কথা বলছি বটে, সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে—'পিশাচ' কি শুধু লোককথা, এবং কাব্যে পুরাণে বর্ণিত এক অবাস্তব এবং ভিত্তিহীন কল্পনা? কি করে বলি বলুন তো—যে এসব ডাহা মিথ্যা এবং মানুষের মনগড়া। এই শতকের একেবারে গোড়ার দিকে ভারতীয় পরলোকবিদরা যে বিভিন্ন রকমের প্রেতের গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে শুধু যে গবেষণা করে স্পষ্ট বলেছেন—পিশাচ হল—Spirit of the very lowgrade... তা নয়, তাদের অত্যন্ত নিচ মনোবৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে বলেওছেন একটি সত্য ঘটনা—

১৯০৩ সাল। স্থান—দেওঘর। শীতকাল। ডিসেম্বর মাস। হাওয়া বদলাতে গিয়েছিলাম সেখানে, বলছেন ভারতীয় অধ্যাত্মবাদীদের বা পরলোকবিদদের সমিতির সেক্রেটারি—ডক্টর মিত্র, কিন্তু বন্ধুবান্ধব নিয়ে আনন্দ করতে এই শহরে এসে এমন একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল—

সন্ধে হয়ে আসছিল। আবছায়া অন্ধকারের সওয়ার হয়ে ঘন কুয়াশা চারিদিকে ছেয়ে ফেলছিল। অচেনা জায়গা। রাত হয়ে গেলে কোথাও কিছু পাওয়া যাবে কি যাবে না তাই তাড়াতাড়ি করে তার বয় সারভেণ্ট শিবুকে পাঠালেন দুধ আনতে। বেশি দূরে নয়। তাদের বাড়ির কমপাউণ্ডের লাগোয়া গণোরী মাহাতোর বাড়ি। খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছিলেন, গনোরীর দুধের কারবার।

কিন্তু আশ্চর্য প্রায় পনের মিনিট পেরিয়ে গেল শিবু ফিরল না। খুব দুশ্চিন্তা হল। তিনি যখন খোঁজ খবর করতে বেরোবেন ভাবছেন এমন সময় ছুটতে ছুটতে এল শিবু। হাঁফাচ্ছে। মুখখানা ছাইয়ের মত সাদা।

কি ব্যাপার—কি হয়েছে ?

কি বলব বাবু দুধ নিয়ে যেই রওনা হয়েছি, অমনি যেন মনে হল কে আমার পিছু নিয়েছে—একটু থেমে বারকয়েক ঢোক গিলে বলল, তাকিয়ে দেখি একটা লম্বা ঢ্যাঙ্গামত লোক আমার দিকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। আমি যত জোরে ছুটি—সেও তত জোরে—আসতে লাগল, বলেই থেমে গেল। দুচোখে বিভীষিকা ফুটে উঠল। সে যেন সেই ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। অস্ফুটস্বরে বলল, প্রায় আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাবু—বহু কণ্টে—

ডক্টর মিত্র কিছুই বললেন না। তাঁর মনে হল, দেওঘরে এসে শিবু নেশাভাঙ্গ শুরু করেনি তো? কিন্তু ওর মুখ দেখে তো সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না।

মিত্রসাহেব আইনের ডক্টরেট; দস্তুরমত ডাকসাইটে ব্যারিস্টার। কিন্তু তার নেশা—প্রেততত্ত্বে। ভূতপ্রেত নিয়েই তার নাড়াচাড়া। তাই তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না। বন্ধুদের নিয়ে গনোরীর বাড়িতে এলেন।

তাঁর কানে পড়েছিল গনোরী খ্রীস্টান। ভূতপেত্নীতে তার বিশ্বাস না থাকাই স্বাভাবিক। তার বাড়িতেই ভূতের দৌরাত্ম্য? ব্যাপারটা বেশ মজার। তাই বেশ একটু কিউরিওসিটি নিয়ে এবং বন্ধুদের সাথে করে তার ডেরায় গিয়েছিলেন।

বাড়ি বলতে একটাই ঘর। টিনের চাল। মাটির দেওয়াল। আর বাড়িটার তিনদিকই খোলা। আর একদিকে বাঁশ ঝাড়। ষোল সতের বছরের একটা মেয়ে নিচু হয়ে উঠোন ঝাড় দিচ্ছে। তুমি কি গনোরীর মেয়ে ?

হাঁ—জী, হেসে ঘাড় নেড়ে বলল মেয়েটি, বাবুজী তোমরা কি জীনের খোঁজ খবর করতে এসেছ ?

আরে! তুমি কি করে জানলে, একটু অবাক হয়ে বললেন মিত্রমশাই, আচ্ছা কি রকম উপদ্রব হয় বলো তো ?

বাবুজী, জীন নয়, পিশাচ—পিশাচ, সপ্রতিভ বুদ্ধিমতী মেয়েটির কথাগুলো কেমন করুণ আর্তনাদের মত শোনালো। আস্তে আস্তে বলল, একটা রাতেও হামরা নিশ্চিন্তে নিন্দ যেতে পারি না বাবুজী। কখনো ইয়া বড় বড় পাথর—

ফিন তু বাবুজীদের উ খতরনাক জীনের কথা বলতেছিস, চিৎকার করে ধমকে উঠল, মাঝবয়সী একটা লোক। চিমড়ে পাকানো চেহারা। মনে হল, এই বোধহয় গনোরী মাহাতো। তাদের দেখে একটু অসন্তুষ্ট হয়ে মেয়েকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, বাবুলোগসব কলকাতা সে এসে জীনের কথা মৌজ কর শুনিয়ে চলিয়ে যান—তারপর হামাদের হয় মরণ—তার কথা শেষ না হতেই বেশ ভারি একখণ্ড পাথর ঠক করে এসে পড়ল মিত্রমশায়ের পায়ের কাছে।

ওই যে বললাম, গনোরী ভয়ে ভয়ে বলল দেখিয়ে দিন ওই জীনের কথা বললেই উ খেপে যায় আর দারুণ উপদ্রব করে বাবুজী।

গনোরী যাই বলুক। ডাঃ মিত্রের মনে হল গনোরী এবং তার মেয়েটি প্রেতের মিডিয়াম। ওদেরই কারসাজি এসব। তাদের দুজনকে ঘরে আটকে রেখে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিলেন। কিন্তু—

কোন লাভ হল না। সমানে যেন আকাশ থেকেই বড় বড় পাথরের আর ইটের টুকরো এবং গোরুর হাড় বৃষ্টির মত পড়তে শুরু করল। দেখতে দেখতে হাঁটু সমান উঁচু হয়ে গেল রাবিশের স্তূপ।

মিত্রসাহেব এবার বুঝতে পারলেন—সত্যিই ভুতুড়ে কাণ্ড আর গনোরীদের কোন হাত নেই তাতে। আরও নিশ্চিত হলেন তখন যখন গনোরীকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা আওয়াজ হল আর কুয়োর ভেতর থেকে প্রায় একমণ ওজনের একটা পাথর লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে আছড়ে পড়ল উঠোনে। যারা দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল তারা সবাই দৌড়ে পালিয়ে গেল।

আচ্ছা গনোরীদের ওই ঘরটার কনট্যাক্ট থেকে একবার দূরে রেখে দেখ তো কি হয়, ডক্টর মিত্রের এক বন্ধু বললেন। তাঁর কথামত দূরে গনোরীকে সপরিবারে একটা সরষের ক্ষেতের ভেতরে বসিয়ে রাখা হল। কিন্তু—

তাতে হিতে বিপরীত হল। সমস্ত ঢিল, পাথর আর ইটের টুকরো এবং গোরুর হাড় যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। আর সারা উঠোনজুড়ে মাছের মত লাফাতে শুরু করল। সেইসঙ্গে কে জানে কোথায় থেকে বাতাসে ভেসে এল মানুষ পোড়ানোর উৎকট দুর্গন্ধ। নাকে কাপড় দিয়ে দূরে সরে আসতে হল। আর তখুনি—

তাঁর মনে হল—মনে হল এসব নিশ্চয়ই স্পিরিটেরই কাজ। আর That spirit is of very low degree. পিশাচ গনোরীর মেয়ে ঠিকই বলেছিল—বহুত খতরনাক 'পিশাচ'। আর তখুনি 'স্ট্রাইক' করল প্রেতবিদ্যারই কোন বিদেশী লেখকের লেখা বইতে পড়েছিলাম—লোয়ারগ্রেড স্পিরিট কখনো উঁচুস্তরের প্রেতাত্মার মত সূক্ষ্ম বায়বীয় দেহ ধারণ করতে পারে না। তারা মানুষের রূপ ধরেই আসে। তাদের ছায়াদেহ মানুষের স্যাডোর মত এমন যথেষ্ঠ পরিমানে ঘন আর কালো হয় যে খালি চোখে দেখা যায়—The shadow of the gross soul—is dense enough to be visible to the naked eye. তিনি সেই বাড়ির আনাচে কানাচে, পিছনে কচুগাছের জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে দেখলেন—কোথাও সেই পিশাচের ছায়ামূর্তি দেখা যায় কি না! অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও কিছুই তার নজরে পড়ল না।

তারপরে ঘটনা ডক্টর মিত্রের জবানীতেই শুনুন—

তারপরের দিন ভর দুপুরে গেলাম কাজের সুবিধার জন্য। আশ্চর্য আমি বাড়ির উঠানে পা দেওয়ামাত্র বড় বড় ঢিল বাতাসে শাঁ শাঁ শব্দ তুলে ছুটে এসে আছড়ে পড়তে লাগল আমার চারিদিকে। আমার মনে হল, গনোরীদের ঘরের ভেতরে বন্দী করে রেখে আবার বাইরে নিয়ে যেয়ে সরষের ক্ষেতে বসিয়ে রেখেও দেখেছি—ঢিল পড়া বন্ধ হয়নি। তাই এবার

তাদের বারান্দায় বসিয়ে রাখলাম—

আশ্চর্য! ঢিলের তীব্রতা কমে গেল। একটা দুটো থেকে থেকে পড়তে লাগল। কিন্তু তখুনি এমন কতগুলো অদ্ভুত ভৌতিক কাণ্ড ঘটে গেল যে আমাকে জীবনহানির ভয়ে চলে আসতে হল।

তাদের বারান্দার এক কোণে রান্নাবান্না হত। হঠাৎ ঘরের কড়িকাঠে ঝুলানো শিকে ছিঁড়ে এক বাটি ডাল এসে পড়ল আমার মাথায়। আমার জামা কাপড় নষ্ট হয়ে গেল। ধুয়ে মুছে পরিস্কার হয়ে এসে আবার দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই আবার একটা শিকে পট করে ছিঁড়ে গেল আর আমার সারা গায়ে লবন ছড়িয়ে পড়ল। ঝেড়ে ঝুড়ে নিয়ে আবার ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেই হঠাৎ বারান্দার কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা একটা পাঁচ ফাটি লম্বা বাঁশ যেন জীবন্ত হয়ে লাফাতে লাফাতে আমার মাথা লক্ষ্য করে ছুটে এল। আমি ভয়ে চিৎকার করে তাড়াতাড়ি সরে গেলাম।

ঠকাস—করে প্রচণ্ড শব্দে লাঠিটা আছড়ে পড়ল মাটিতে। আর একটু হলেই আমার মাথা ফেটে যেত। বেশ বুঝতে পারলাম—পিশাচ চাইছে আমি যেন এখানে না থাকি—আমারও ভয়ে বুকের ভেতরটা দুরু দুরু কাঁপছিল। আর থাকা নিরাপদ মনে করলামনা। চলে এলাম—এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিলেন ডক্টর মিত্র।

কিন্তু প্রেততত্ত্বের নিষ্ঠাবান গবেষক তিনি। তিনি কি করে এই ইন্টারেস্টিং কেসটি ছেড়ে দেবেন? তিনি কনক্লুশান করলেন, বৃষ্টির মত সেই ঢিল পাথর পড়া, কুয়োর ভেতর থেকে সেই একমণী ওজনের পাথর ছিটকে উঠে এসে উঠোনে আছড়ে পড়া—এসব স্বচোক্ষে দিনের আলোয় দেখেছেন তিনি। তাঁর উচ্চশিক্ষিত বন্ধুরা এবং শহরের প্রায় শখানেক গন্যমাণ্য ব্যক্তি। এটা নিশ্চয়ই অলৌকিক ঘটনা—occult phenomenon. কিন্তু—

কার—কোন দুর্বৃত্তের প্রেতাত্মা—এই পিশাচ? এই অদৃশ্য প্রেতাত্মার অকল্পনীয় দৈহিক শক্তি—সে কুয়ো থেকে পাথর তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তাহলে কোন অমিতশক্তিধর এবং খলচরিত্রের মানুষ একদা এইখানে বাস করত?

তিনি প্রাচীন বাসিন্দাদের কাছে খোঁজখবর করে জানলেন। অনেক—অনেকদিন আগে এক খুনে জমিদার গনোরীর জমিতে বাস করত। লম্বা চওড়া দৈত্যের মত চেহারা ছিল তার। সে কথায় কথায় প্রজাদের মাথা কাটত। কত নিরীহ হতভাগার লাশ যে এই মাটিতে মিশে রয়েছে।

অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে তার অপঘাত মৃত্যু হয়। একদিন সকালে খালের জলে তার দেহটা ভাসতে দেখা যায়। লোকে সন্দেহ করে, আক্রোশের বশে কোন প্রজাই তাকে খুন করেছে। আবার কেউ বলে যত পাপ কাজ করেছে, শেষজীবনে তার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল। অনুশোচনার জ্বালাতেই আত্মঘাতী হয়েছে। সে যাই হোক। মোটের ওপর অপঘাত মৃত্যু—

তাহলে তো প্রেততত্ত্বের থিয়োরীতে মিলে গেল—অস্বাভাবিক ভাবে

মৃতব্যক্তির আত্মা কখনো উঁচু স্তরে যেতে পারে না। সে প্রেতাত্মা হয়ে অতৃপ্ত কামনা বাসনার তাবার কখনো বা প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা নিয়ে তার সাবেক জায়গ তে যখের মত বসে থাকে। তাই ডক্টর মিত্র লিখেছিলেন, গনোরীর বাড়ির ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানার নায়ক সেই অত্যাচারী এবং দুর্বৃত্ত জমিদারের প্রেতাত্মা। That invisible thing (অদৃশ্য আত্মা possessed enormous physical powers. তাই সে কুয়ো থেকে একমণী ওজনের পাথর তুলে ছুঁড়ে ফেলতে পেরেছিল !

কিন্তু তাঁর মনে হল সাধারণত খুব নিচু স্তরের প্রেতাত্মা বা পিশাচ, সাধারণত কোন মিডিয়ামের সাহায্য ছাড়া তাদের দৌরাত্ম্য দেখাতে পারে না। যখন বৃষ্টির ধারার মত উঠোনে ঢিল পাথর পড়ত, কি কুয়ো থেকে অত বড় ভারি একখণ্ড পাথর উঠে এসে আছড়ে পড়েছিল কিম্বা তাঁর মাথায় এসে পড়ছিল বাঁশ তখন গনোরী কেমন নির্বিকার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। ভয় কি বিস্ময়ের কোন চিহ্ন ফুটে উঠত না তার মুখে। মেয়েটাও কেমন যেন—থেকে থেকে মুচকি হাসত। ওদের ভালো বরে বাজিয়ে দেখতে হবে—এই মনে করে পরদিনই খুব ভোরে গনোরীর বাড়িতে এলেন। কিন্তু—

দেখলেন দরজায় তালা ঝুলছে। কেউ কোথাও নেই। এমন কি নেই গনোরীর পোষা কুকুরটাও! শুনলেন, মহল্লার কিছু লোক নাকি তাকে মিছামিছি ভয় দেখিয়েছে—কলকাতার বাবুদের জীনের এত কথা বলছিস। ওরা তোকে পুলিশে দেবে।

অনেক খোঁজ করেও কোথাও তাকে আর পাওয়া গেল না।

পর্ণাদেবী! প্রেতিনীর মত পিশাচও পৃথিবীর সব দেশেই এক রকম কি না জানি না। কোথাও এই বিষয়ে কোন 'রিসার্চ' হয়েছে বলে শুনিও নি। তবে আপনাকে পিশাচের প্রকৃতি নিয়ে কিছু লিখতে হবে বলে প্রেততত্ত্বের পত্রপত্রিকা ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ পেলাম নিচের তথ্যটি। যাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যিনি মধ্যরাত্রে মালয়ের গভীর জঙ্গলে দেখেছিলেন পিশাচের সেই অদ্ভুত ভুতুড়ে কাণ্ড তাঁর জবানীতেই খুব সংক্ষেপে বলা হল—ঘটনাটা—

বহু দেশে ঘুরে ঘুরে শেষে মালয়ে এলাম। এখানকার গ্রামের সব ঘরই মাটির। কিন্তু মজা হল, বাঁশের খুঁটি দিয়ে খুব উঁচু করা সেই ঘর। আর তার চাল দেশীয় 'কাড়জঙ্গ' পাতা দিয়ে ছাওয়া। এই পাতাগুলো ইণ্ডিয়ান শালটির পাতার মত বেশ বড় বড় প্রায় তিন ফিট লম্বা। আর পুরু এবং কাঠের মত খুব শক্ত। এই রকম একটা ঘরে রাতের মত আশ্রয় নিয়েছি। পাশের ঘরে আমার নেটিভ বয়সারভেণ্ট শুয়ে আছে। আমার চিন্তার বা ভয়ের কিছুই নেই। কিন্তু—

রাত তখন ঠিক একটা হবে। চারিদিক থমথম করছে। শুধু প্রগাঢ় স্তব্ধতাকে তুরপুন দিয়ে কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক।

কখন গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছি জানি না। হঠাৎ—

ঝুপ। মৃদু একটা শব্দ হল টুংকুর (বয়সারভেণ্ট) ঘরে। আমার মনে হল জঙ্গলে শুকনো পাতার ওপরে দিয়ে কোন জন্তুজানোয়ার হাঁটছে হয়ত। আমি আবার ঘুমোতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু—

কিছুক্ষণ পরই আবার শব্দ বেজে উঠল ঝুপ। এবার উঠে পড়লাম। উঠতেই হল। বিছানার নিচে আমার পায়ের কাছে কেরোসিন ল্যাম্প জ্বলছিল। তার শিখাটা বাড়িয়ে দিলাম। দেখলাম আমার বিছানার ওপরেই পড়ে রয়েছে গোটা আট দশেক পাথর। মেপে দেখলাম প্রতিটি পাথরই ১/৮ থেকে ৩/৪ ইঞ্চি উঁচু। ওপরে তাকিয়ে দেখি ঠিক কাড়জঙ্গের মজবুত ছাদেও আট দশটি ফুটো আর আট দশটা পাথরই তো পড়েছে! কিন্তু—

শুনেছি কাড়জঙ্গের ছাদ এত শক্ত যে কিছুতেই সূঁই দিয়েও ছিদ্র করা যায় না। রীতিমত ধারালো তুরপুন কিম্বা কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে ফুটো করতে হয়। মালয় ও সুমাত্রার সীমান্তে প্যালেমব্যাঙ্গ অঞ্চলে অপর্যাপ্ত পরিমানে জন্মায় এই কাড়জঙ্গ গাছ। অত্যন্ত পুরু আর শক্ত বলেই কাড়জঙ্গের পাতার খুব চাহিদা। কিন্তু—

সে যাই হোক। অত্যন্ত কঠিন সেই কাড়জঙ্গের ছাদ ফুটো করে কে ঢিল ফেলতে পারে। তাহলে কি বানরদের কাজ। শুনেছি মালয়ের জঙ্গলের বানররা নাকি খুব দস্যি! এসব ভাবতে ভাবতেই ঘুমে আবার জড়িয়ে এল চোখদুটো!

ঝুপ—ঝুপ—ঝপ—আবার সেই শব্দ। লাফিয়ে উঠলাম। ছাদ ফুটো করে করে ঢিল পড়ছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! পাথরগুলো যেন বাতাসে ভেসে ভেসে বৃত্তাকারে নেমে এসে আলগোছে পড়ছে বিছানায়। তাই ওই সামান্য অস্পষ্ট ঝুপ শব্দটুকু ছাড়া আর কোন আওয়াজ হচ্ছে না। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম—প্রতিটি ঢিল বা পাথর বেশ গরম। মনে হয় যেন রোদে তাতানো হয়েছে!

এই আমার সঙ্গে চল তো, বাইরে জঙ্গলটা ঘুরে দেখে আসি, আট ব্যাটারীর টর্চ হাতে নিয়ে টুংকুকে সঙ্গে করে বেরিয়ে এলাম।

যেদিকে তাকাও মালয়ের গহন অরণ্য। গভীর সেই জঙ্গলের গাছে গাছে ঘন অন্ধকার বাদুড়ের মত ঝুলছে। বাতাসে শিশিরে ভেজা গাছের পাতার বুনো গন্ধ! তন্ন তন্ন করে দেখলাম, কোথাও কিছু দেখলাম না। অন্ধকার জঙ্গল লক্ষ্য করে পর পর পাঁচ রাউণ্ড গুলি ছুঁড়লাম নিশিরাতের নিস্তব্ধ বনভূমি কেঁপে উঠল। ভয় পেয়ে ডানা ঝটফট করে উড়ে চলে গেল কতগুলো পাখি। কিন্তু ভূত প্রেত কি কোন দুষ্টু বদমায়েস লোকের ছায়াও দেখলাম না।

কিছুই দেখতে পাবে না সাহেব, হঠাৎ যেন কঁকিয়ে চিৎকার করে বলল টুংকু—ওদের দেখা যায় না—আ—আ—আ—মর্মান্তিক আর্তনাদ করতে করতে ছুটে চলে গেল জঙ্গলের ভেতরে তার বাড়ির দিকে। সেই যে গেল আর

ফিরে এল না—

আসবে না আমি জানতাম। মালয়, সুমাত্রা এবং সমগ্র ডাচ অধিকৃত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশের বাসিন্দা—ভূতপ্রেতকে দেবতার মত ভক্তি করে—পবিত্র বা সেক্রেড বলে মনে করে—এই পর্যন্ত বলার পরে সেই প্রত্যক্ষদর্শী আরও কিছু বলেছিলেন কিনা, জানা যায় না। কিন্তু সেই প্রেতবিদ্যার বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদকীয় নোটে আছে—

এসব ১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা। মালয়, সুমাত্রা এবং ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করতে করতে এই অদ্ভুত ভুতুড়ে ঘটনা যিনি দেখেছিলেন তিনি একজন ডাচ বা ওলন্দাজ। নাম—

ডবলিউ. জি. গ্রটেনডিক্। হল্যান্ডের ডরড্রেক্ট অঞ্চলের বাসিন্দা। গ্রটেনডিক্‌সাহেব হল্যান্ডের সোসাইটি ফর দি ফিজিক্যাল রিসার্চের (পরলোকবিদদের সমিতি) সভায় এই ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন (১৯০৬ সালের ৩০শে মার্চ)। আর সেই প্রসঙ্গেই বলেছেন এই মধ্যরাত্রে প্রায় নিঃশব্দ ঘরে পাথরের টুকরো ছোঁড়ে আর সেইসব পাথর চক্রাকারে উড়ে উড়ে এসে আস্তে আস্তে পড়ে—এসব হল—

'পলটারজিস্ট' প্রেতের কাণ্ড। পলটার—গ্রীক শব্দ, অর্থ হল—শব্দ করা, আর 'জিস্ট' হল স্পিরিট বা প্রেতাত্মা। এক ধরনের শব্দমুখর ও ভয়ংকর প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রেত বা পিশাচ যারা ঠুক ঠুক করে এমন মৃদু কিন্তু বিরক্তিকর আওয়াজ করে যার কোন ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি—

ডাচ ইষ্টইণ্ডিজে এই 'পলটারজিস্ট' পিশাচের উৎপাত খুব বেশি—very common in Dutch East Indies···

পর্ণাদেবী! প্রেতিনী আর পিশাচের সত্যি ঘটনাগুলো শুনলেন। সত্যিই বলতে হবে। সন সাল তারিখ দিয়ে বিবরণ দিচ্ছে প্রতক্ষ্যদর্শীরা। এবার অন্যরকম প্রেতের আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার আগে আপনাকে বলা খুব দরকার, শুধু বেদে, পুরাণে বা লোককাহিনী কি লোক কাব্যেই নয়—ভূতের কথা বোধহয় সবচেয়ে বেশি আছে তন্ত্রে। তন্ত্রমতে ভূত—তের জাতের—(১) ভূতপেত্নী (২) ব্রহ্মদৈত্য (৩) শাঁখচুন্নি (৪) প্রেত—সাধারণ ভূত (৫) পিশাচ (৬) কন্দকাটা (৭) খেচর (৮) আলেয়া (৯) বেতাল (১০) কালজঙ্ঘ, (১১) নিশি (১২) শঙ্খী (১৩) বাস্তু ভূত এবং বাস্তু ভূতিনী!

পর্ণাদেবী বলাবাহুল্য প্রতিটি জাতের ভূতের ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা কি তাদের নানা অভিনব ও বৈচিত্রময় দৌরাত্মের বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। আর অত্যন্ত Authentic এবং নির্ভরযোগ্য না হলে তো সেসব আপনার মত

অনুসন্ধিৎসু ও প্রখর গবেষকমনা মহিলাকে বলা কোন মতেই উচিৎ নয়।

আর পিশাচ এবং প্রেতিনীর আলোচনায় আমি আলেয়া, শঙ্খী বা শাঁখচুন্নি, নিশি, ঝেরু ইত্যাদি ভূতের কথাও বলেছি। কিন্তু থাক সেসব কথা।

আমার কি মনে হয় জানেন পর্ণাদেবী, শাঁখচুন্নির কথাতেই মনে হচ্ছে, আমাদের দেশের ডাকিনী যোগিনী পিশাচী এবং চেড়ীর মতই পৃথিবীর সব ভূখন্ডে—সব কালেই বুঝি নারী প্রেতাত্মার দাপট খুব বেশি। যাক আগে ঘটনাটা শুনুন—

বার্লিনের উপকণ্ঠে আণ্ডারডেনলিডেনে আছে একটি প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। যেমন বিশাল তেমনি অদ্ভুত বৈচিত্রময় চতুষ্কোণ তার আকৃতি। অসংখ্য তার বড় বড় ঘর, অগণন তার অলিন্দ—রীতিমত গোলক ধাঁধাঁর মত। আর প্রতিটি সুরম্যকক্ষ মহার্ঘ ও সুদৃশ্য আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। সুদীর্ঘ অলিন্দের দুদিকের দেওয়ালে অতীত রাজপুরুষদের প্রতিকৃতি। কোথাও বা ক্রশচিহ্নের মত আড়াআড়ি করে শোভা পাচ্ছে তীক্ষ্ন ধার দুটো তরবারি—রাজকীয় প্রতাপের প্রতীক।

তিনি অতি সন্তর্পনে নিঃশব্দ পায়ে দীর্ঘ বারান্দা পেরিয়ে চলেছিলেন। তাঁর হাতে জ্বলন্ত একটা মোমবাতি। তার শিখাটিকে বাতাস থেকে আড়াল করার জন্য আর একটা হাত বেড় দিয়ে ধরেছেন।

তাঁর গায়ে বহুমূল্য মহার্ঘ পোশাক। হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ রক্তবর্ণ ভেলভেটের কোর্টের সোনার বোতাম থেকে মোমের আলো ঠিকরে পড়ছে। তাকে অনুসরণ করছে তার দুই দেহরক্ষী। তাদের হাতে খাপখোলা তলোয়ার আবছায়া অন্ধকারেও ঝিকমিক করছে।

খট—খট—খট—তিনজোড়া পায়ের শব্দ দেওয়ালে দেওয়ালে ঠোক্কর খেয়ে প্রগাঢ় স্তব্ধতার ভেতরে তলিয়ে যাচ্ছে। কে জানে, কোথয় কোন গোপন অভিসারে চলেছেন এই রাজপুরুষ! কিন্তু তিনি জানেন না, কল্পনাও করতে পারেন নি—কি ভয়ানক আর নৃশংস ঘটনার শিকার হতে চলেছেন তিনি।

খট—খট—খট—সদলবলে চলেছেন তো চলেছেনই। কিন্তু অনেক—অনেক দূর গিয়ে সেই অলিন্দটা যেখানে একেবারে সমকোণে বেঁকে চলে গিয়েছে রানীদের মহলে—ঠিক সেইখানে এসে বাঁকটা ঘুরতেই তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। একেবারে তাঁর মুখোমুখি পথ আগলে দাঁড়িয়ে এক দীর্ঘ রমনী মূর্তি। সাদা ধবধবে একটা চাদরে তার আপাদমস্তক ঢাকা।

তিনি কিন্তু ভয় পেলেন না। কেন না, তিনি শুনেছিলেন, বহু যুগের প্রাচীন এই প্রাসাদে নাকি এক বাস্তুভূতিনী বা প্রেতিনী আছেন! সাদা চাদরে নিজেকে আবৃত করে নিশিরাত্রে টহল দেয় প্যালেশের চারিদিকে। তাকে সকলে বলে—হোয়াইট লেডী!

ম্যাডাম এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছেন?

কোন সাড়া দিল না সে। কেন যেন তার ডান হাতটা একটু নিচু—

সেই হাতে ছিল ৬০৬ নং ঘরের বড় একটা চাবি! হঠাৎ সেই চাবি দিয়ে সেই রাজপুরুষের মাথায় খুব জোরে আঘাত করল। তিনি টলে পড়ে গেলেন মাটিতে। দেহরক্ষী দুটো ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। আর তরল অন্ধকারে সেই দীর্ঘ ছায়ামূর্তি একটা সাদা রাজহাঁসের মতই ভেসে ভেসে অলিন্দের আর এক প্রান্তের ঘন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরদিনই শোনা গেল, সেই রাজকীয় ঘোষণা—জার্মানীর সম্রাট মহামান্য জন সিগিসমাণ্ডের অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয়েছে। এসব ১৭১৯ খ্রীস্টাব্দের কথা।

কিন্তু কোন রমনীর প্রেতাত্মা বাস্তুভূতিনী হয়ে প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে পরিক্রমা করে? তাহলেই চলে যেতে হয় ইতিহাসে। ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া বা জার্মানীর প্রথম নৃপতি ফ্রেডারিক তৈরি করেছিল এই চতুষ্কোণ রাজপ্রাসাদ! ফ্রেডারিকের পরে তার হোয়েনজোলার্নস রাজবংশের রাজারা যুগের পর যুগ ধরে এই প্রাসাদ থেকেই দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব পরিচালনা করছিল। এই অট্টালিকারই কোন সুরম্য হলঘরে তাদের আলো ঝলমল বর্ণাঢ্য রাজসভা বসত মহাসমারোহে। হোয়েনজোলার্নসরা প্রচণ্ড স্বেচ্ছাচারী এবং একনায়কত্বের পূজারী। তারা প্রজাদের বলত, শোন—আমি রাজা—আমিই তোমাদের লর্ড (প্রভু) আমিই তোমাদের ঈশ্বর—

তারা নিরপরাধ মানুষের ওপর নির্মম অত্যাচার করে পৈশাচিক উল্লাসে অট্টহাসি হাসত।

এই রকম একটি রাজপ্রাসাদ যেখানে কত রক্তপাত, কত খুন জখম হয়েছে যেখানে নিষ্ঠুর নৃপতিদের কামনা বাসনা, ক্রোধ বিদ্বেষের উষ্ণ নিশ্বাসের স্রোত বয়ে গিয়েছে, বলাবাহুল্য সেই অভিশপ্ত প্রাচীন অট্টালিকার পাথরে পাথরে মিশে রয়েছে তাদের দুঃসহ বীভৎস স্মৃতি।

কিং ফ্রেডারিক, যিনি এই প্রাসাদ নির্মান করেছিলেন তিনিই স্বয়ং ছিলেন নিষ্ঠুর, রক্তলোলুপ বন্যজন্তুর মত হিংস্র। তিনি এই প্রাসাদের একটি সুউচ্চ স্তম্ভে বসিয়ে রেখেছিলেন একটি আয়রন মেডেন বা লৌহকুমারী—মানুষকে নির্মম ভাবে হত্যা করার অভিনব এক যন্ত্র—মোটামুটি তরুণী মেয়ের আদলে লোহার তৈরি একটি নারীমূর্তি। সেই মূর্তির সর্বাঙ্গে তীক্ষ্ণধার বড় বড় লোহার সুচালো নাল বসানো। যার ওপর রাজরোশ পড়েছে, যাকে হত্যা করতে হবে সেই হতভাগাকে সেই লৌহমানবীর শায়িত মূর্তির ওপর ফেলে চেপে চেপে পিষে লোহার ধারালো নালে একেবারে গেঁথে ফেলা হত। মর্মান্তিক যন্ত্রণায় করুণ আর্তনাদ করতে করতে এক সময়ে থেমে যেত। তাজা রক্তে ভেসে যেত বধ্যভূমি। যেই মানুষটার দেহ অসাড় হয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গে সেই শায়িত লৌহকুমারীর পিঠের নিচে গোপন সুড়ঙ্গ পথের দরজা খুলে যেত আর একটা শব্দ উঠত—ঝপ।

সেই ক্ষতবিক্ষত প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটা গভীর অন্ধকার খাদের ভেতরে

পড়ে যেত।

শোনা যায় ফ্রেডরিকের বিলাসের সহচরী রূপসী তরুণীর অনুকরণে তৈরি করা হয়েছিল নারীত্বের সেই বীভৎস ও ভয়াল এবং বিধ্বংসী রূপ—সেই আইরন মেডেন—মারণযন্ত্র। ইতিহাসে আছে—Terrible instrument of torture and death—history has ever witnessed!

ফ্রেডরিকের সেই প্রেয়সী মারা গেল। তারপর থেকেই গভীর রাত্রে বার্লিনের উপকণ্ঠে আণ্টারড্রেনলিনডেনের সেই প্রাসাদের অলিন্দে কখনো বা কোন কার্নিশের আড়ালে এক রমনীর প্রেতাত্মা দেখা যেতে লাগল। তার কাজই ছিল তার রূপকার কিং ফ্রেডরিকের বংশধরদের দেখা দিয়ে তাদের সতর্ক করে দিত ভবিষ্যতের আসন্ন অমঙ্গল সম্বন্ধে।

যারা তাকে দেখেছে তারা বলে তার পরণে নাকি সাদা গোলাপের শ্বেতশুভ্র পোশাক। তার মুখখানা কুমারী মেয়েদের মত প্রায় স্বচ্ছ বহুমূল্য এক মিহিবস্ত্রের ওড়নায় আবৃত। সেই লৌহকুমারীর মূর্তিও ঠিক এইভাবে তৈরি করা হয়েছিল।

সেই 'হোয়াইট লেডী-ই' আজও বহুযুগের প্রাচীন সেই অভিশপ্ত রাজপ্রাসাদে সম্রাজ্ঞীর মহিমায় বিরাজ করছেন।

অবশ্য 'হোয়াইট লেডীর' আরও একটি উৎসের কথাও শোনা যায়—কেউ কেউ বলে নিশিরাত্রে আণ্টারডেনলিনের রয়্যাল প্যালেশে ধবধবে সাদা পোশাক পরা যে রমনীর ছায়াদেহকে ইতস্তত ঘুরতে দেখা যায়, সে আর কেউ নয় একাদশ শতাব্দীর নৃপতি দ্বিতীয় জোয়াচিনের সুন্দরী উপপত্নী অ্যান্নাসিডো। জোয়াচিন ছিলেন প্রায় অর্দ্ধোন্মাদ! তিনি প্রজাদের সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার বাজেয়াপ্ত করে সেসব তার প্রেয়সীর পায়ে ঢেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু—

জোয়াচিনের ছেলে ছিল বাপের একেবারে উল্টো স্বভাবের লোক। অত্যন্ত সৎ এবং কঠোর নীতিবাদী। সে অ্যান্নাকে স্প্যাণ্ডাউয়ের দুর্ভেদ্য কারাগারে বন্দী করে রেখেছিল। সেইখানেই খুব করুণ অবস্থার ভেতরে অ্যান্না মারা যায়। কেউ কেউ বলে সেই অ্যান্নারই স্পিরিট তার প্রণয়ীর স্মৃতি জড়ানো রয়্যাল প্যালেসে আসে।

বাস্তুভূতিনী হোয়াইট লেডীর আরও আছে এক দাবীদার। একেবারে গোড়ার দিকের এক হোয়েনজোলার্ন'স নৃপতি মারগ্রেভ আলবার্ট ছিলেন অসামান্য রূপবান ও সুপুরুষ। তিনি এক সুন্দরী বিধবা তরুণী অ্যাগনেস দ্য অল্যামুণ্ডাব প্রেমে পড়ে গেলেন পাগলের মত। ঘোষণা করে বসলেন অ্যাগনেস যদি তার চার চোখের বাধাটা দূর করে দিতে পারে তাহলে তাকে তিনি বিয়ে করতে পারেন—

এই কথা শুনেই অ্যাগনেস আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠল। হাসতে হাসতেই তার দুটো বাচ্চার মাথার পিছনদিকে সোনার পিন বিঁধিয়ে হত্যা করল। কিন্তু—

তারপরে অ্যাগনেস জানতে পারল, তার সন্তান নয় তার বাবা—মা-কে ইঙ্গিত করেছেন মারগ্রেভ ' ছেলে দুটোর শোকে একেবারে পাগল হয়ে গেল সে। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে তীব্র একটা জ্বালায় অস্থির হয়ে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায় সে।

১৭১৯ খৃষ্টাব্দে জন সিগিসমুণ্ডের পরে আর হোয়াইট লেডীকে দেখা যায় নি। এমন কি হোয়েনজোলার্ন'স বংশের অত্যন্ত প্রতাপশালী কিন্তু খুব সাংঘাসিধের মনের খ্যাতিমান নৃপতি ফ্রেডরিক উইলিয়াম এবং তার দৌহিত্র ফ্রেডরিক দি গ্রেটকেও কখনো দেখা দেয়নি সেই শ্বেতবসনাবৃত রমনীর প্রেতাত্মা।

ইতিহাস বলে খুব শক্ত মনের মানুষ ফ্রেডরিক দি গ্রেটের ভূতপ্রেতে বিশ্বাস ছিল না বলেই হোয়াইট লেডী তার মুখোমুখি হয়নি। কিন্তু জীবনের একেবারে শেষপ্রান্তে তার বিশ্বাসে চিড় ধরেছিল। কি রকম?

১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠল। ঠিক সেই সময় ফ্রেডরিক দি গ্রেটের ভাইপো দ্বিতীয় ফ্রেডরিক উইলিয়াম আক্রমণ করে বসলেন ফ্রান্স। আর প্যারিস নগরীর প্রাচীরের কাছে চলে এলেন তার সেনাবাহিনী নিয়ে। ঠিক সেই সময় একদিন গভীর রাতে উইলিয়াম যখন প্যারিসের উপকণ্ঠে ভার্ডুনের সরাইখানায় বসে মদ্যপান করছিলেন তখন হঠাৎ দূরে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা কালো কালো মদের পিপের স্তূপের ওপরে একটা সাদা কুয়াশার রেখায় ফুটে উঠল ফ্রেডরিক দি গ্রেটের সেই দৃপ্ত মূর্তি! গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, উইলিয়াম, তুমি এই মুহূর্তে তোমার ট্রুপস নিয়ে প্যারিস ছেড়ে চলে যাও—তানাহলে তোমার ভয়ানক অমঙ্গল হবে—ভুলে যেও না। হোয়াইট লেডী আমাকে দেখা দিয়ে একথা জানিয়েছে—

হোয়াইট লেডী বলেছে! উইলিয়াম এই ওয়ার্নিং খুব সিরিয়াসলি নিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনী নিয়ে বার্লিনে ফিরে এসেছিলেন আর তার ফলেই আরও পাঁচ পাঁচটা বছর নিশ্চিন্ত সুখে রাজত্ব করতে পেরেছিলেন।

কেন যেন শ্বেতবসনা সেই লৌহমানবীর প্রেতাত্মা বা হোয়াইট লেডীর ফ্রান্সের ওপর খুব দুর্বলতা ছিল। জার্মানীর সর্বপ্রথম রাজা ফ্রেডরিক তার যে প্রণয়িনীর আদলে আইরণমেডেন তৈরি করেছিলেন সে ফ্রান্সের মেয়ে ছিল বলেই?

১৮০৬ সালে শরতের শুরুতে জার্মানীর সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘনীভূত হয়ে উঠছিল, সেই সময় একদিন দারুণ দুর্যোগের গভীর রাত্রে আণ্টারডেনলিনডেনের সেই রাজপ্রাসাদের অলিন্দের একপ্রান্তে একটি স্তম্ভের আড়ালে কে জানে কার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল হোয়াইট লেডী।

খট—খট—খট—ঝড়ো বাতাসের গর্জনের প্রচণ্ড শব্দকেও ছাপিয়ে কার যেন পায়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হল রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে দেওয়ালে।

রাজকুমার লুইস। লুইস গোপন অভিসার শেষ করে তার খাসকক্ষে ফিরছে না। আকণ্ঠ মদ্যপানে আর দীর্ঘ সময়ব্যাপী মিথুনলীলার আশ্লেষে ভয়ানক ক্লান্ত দেহটা কোনরকমে টেনে নিয়ে চলেছেন—

কে? হঠাৎ ভয়ে চিৎকার করে উঠল লুইস।

ঝাপসা অন্ধকারে শ্বেতবসনা রমনীর ছায়ামূর্তি ঝিকমিক করছে। তর্জনী তুলে শাসিয়ে শাসিয়ে কি জন্য যেন লুইসকে সতর্ক করল হোয়াইট লেডী! তারপরই তার নিজের গলায় দুটো হাত চেপে ধরে ফাঁসের মুদ্রা করেই হাল্কা অন্ধকারে একটুকরো সাদা মেঘের মতই অদৃশ্য হয়ে গেল।

নেশার ঘোরে হোয়াইট লেডীর ইঙ্গিতটা ধরতে পারলেন না লুইস। চোখদুটো রগড়ে নিয়ে অন্ধকার নির্জন জনমানবহীন অলিন্দের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল—ভুল—ওসব চোখের ভুল।

ওদিকে ঝড়ের মত নেপোলিয়ন বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে জার্মানীর দিকে এগিয়ে আসছে। প্রিন্স লুইসও যুদ্ধযাত্রা করলেন। রাত্রি নেমে এল ফ্রান্সের সীমান্তে সেলফেল্ডে। সেলফেল্ডের শিবিরে বিশ্রাম করছেন রাজকুমার। হঠাৎ সেখানে এল অপরূপ রূপসী এক গ্রাম্য যুবতী। হাতে ব্যাঞ্জো।

ব্যাঞ্জো বাজিয়ে আপনার মনোরঞ্জন করতে এসেছে মেয়েটি মঁসিয়ে—অনুচররা বলল।

বাঃ—বাঃ! তাই নাকি? খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন লুইস। বাজাও—বাজাও। তুমি যতগুলো সুর বাজাবে আমি ঠিক ততগুলো ফরাসী সৈন্য খতম করব—

মেয়েটি বাজাতে শুরু করল। তার মধুর সুরের মূর্ছনায় সেই নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি যেন কেমন আচ্ছন্ন আর বিবশ হয়ে এল। প্রহরে প্রহরে রাত বেড়ে চলল। মেয়েটি বিরামহীনভাবে বাজিয়েই চলেছে।

বাজনার করুণ মধুর সুরের আবেশে রাজকুমারের চোখদুটো জড়িয়ে এল। দেখতে দেখতে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন তিনি। তখনো ঘরের বাতাসে একটানা ব্যাঞ্জোর ঝঙ্কার ধ্বনিত হয়ে চলেছে!

পুবের আকাশে ভোরের রেখা জাগল। বাজনা থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কেন যেন মাথা নিচু করে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল সেই তরুণী। অনেক ডেকেও রাজকুমারের সাড়া পাওয়া গেল না। তার গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে যেতেই তার প্রাণহীন দেহটা চেয়ার থেকে টলে পড়ে গেল মাটিতে!

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়াতে আর একবার দেখা গিয়েছিল হোয়াইট লেডীকে।

কারো অজানা নেই জার্মানীর যুদ্ধবাজ সম্রাট কাইজার উইলিয়ম-ই সারা পৃথিবীকে যুদ্ধে নামিয়েছিলেন। তিনিই পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের অগ্রগণ্য মহানায়ক। যখন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্দিনান্দ আততায়ীর গুলিতে সস্ত্রীক

নিহত হলেন তখন তাদের সন্দেহ হল চিরশত্রু সার্বিয়ার কোন বিপ্লবীই তাদের হত্যা করেছে। গভীর রাত্রে নিজের গোপন মন্ত্রণাকক্ষে বসে কাইজার অস্ট্রিয়া আর সার্বিয়ার সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে কি করে ইংল্যান্ড ও রাশিয়াকে যুদ্ধে লিপ্ত করা যায় সেই ব্যাপক চক্রান্তের বিশদ পরিকল্পনা করেছিলেন। ঠিক সেই সময় যেন সেই ঘরের মাটি ফুঁড়েই উঠে এসেছিল শ্বেতবসনাবৃত সেই রমনী। মুখে ধারালো হাসি। কাইজারকে অশুভ একটা ইঙ্গিত দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল অশ্টারডেনলিনডেনের রাজপ্রাসাদের বাস্তুভূতিনী—হোয়াইট লেডী।

সেই থেকে কাইজারের মনে ভয় ছিল যে কোন সময় তিনি মারা যাবেন। সত্যিই মারা গেলেন। হোয়াইট লেডীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হল—চার বছর পর। নির্মমভাবে পরাজিত হল জার্মানী। উইলিয়ামের 'কাইজার' উপাধি কেড়ে নিয়ে তাকে রাজপ্রাসাদ থেকে বিতাড়িত করে দুর্গের নির্জন দ্বীপে দীর্ঘ নির্বাসনে পাঠানো হল। সেইখানেই অত্যন্ত অসহায় আর করুণ অবস্থায় তার মৃত্যুতে হোয়েনজোলার্নস বংশের এমন কেউ আর রইল না যাকে হোয়াইট লেডী সতর্ক করে দিতে পারে—

পর্ণাদেবী! পরলোকবিদ জন ক্যানিংসাহেব হোয়াইট লেডীর এই বৃত্তান্ত লিখে শেষে বলেছেন—বাস্তুভিটে ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত বাস্তুপ্রেতিণী কখনো গৃহ ছাড়ে না। ২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৫। বার্লিনে বোমাবর্ষণ শুরু হল। রাশিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা একযোগে বোমা ফেলতে আরম্ভ করল। বিধ্বস্ত হয়ে গেল অস্টারডেনলিনডেনের সেই তিনশো বছরের প্রাচীন প্রাসাদ। আর দেখা গেল—একটা আশ্চর্য দৃশ্য—

জ্বলন্ত সেই রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তুপের ওপর দিয়ে সাদা এক টুকরো মেঘের মতই ধীর পায়ে চলে যাচ্ছে হোয়াইট লেডী।

বাস্তুপ্রেতিনীর বৃত্তান্ত কেমন লাগল জানালে খুশি হব পর্ণাদেবী।

নানাজাতের ভূতের প্রসঙ্গ প্রায় শেষ হয়ে এল। কিন্তু মনে রাখবেন বিষয়টি অফুরান। শুধু জার্মানীতে নয়। আমাদের দেশেও এবং পৃথিবীর যে কোন দেশেরই প্রাচীন কোন রাজপ্রাসাদে কি কোন ভগ্ন জীর্ণ অট্টালিকার আড়ালে বাস্তুপ্রেতিনীর দেখা মিলতে পারে। অতএব থাক এই প্রসঙ্গ—

এই চিঠিরই গোড়াতে বোধহয় বলেছি প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদে প্রেতের উল্লেখ আছে। কিন্তু পর্ণাদেবী বেদেরও হাজার হাজার বছর আগে অনার্য সমাজেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল এই পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র—'ও নমঃ শিবায়!' তারপর এই মন্ত্র যুগযুগান্তর ধরে ধ্বনিত হয়েছে এই উপমহাদেশের বনে প্রান্তরে।

এই শিব—দেবাদিদেব শিব থেকেই প্রেতের সৃষ্টি। শিবানুচর অন্নদা নিজেই বলেছেন 'ভূত নাচাইয়া পতি ফের ঘরে ঘরে' এই—সময়টা ছিল কার্ত্তিক মাস। কৃষ্ণাচতুর্দশী। এইজন্য এই তিথিকে—ভূত চতুর্দশীও বলে।

সমস্ত ভূতই মহাদেবের সৃষ্টি। কিন্তু শিবের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর খাসমহলের প্রেত হল—ব্রহ্মদৈত্য। এরা বেল বা অশ্বথ গাছে থাকে। ভূতের বংশে এরা নৈকষ্য কুলীন। আর সব প্রেতরা একে সমীহ করে। নিতান্ত উত্যক্ত না করলে এরা কখনো মানুষের ক্ষতি করে না। কিন্তু সত্যিই কি তাই ?

তাহলে ১৮৯০ সালে সংস্কৃত কলেজের প্রখ্যাত পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্কবাগীশ সেই ঝড়-জলের রাতে বারে বারে অত্যন্ত অভাবনীয় সংকটে পড়েছিলেন কেন ? কেন শবতের পরিস্কার নির্মেঘ আকাশে হঠাৎ গিন্নী শকুনের কালো ঠোঁটের মত এক টুকরো মেঘ দেখা দিয়েছিল। আর সেই মেঘ দেখতে দেখতে সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ছিল। আর প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল সেইসঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছিল। এই দারুণ দুর্যোগের পটভূমির আড়ালে কি কোন প্রেতের অলৌকিক চক্রান্ত ছিল ? তাহলে ঘটনাটা শুনুন।

দুপুরের খবরোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। ধুধু মাঠের বুক চিরে চলে যাওয়া লালমাটির মেঠো পথ ধরে চলেছেন এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ—রামনারায়ণ তর্কবাগীশ। মাথায় পাট করে দেওয়া ভিজে গামছা। গায়ে নামাবলী। তার আড়ালে সাদা ফটফটে পৈত্যে ঝিকমিক করছে।

গ্রামে গ্রামে ঘুরে খাজনা আদায় করতে বেরিয়েছেন রামনারায়ণ। ঘুরতে ঘুরতেই বেলা পড়ে এল। তিনি দেখলেন তার নিজের গ্রাম সাকনারা থেকে প্রায় দশ-বারো মাইল দূরে চলে এসেছিলেন। এবার ফেরা দরকার। কিন্তু গাঁয়ে ফেরা তাঁর হল না। আকাশে এমন মেঘ করল যে সেই বিকেলেই যেন গভীর রাতের অন্ধকার নেমে এল। শুরু হল ঝড় আর অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। রামনারায়ণ তাড়াতাড়ি কাছেই এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন।

আরে! আমার কি সৌভাগ্য! আপনি আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, গৃহস্বামী খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, আর আজ আপনার যাওয়া হবে না বলেই দ্রুতপায়ে ভেতরে চলে গেল। আর একটু পরেই ব্রাহ্মণী গাড়ুতে করে পা ধোয়ার জল নিয়ে এল।

—আপনি আজ আমার এখানে স্বপাক আহার করবেন, বাড়ির মালিক বলল, কার মুখ দেখে যে আজ উঠেছিলাম—

না—না—রান্নাবান্নার কি দরকার। রামনারায়ণ শুনেছে ভদ্রলোক অত্যন্ত কৃপন। তাই মৃদু আপত্তি জানালো। কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতে চৌদ্দ-পনের বছরের একটা ফুটফুটে মেয়ে এল। তার হাতে মালসা, তার ভেতরে চাল ডাল আর একটা উনান—

আমার কন্যা ঠাকুরমশায়, ব্রাহ্মণ বলল, বাড়ির মেয়েরা আপনাকে না খাইয়ে ছাড়বেই না—

খট—ঝড়-বৃষ্টিকেও ছাপিয়ে অন্ধকার উঠোনে যেন কিসের শব্দ হল। মেয়েটির চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। মালিক কিন্তু ভ্রুক্ষেপই করল না। কিসের আওয়াজ হল ?

ও—কিছু না—কিছু না—ঝড়ে কোন বাঁশটাঁশ পড়ে গেল হয়ত—বলেই খুব দ্রুত পায়ে একরকম পালিয়েই চলে গেল গৃহস্বামী।

উনান ধরালেন রামনারায়ণ। মালসা চাপিয়ে দিলেন। একটু তেতে উঠুক—তারপর জল ঢালবেন। এমন সময়—

খট্—খট্—খট্—মনে হল খড়ম পায়ে দিয়ে কেউ উঠোন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ছুটে বাইরে এলেন রামনারায়ণ। স্পষ্ট দেখলেন—বেশ দীর্ঘ এক ছায়ামূর্তি। গায়ে সাদা কাপড় জড়ানো। উঠোনের কোন ঝাপড়া বেলগাছের নিচে ঘন জমাট অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রামনারায়ণ বেশ চিন্তিত হয়েই রান্নায় বসলেন। এবাড়িতে প্রেতের উপদ্রব আছে। কিন্তু কেন এখানে অশরীরি আত্মার আনাগোনা। এসব ভাবতে ভাবতেই মালসায় জল ঢেলে যেই ডাল ছেড়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে একটা আস্ত ইট এসে পড়ল মালসার ভেতরে। মালসা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। জল পড়ে উনান নিভে গেল।

বাইরে উঠোনে ঝড়ো বাতাসে বেলগাছ ডাইনে বাঁয়ে মাথা দোলাতে লাগল। আর একটানা বৃষ্টির শব্দ এবং মাথাপাগলা বাতাসের সরোষ ঐক্যতানের ভেতরে অনেক—অনেক দূরে থেকে অদ্ভুত উচ্চারণে ঘ্যাসঘেসে ভারি গলায় কে যেন এই কথাগুলো বলল—শুধু চাল আর ডাল দিয়ে তোমরা যাকে কৃপনের মত আপ্যায়ন করছ—তিনি যে কত বড় পণ্ডিত আর গুণী তোমরা জান না। এই যে ঝড়বৃষ্টি এবং পণ্ডিতের এখানে আটকে যাওয়া—সব—সব আমারই সৃষ্টি। তোমাদের এই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ অতিথির গয়ায় যাওয়ার বাসনা আছে। আমার মুক্তির জন্য অর্থাৎ গয়ায় পিণ্ডদানের জন্য ওঁকে এখানে এনে বন্দী করে ফেলেছি—শেষদিকের কথাগুলো বৃষ্টির শব্দে বিলীন হয়ে গেল।

রান্না আর করবেন না ঠাকুরমশায়? মালিকের মেয়েটি মিষ্টি গলায় বলল, আমি আর একটা মালসা এনে দিচ্ছি—বলে বাড়ির ভেতরে পা বাড়াতেই আর একটা ইট এসে পড়ল উনানে। মাটির উনানটাই ভেঙ্গে ছত্রখান হয়ে গেল।

মা, আমি সেই ব্রহ্মদৈত্যর ছায়ামূর্তি নিজে দেখেছি, মেয়েটি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, আমাদের এমন কপাল, এতবড় মানী অতিথিকে কিছুতেই আপ্যায়ন করতেই দিল না—

গৃহস্বামীর মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া থমথম করতে লাগল। মনে হল, সাবেকদিনের কোন ঘটনা তার মনের ভেতরে নাড়াচাড়া চলছে। আস্তে আস্তে বলল, পণ্ডিতমশায় কি আর বলব আপনাকে—প্রায় দুইপুরুষ ধরে আমরা এই প্রেতের দৌরাত্ম্য সহ্য করছি বলতে বলতে কেমন ভার হয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর। কি করব বলুন, বাড়ি ছেড়ে তো চলে যেতে পারি না—বাপচোদ্দপুরুষের ভিটে—

এখানে কি কারো অপঘাত মৃত্যু হয়েছিল?

শুনেছি, আমার পিতৃদেবের এক কাকা নাকি এই বাড়িরই উঠোনের একটা

বেলগাছ কাটতে গিয়ে আঘাত পান—আর সেই আঘাতেই মারা যান—

রামনারায়ণ আর একটা কথাও বললে না। তাঁর মনে হল, বেশ শক্তিসম্পন্ন এই প্রেত। তাঁর গয়ায় যাওয়ার সংকল্প জানল কি করে? শুধু গৃহস্বামীর মত সেই ঠাকুরদার নাম আর গোত্রটা একটা চিরকুটে লিখে নিয়ে পরদিন ভোরে বাড়ি ফিরে গেলেন।

কয়েকদিন পরেই পণ্ডিত রামনারায়ণ গয়া রওনা হলেন সদল বলে। তখন রেল আসে নি। পায়ে হেঁটে চলেছে তীর্থযাত্রীরা। প্রকৃতির ডাকে বাধ্য হয়ে রামনারায়ণকে থামতে হল। সঙ্গীরা এগিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর হাত পা ধুয়ে তাড়াতাড়ি ছুটতে লাগলেন রামনারায়ণ—সাথীদের ধরতে হবে। কিন্তু নির্বিঘ্নে যাওয়া তার কপালে ছিল না! মাথায় হাত বুলিয়ে দেখলেন মাথা খালি। সর্বনাশ! তাঁর মাথার পাগড়ি সেই পুকুরের পাড়ে কদমগাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে চলে এসেছেন। আর তার ভেতরেই যে নাম গোত্র লেখা চিরকুটটা আছে—

আবার ছুট—ছুট—ছুটে এসে দেখলেন, গাছের ডালেই পাগড়ীটা বাতাসে পত পত করে উড়ছে। আশ্চর্য! তাকে দেখেই পাগড়িটা উড়তে উড়তে এসে তাঁর হাতে পড়ল।

এইবার নিশ্চিন্ত মনে রামনারায়ণ সঙ্গীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য খুব উদ্বিগ্ন হয়ে জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করলেন। কিন্তু—কি অদ্ভুত ব্যাপার! তাঁকে আর কষ্ট করে হাঁটতেই হল না। হঠাৎ কোথায় থেকে ঝাঁপিয়ে এল হুহু বাতাস। আর সেই বাতাসকে প্রপেলারের মত কেটে কেটে কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। বাদবাকী দীর্ঘপথটুকু তাঁর আর কোন কষ্টই রইল না।

গয়ায় এসে খুব যত্ন করে তার পিণ্ড দিলেন রামনারায়ণ ঠিক যেমন শপথ করেছিলেন। সেই পারলৌকিক ক্রিয়ায় পরলোকে প্রেতের শান্তির প্রার্থনা করার মন্ত্রগুলো খুব জোরে জোরে বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন। আর—

সেইরাত্রেই প্রচণ্ড ঝড় শুরু হল। ধুলোর ঝড়। সেই ধুধু ফাঁকা মাঠ যেখানে সে ঝড়-জলে পড়েছিল—সেই মাঠে ধুলোর এক একটা ঘূর্ণি প্রেতচ্ছায়ার মত অবয়ব নিয়ে সাঁ সাঁ করে ওপরের দিকে উঠেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। সেই ঘন কুয়াশার মত ধুলোর পুরু আস্তরণের ভেতরে এক সৌমদর্শন ও দীর্ঘকায় বৃদ্ধের ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে দুহাত তুলে কাকে যেন আশীর্বাদ করছে—

ঘুম ভেঙ্গে গেল।

ধড়মড় করে গয়ার ধর্মশালার তক্তাপোষে উঠে বসলেন পণ্ডিত রামনারায়ণ। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন—আর সে বাড়িতে সেই ব্রহ্মদৈত্যর কোন উপদ্রব হয়নি—

পর্ণাদেবী। প্রায় ছেচল্লিশ বছর আগে বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটি বা বঙ্গদেশীয় তত্ত্ববিদ্যা সমিতির মুখপত্র ব্রহ্মবিদ্যা পত্রিকায় এই ঘটনার বিবরণ মুদ্রিত হয়েছিল। শেষে ফুটনোটে লেখকের নাম—ঠিকানা লেখা ছিল—

রামঅক্ষয় চ্যাটার্জী (রায়বাহাদুর)

১৪০, জঙ্গমবাড়ি সিটি। বেনারস।

পর্ণাদেবী। এই ব্রহ্মদৈত্যের কথা বলতে বলতেই মনে পড়ে গেল নৈকষ্যকুলীন ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মার মত মুসলমানদের ভেতরেও খুব ডিগনিফায়েড এক মোল্লা কি মৌলবীভূত আছে। তাকে জিন বা জান বলে। আবার আফগানিস্থানে আরব পারশ্যে বলে অফ্রিদ, মারীদ, আরবী বা কাবুলী।

যাক এবার এক প্রত্যক্ষদর্শীর জবানীতে মোল্লাভূতের বৃত্তান্ত শুনুন—রাত ১০টা হবে। শহর থেকে ফিরছি। ঠিক মুনসীবাদীর গোরস্থানের কাছে আসতেই আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আর হিম হয়ে গেল বুকের রক্ত। ফিকে জ্যোৎস্নার মেটে মেটে আলোয় স্পষ্ট দেখলাম ঠিক রাস্তাটার মাঝখানে নামাজ পড়ছেন এক অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত মুসলমান। মাথায় ফেজ টুপি। গায়ে মসলিনের চকচকে কুর্তা। পরণে কলীদার পায়জামা।

মনে হল পাঁচওয়াক্তের নামাজ পড়ছেন। সময় লাগবে। কিন্তু যাব কি করে? যে সে প্রেত নয়' মোল্লাভূত ব্রহ্মদৈত্যের মতই দারুণ দাপট। আমি একপাও নড়তে পারলাম না। রামনাম জপতে শুরু করলাম। দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল।

হঠাৎ বাতাসে ভেসে এল আজানের ক্ষীণ দূরাগত সুর—আশহাদু আললাইলাহা ইল্লাল্লাহ······শোনা মাত্র বিদ্যুত চমকের মত আমার মনে পড়ে মুসলমান জমিদারের নায়েবী করেছি বহুকাল। কোরাণের দু'একটা আয়াত (শ্লোক) আমার এখনও মুখস্থ আছে। আমি ভগবানের নাম নিয়ে স্থির দৃষ্টিতে মোল্লাভূতের ছায়ামূর্তির দিকে আবৃত্তি করতে শুরু করলাম—

হুমোল আজারো মেনু।

ফাও কৌহিম অমেন তাহুতে আর জোলাহিম অয়্যাকুলো জুকু······

সঙ্গে সঙ্গে নামাজ থেমে গেল। সুদৃশ্য রঙচঙে জায়নামাজ থেকে সে উঠে দাঁড়াল। ভয়ে আমার বুকের ভেতরে ঢিব ঢিব করছে। কিন্তু আমি যেন কিছু দেখিনি। এক মনে আয়াত আউড়ে যেতে লাগলাম-আইম্মা জাহান্নমা লামোহীতাতাম বেল কাফেরীণ য়্যাওমা য়্যাগশা গলত হ্যায়—

সাবাশ বেটা—সাবাস—তুমি হিন্দুর ছেলে হয়ে কোরাণ শরীফের আয়াত বেশ বলছ তো—চারিদিকের গাঢ় স্তব্ধতার ভেতরে তার কেমন ঘ্যাসঘেসে গলার স্বর যেন বহুদূরে থেকে শোনা গেল—বেটা জানিস—বেঁচে থাকতে কত লোকের কত উপকার করেছি, এখন আমার কবরে কেউ একটা চেরাগ পর্যন্ত জেবলে দেয় না—বর্ষার জলে জলে ভেঙ্গে পড়ছে কবরটা—কেউ দেখে না—মোল্লাভূত থেমে গেল। আবার বলল, এই কথাগুলো বলার জন্যই তোমাকে

আটক করেছিলাম কবর ঠিক না করলে বেহেশতে গিয়েও শান্তি পাব না রে বেটা। বেটা—বলেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার কি মনে হয় জানেন পর্ণাদেবী, ব্রহ্মদৈত্যির মত মোল্লাভূত বা মৌলবী-ভূত তথা উঁচুস্তরের সব প্রেতাত্মারই মুক্তির ও শান্তির আকাঙ্ক্ষা বড় প্রবল।

পর্ণাদেবী আছে আরও অনেক রকমের ভূত—যেমন, তালবেতাল মহাদেবের ঘনিষ্ঠ অনুচর। বেতাল বাতাসে চলাফেরা করতে পারে। অবশ্য বেতাল শব্দের অর্থও তাই। কবিকঙ্কনে আছে, পিশাচ বেতাল আদি তার যজ্ঞ হরে। অন্নদামঙ্গলে আছে—রুদ্র তালে তাল দেয় বেতাল। তালও শিবের বিশ্বস্ত এক অনুচর। শ্মশানে বহন করে নিয়ে যাওয়া মৃতদেহ যদি হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে নড়েচড়ে বসে তবে তাকে দানোভূত বলে। একপাওয়ালা ভূত হল—একনড়ে। একনড়ের নজর শুধু বাচ্চাদের দিকে। একনড়ে শত শত বছর ধরে বেঁচে আছে গ্রাম্য ছড়ার ভেতর—

একনড়ে কুলবেড়ে তালগাছে বসসে॥
যে ছেলেটা কাঁদে তার চুল এসে ধরসে॥

আর এক প্রতিবন্ধী ভূত হল কন্ধকাটা। এর মাথা নেই। শুধু ধড়। তার বিশাল দুটো হাত দিয়ে সে অন্ধের মত দিশা ঠিক করে চলতে পারে। তার হাতের নাগালের ভেতরে যা পায়—তাই ধরে নিয়ে তার গলার ফুটে দিয়ে পেটে চালান করে দেয়। আর আছে পেঁচোভূত এদের ঘোরাফেরাও একনড়েদের মত কচিকাচাদের কাছে। পেঁচোভূতে ধরলে বাচ্চাদের ধনুস্টংকার হয়—বহুকাল ধরে প্রচলিত আছে এই কুসংস্কার। সেকালে অগাধ ধনীব্যক্তি কোন নিরপরাধ বালককে হত্যা করে তাকে গুপ্ত ধনাগারে রেখে দিত। বালকের প্রেতাত্মা যখ হয়ে সেই ঐশ্বর্য পাহারা দিত। একে বলে যখ ভূত। পুকুরে থাকে হাঁড়াভূত। বাতাসে থাকে বাঁভুলভূত। কালবৈশাখীর ঝড়ের সময় উঠোনে যে বাতাসে ঘূর্ণি উঠতে থাকে—তাকেই বাঁভুলভূত বলে। অবনী ঠাকুর একেই বলেছেন—বীরবাতাস নিশি বা দিশাভূত এবং ঝেরুভূতের কথা আগেই বলেছি—

এদের এক-একটা জাত আবার এক এক জায়গায় থাকতে ভালবাসে। বেলগাছে—ব্রহ্মদৈত্যি, শিমুলগাছে তালবেতাল, শ্যাওড়াগাছে শাঁখচুন্নি। কিম্বা এদের এক একজনের চেহারার এক এক রকম বিবরণ—কেউ তালগাছের মত লম্বা ঢাঙ্গা। ক্রেনের মত বাঁকানো লম্বা হাত দিয়ে শিকার ধরে। সারা শরীর হাড় দিয়ে গড়া। চোখদুটো গর্তে ঢোকা…ইত্যাদি বর্ণনা এবং তাদের বিভিন্ন জাতের ভুতুড়েকাণ্ড কারখানার এই বিবরণ থেকে খুব সহজেই প্রতীয়মন হয়—পৃথিবীর দেশদেশান্তরের মানুষের কল্পনা এবং ধ্যানধারণা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে—ভূতের নানাজাত।

নমস্কারান্তে—ইতি।

ষষ্ঠ প্রেতমণ্ডল

All unnatural incidents are not spiritual they may be only miracle
—Frank Bullion.

—সব অস্বাভাবিক ঘটনাই ভৌতিক নয়, তারা শুধু অলৌকিক এবং অতিপ্রাকৃতও হতে পারে—

....

এবারের চিঠিটায় আছে বেশ একটু অভিনবত্ব। আত্মার অস্তিত্ব কি পরকায়াপ্রবেশ বা ভূতে ধরা কিম্বা প্রেতাত্মার ছবি ইত্যাদি কোন গুরুগম্ভীর বিষয় সম্বন্ধে জানতেও চাননি এই পত্রলেখক। তেমন বেশি কিছু লেখেনওনি। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত তাঁর চিঠি। আর তাতে আছে একটি অত্যন্ত দুরূহ আর জটিল প্রশ্ন—

"পৃথিবীর সব অলৌকিক ঘটনাই কি ভৌতিক? Pure and simple phenomenon বলে কি কিছুই নেই?"

রীতিমত ধাক্কা খেলাম। কোন ভূমিকা নেই, কোন গৌরচন্দ্রিকা নেই, আগাপিছু নেই। হঠাৎ একরকম একটা বেমক্কা কোশ্চেন—চিঠিটা আবার বেশ মন দিয়ে পড়লাম—

"মহাশয়, আমি দর্শনের ছাত্র। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ভুবনবিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো Timaeus বা টাইমাস গ্রন্থে বলেছেন The past and future are created species of time, কাল মহাকালেরই সৃষ্টি অতীত এবং ভবিষ্যৎ। পরে—অনেক পরে যা ঘটবে বর্তমানেই তার আভাস পাওয়া যায়—Future events cast their shadows before, বলা যায়, cause and effect বা কার্যকারণের সূত্র—প্রতিটি কাজ বা ঘটনার আড়ালে একটা কারণ থাকতেই হবে—এই সত্যটি বোধ করি একেবারে মানবসভ্যতার গোড়া থেকেই মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু—

সব আশ্চর্য আর অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার আড়ালেই কি কারণ থাকে? তাহলে 'মিরাকেল' কথাটা কি মিথ্যা?"

"আমি পরলোকবিদ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করি মাত্র। দর্শনতত্ত্বের কিছুই জানি না। আমার কোন অ্যাকাডেমিক পড়াশুনা নেই। তবে একেবারে লেম্যান হিসেবে সাধারণ ভাবে বলতে—পারি তাঁকে লিখলাম কার্যকারণের প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকদের দুটো শিবিরের দুই রকমের কণ্ট্রাডিক্টরী বা পরস্পরবিরোধী মতামত আছে। একদল বলেন অতীত ও ভবিষ্যৎ সমস্ত ঘটনাই চলমান কার্যকারণের অমোঘ সূত্রে গেঁথে বর্তমানে মালার মত করে সাজিয়ে গাঁথাই রয়েছে।

আমরা পরে ঠিক ঠিক সময়ে তাদের এক একটির কাছে যাচ্ছি

মাত্র। তার কোনটাই কিন্তু ঘটছে না—Events donot happen, we merely come across them. এরা হল—Determinism বা নির্দিষ্টবাদের দলের।

অবশ্য এই প্রসঙ্গেই আমাদের উপনিষদেও আছে—এই Determinism। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁর পত্নী গার্গিকে বলছেন—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি।
দ্যাবাপৃথিব্যো বিধৃতে তিষ্ঠতঃ॥
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি।
সূর্যশ্চন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ॥

অর্থাৎ অক্ষরপুরুষের ভয়ে বা প্রশাসনে অর্থাৎ তাঁর বিধান অনুসারেই সূর্য, চন্দ্র নিজ নিজ কক্ষে থেকে কিরণ দিচ্ছে। পৃথিবী ঘুরছে। কোন ব্যতিক্রম নেই। নেই কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা। সবই পূর্ব নির্ধারিত।

না। একই কারণের জন্য কাজ বা ঘটনা যে সবসময়ই একই রকম হবে, তার কোন অর্থ নেই। কাজ একরকম নাও হতে পারে। কাজ বা ঘটনা সম্বন্ধে কিছু অনিশ্চয়তা আছে—বলল অনির্দিষ্টবাদ বা Indeterminism—এর সমর্থক দল। আমার নিজের পঞ্চাশোর্দ্ধের পোড় খাওয়া জীবনেও দেখেছি এমন এক একটা আকস্মিক ঘটনাও ঘটে থাকে যার কোন কারণ কখনো খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমার নেহাতই ছাপোষা, সাদামাটা ধূসর জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে কোন নজির দেব না। আপনার কাছে জলো মনে হতে পারে—মনে হতে পারে আমি বানিয়ে বলছি। তাই আপনাকে জানাচ্ছি এক বহুদর্শী ও প্রবীন নাবিকের জবানীতে তাঁর এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা। অদ্ভুত সেই অলৌকিক ঘটনার আজ পর্যন্ত কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় নি—

আমার দীর্ঘ বিচিত্র জীবনে জলে স্থলে এত সব অদ্ভুত ঘটনা দেখেছি যে কোনটা রেখে কোনটা বলি তা ঠিক করাই মুস্কিল। তবে—

১৮৭০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী গভীর রাত্র অন্ধকার সমুদ্রের বুকে যে অদ্ভুত আর আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা স্বচোক্ষে দেখেছিলাম তা আমি এই জীবন সায়াহ্নে এসেও ভুলতে পারিনি। তার কোন কারণ কি ব্যাখ্যাও আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। তখন আমার বয়স মোটে ১৩।

সেই বিচিত্র দৃশ্য দেখে আমি আমাদের জাহাজের নানাদেশের নাবিকদের মন্তব্যও সংগ্রহ করেছিলাম। আমাদের ‘ক্রুদের ভেতরে ছিল স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, ক্যানাডিয়ান, রাশিয়ান, ইটালীয়ান, সুইডিশ, অস্ট্রিয়ান এবং অ্যামেরিকান নিগ্রো। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সমাবেশ হয়েছিল

আমাদের নাবিকদের ভেতরে।

আমাদের জাহাজটি নিউ সাউথ ওয়েলস বন্দর থেকে তুলোর বেল নিয়ে লিভারপুলে যাচ্ছিল। আবহাওয়া ভাল ছিল। কয়েকদিনের ভেতরেই আমরা প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে আটলান্টিকে পড়লাম। বলা দরকার অল্প কিছুদিন আগেই ভয়ানক প্রতিকূল আবহাওয়া আর ঝড় দুর্যোগ পাড়ি দিয়ে এসেছিলাম। সেই উত্তাল বিশাল সমুদ্র এখন একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই যে রাত্রির অদ্ভুত ঘটনা আমি বলতে বসেছি—সেই রাত্রেও সমুদ্র ছিল অস্বাভাবিক শান্ত। স্থির। শুধু যতদূর চোখ যায় সাগরের অন্তহীন বিশাল জলরাশি গাঢ় অন্ধকারে ধারালো ছুরির মত ঝিকমিক করছিল আর দূরে—বহুদূরে উন্মত্ত বেগে ছুটে আসা বড় বড় ঢেউয়ের মাথায় মাথায় জ্বলছিল ফসফরাসের দীপ্তি!

আমার কাজ ছিল দূরের বন্দর বা পোর্টকে লক্ষ্য করা। আমি মাঝরাতে ডেকে এলাম। যেখানে বর্ডেক্সের (স্পেন) লুইস ডায়েডলট হাল ধরে দাঁড়িয়েছিল তার পাশে এসে দাঁড়ালাম। আমরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্প্যানিশে কথা বলতে শুরু করলাম। সে ইংরেজী জানে না। আমি জানি না ফরাসী ভাষা।

আকাশের কোথাও মেঘের ছিটে ফোঁটাও ছিল না। চাঁদ ধীরে ধীরে পশ্চিমের আকাশে হেলে পড়ছে। ডেকে বসে দূর সমুদ্রের বিশাল অন্তহীন জলরাশির দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিলাম। আকাশে রাশি রাশি তারা জ্বলজ্বল করছে। তারাগুলো যেন একএকটা পিনের মত আমার চোখে বিঁধছে। শুধু তাই নয়। লক্ষ্য করলাম প্রতিটি তারার পিছনেই অন্ধকার আকাশের নিঃসীম শূন্যতা। আমার কেন যেন হঠাৎ মনে হল একটি তারা থেকে আর একটি তারার মাঝখানে ধুধু অন্ধকার শূন্যতার ভেতরে কি আছে—কি এমন থাকতে পারে! আমার গা-টা কেমন ছমছম করতে লাগল। তবুও—তবুও আমি রহস্যময় সেই অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম—আদিযুগের মানুষ যেমন তাকিয়ে থাকত আর আকুল হয়ে ভাবত। কি আছে ওই আকাশের পাঁচিলের ওপারে!

তার কিছুক্ষণ পরেই ঘটে গেল সেই আশ্চর্য অলৌকিক কাণ্ড। হঠাৎ পশ্চিমের আকাশের দিগন্ত রেখার ওপরের ঘন বেগুনী অন্ধকার হঠাৎ বিদীর্ণ হয়ে গেল। আর স্নিগ্ধ মৃদু আলোর আভা ছড়িয়ে পড়ল সমুদ্রের অন্ধকার জলরাশির ওপরে। আর কাজলকালো জলের ভেতর থেকে মাথা ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল সূর্যের মতই তীব্র রক্তবর্ণ আলোর গোলক! এত ভয়ংকর উজ্জ্বল—এত তীব্র সেই আলোর জ্যোতি যে আমার চোখদুটো ব্যথা করতে লাগল।

জ্যোতির্ময় সেই আলোর গোলক আকাশের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। আর তার গতিপথের পিছন দিকটায় একটা অত্যুজ্জ্বল

আলোর রেখা প্রসারিত হয়ে গেল সমুদ্রের বুক চির। আর সমুদ্রের সেই একটানা সাঁ সাঁ বাতাসের অশ্রান্ত আর্তনাদকেও ছাপিয়ে শোনা যেতে লাগল—সাপের মত হিস হিস শব্দ। রক্তবর্ণ সেই আলোর গোলকটা যেন ভেজা ভেজা কুয়াশার ঘন স্তর অতিক্রম করে দ্রুত চলেছে—তাই ওরকম অদ্ভুত হিস হিস আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আর সেই অত্যুজ্জ্বল আলোর বলটা বিদ্যুত গতিতে চলে যেতে যেতে নানারঙের আলোর স্পার্ক বা আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে দিতে লাগল আকাশের দিকে দিকে। বিভিন্ন বর্ণের আলোর সমারোহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আকাশ।

হিম হয়ে গেল আমার বুকের রক্ত। এসব কি আশ্চর্য খামখেয়ালীপনা দেখছি প্রকৃতির। তাহলে কি পৃথিবীর অন্তিমকাল ঘনিয়ে এল? কিন্তু—তখনো—তখনো বিস্ময়ের অনেক—অনেক বাকী ছিল।

লাল, নীল, বেগুনী, হলদে, কমলা ইত্যাদি এক একটা রঙের রাশি রাশি স্ফুলিঙ্গ যেই ছড়িয়ে পড়ছে সঙ্গে সঙ্গে দূরে বহুদূরে অন্ধকার সমুদ্রের বুকের ভেতরে থেকেই যেন দূরাগত কামানের গর্জনের মত অস্পষ্ট ক্ষীণ শব্দ উঠছে —দুম্—দুম্—দুম্—

অজানিত একটা ভয়ে আমার বুকের ভেতর শির শির করে উঠল—এই নিশি রাতে কী সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা চলছে আকাশের বুকে। সেসবের খবর বোধ করি, একমাত্র আকাশের তারার ঝাঁকরাই দিতে পারে। আমার মনে ঘনীভূত হয়ে উঠল একটা সন্দেহ—সৌরজগতের—সব কিছু যেন ঠিক মত সুশৃংখল ভাবে চলছে না। সূর্য, চন্দ্র, তারারা বা অসংখ্য ও অগণন নক্ষত্ররা যেন যার যেমন খুশি এলোপাথাড়ি চলছে। আর তাই আকাশের বুকে ভয়ানক কোন বিস্ফোরণ ঘটছে। তবুও—

তবুও ভয়ানক সেই অস্বস্তিকর মুহূর্তেও আমার মনে হয়েছিল, যে কোন মুহূর্তে হয়ত আকাশের সেই রঙীন আলোর সমারোহের ভেতরে নজরে পড়বে স্বর্গের দেবতার উগ্র সাদা আলো দিয়ে গড়া শ্বেতশুভ্র সিংহাসন কিম্বা লীলায়িত ভঙ্গীতে নৃত্যরতা কোন সুন্দরী অপসরী—ঈশ্বরের সেই অপার্থিব দিব্যভাবের প্রকাশ সম্বন্ধে যা আমি অ্যাপোক্যালিপসো বা বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের সর্বশেষ বইটিতে যা আমি বহুবার পড়েছি।

কেন—কেন যে ভয়ে মরে যাইনি—জানি না। কিন্তু আমার ফরাসী শিপমেটের যে কী ভয়ানক খারাপ অবস্থা হয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারলাম তখন যখন দেখলাম সেই ট্রপিক্যাল জোনের দারুণ গরমের ভেতরেও তার হাতদুটো বরফের মত কনকনে ঠাণ্ডা। সেই হাতদুটো দিয়েই কেঁপে কেঁপে ক্রমাগত বুকে কপালে ঠেকিয়ে ক্রুশের মুদ্রা করে চলেছে। আর তার শুকনো বেগুনী ঠোঁটের থরো থরো রেখায় কতগুলো না বলা কথা কিম্বা আকুল প্রার্থনার কথাগুলো কেঁপে কেঁপে থেমে যাচ্ছে।

রক্তগোলকের সেই অপরূপ অপার্থিব দৃশ্য আর সেই বিপুলব্যাপ্ত

আকাশজুড়ে রংবাহারী আলোর খেলায় সমস্ত বিশ্বচরাচর যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই গভীর নিশীথ রাত্রে আকাশের বুকে সেই নানাবর্ণের আলোর বিপুল সমারোহের কোন ব্যাখ্যাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলে আমরা নাবিকরা সেই ভয়ংকর সুন্দর দৃশ্যে মুগ্ধ হওয়ার বদলে রীতিমত ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। নিরাপদে বাড়িতে ফিরতে পারব তো? না কি ওই অগ্নিগোলক থেকেই ভয়ংকর এক আগ্নেয় বিস্ফোরণে আলোড়িত হয়ে উঠবে এই মহাসমুদ্র আর আমাদেরও হবে সলিল সমাধি!

একের পর এক পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল অশুভ লক্ষণগুলো—বাতাসের শ্বাসপ্রশ্বাস একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাত্রির সেই কালো অন্ধকারে সমুদ্রের অন্তহীন জল বিস্তারকে মনে হল যেন কালো কালির নিস্তরঙ্গ একটা জলাশয়। কিছুক্ষণ আগেও সেই যে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ফসফরাসের দীপ্তি জ্বলছিল—সেসব অন্ধকার সমুদ্রের কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার আলোড়ন এত মৃদু, এত তুচ্ছ যে জাহাজটা যেন প্রায় গতি হারিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাতাসে একটা দড়িরও ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ কানে আসছিল না। শোনা যাচ্ছিল না পালের কাপড়ের ফত ফত আওয়াজ। এসব দেখেশুনেই আমাদের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমরা এক একটি নিষ্প্রাণ পুতুলের মত বসেছিলাম আর আকাশে পরবর্তী বৈচিত্রময় আরও কোন আশ্চর্য দৃশ্যের জন্য প্রতীক্ষা করছিলাম অধীর আগ্রহে।

মাঝরাতের সেই বিস্ময়কর আলোর গোলক আকাশের দিগন্ত রেখা থেকে একটু একটু করে মাথা চাড়া দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার সেটা যত এগোয় ততই তার গা থেকে এক একটা আলোর বিন্দুর মত এক একটা জ্যোতিষ্ক বেরিয়ে আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দেখতে দেখতে উজ্জ্বল সেই নক্ষত্রগুলো ছড়িয়ে পড়ল ওপরে নিচে, ডাইনে বাঁয়ে। আমার মনে হল বাতাস যেন তাদের জন্যেই ভারি—খুব ভারি হয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। আর আকাশের বুকে আলোর রাশি রাশি স্ফুলিঙ্গের মত নক্ষত্রদলের অপরূপ শোভা দেখতে দেখতে আমার আরও মনে হয়েছিল—মনে হয়েছিল আমি—আমি যেন মধ্যআমেরিকার সেই গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের বৃক্ষহীন ধূ‌ধূ নিঃসীম প্রান্তর বা স্যাভানায় দাঁড়িয়ে আছি আর সেখানে আগুনের পরীরা ডানা মেলে নাচছে। ওপরে অজস্র—অজস্র আর অগণন আগুনের ফুল জ্বলজ্বল করছে। নিচে অন্ধকার কালো সমুদ্র।

সেই ভয়ানক দৃশ্যে আমাদের অনেকে তড়িতাহতের মত হয়ে কেমন একটা আচ্ছন্নতার ভেতরে বসেছিল। তারা কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করছিল না—এত বেশি—এত ভয়ানক চুপচাপ যে তাদের বুকের ভেতরের হৃদস্পন্দনের ধ্বনি পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল। আর আমি—আমরা সবাই যীশুর নামে শপথ করে বলতে পারি আকাশের রাশি রাশি তারাদের চলাচলের বন বন শব্দও যেন স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হচ্ছিল। আবার কোন কোন ভয়ানক জ্বলজ্বলে

উজ্জ্বল এক একটা তারা যেন আমাদের কাছে—খুব কাছে এসে প্রচণ্ড আওয়াজে ফেটে যাচ্ছিল আর আমাদের চোখগুলোকে একেবারে অত্যুজ্জ্বল উগ্র সাদা আলোয় ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। চোখের তারাদুটো রীতিমত ব্যথা ক'রতে লাগল। আমি তাদের একটু বিশ্রাম দেওয়ার জন্য চোখদুটো বুজেছিলাম। আবার কিছুক্ষণ চোখের নিচের পাতা দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কিছুই হল না। মন মানল না। আবার আকাশজুড়ে নানারঙের আলোর সেই সমারোহ। সেই আলোকোজ্জ্বল এক একটা নক্ষত্রের বর্ণাঢ্য মিছিলের দিকে অবাধ্য চোখদুটোর দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরই সেই নক্ষত্রগুলোর ঔজ্জ্বল্য একটু একটু করে স্তিমিত হয়ে এল। আকাশের নৈঋত কোণে দেখা দিল শঙ্কুর আকৃতির একটা উল্কা। কিন্তু সেটাও আশ্চর্য আর একটু যেন অস্বাভাবিক মনে হল—অন্যান্য উল্কার মত তার কোন ঔজ্জ্বল্য নেই কেমন নিষ্প্রভ, ম্লান। হয়ত লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের বলেই। কিন্তু তার কিনারে কিনারে শুধু মোমবাতির শিখার মত ছায়াকাঁপা ক্ষীণ অস্পষ্ট আলো। আশ্চর্য! এটা কী সত্যিই উল্কা, না অন্য কোন অজানা নক্ষত্র? আমি কিছুই বলতে পারব না—বলতে পারব না, সেদিন নিশিরাতে অন্ধকার সমুদ্রের ওপরের আকাশে গ্রহনক্ষত্রের জগতে যে কী অলৌকিক অত্যাশ্চর্য কাণ্ডকারখানা শুধু হয়েছিল। আমাদের ভেতরে যে সবচেয়ে প্রবীন নাবিক সে-ও বলতে পারল না, কেনই বা সূর্যের মত বিশাল রক্তগোলক মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আর তার গা থেকে রাশি রাশি স্ফুলিঙ্গের মত এক একটা নক্ষত্র ছিটকে বেরিয়ে এসে আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, কেন সারা আকাশ জুড়ে নানাবর্ণের আলোর হোলী খেলা শুরু হল—এসবের কোন ব্যাখ্যাই কেউ দিতে পারল না। আমারই মত অল্পবয়সী স্কিপার পিটার বিড়বিড় করে শুধু বলল—Introduction to some dreadful disaster…একটা ভয়ানক বিপর্যয়ের পূর্বাভাষ। অন্যান্য নাবিকরা তীব্র ভয়ে আর উত্তেজনায় এমন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তাদের বাকশক্তি। কেউ কেউ আবার বদ্ধ উন্মাদ হওয়ার কাছাকাছি পেঁছে গিয়েছিল। যাই হোক। কিন্তু—

আর কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই হল না। আকাশের বুক চিরে বজ্র বিদ্যুত ঝিলিক দিয়ে উঠল না। উল্কাপাত হল না। ভয়ংকর ব্যাপক কোন আগুনের ঝড়ে পৃথিবীটা পুড়ে ছারখার হল না কি কোন বিধ্বংসী বন্যায় কি জলোচ্ছ্বাসে সৃষ্টি রসাতলে গেল না। কিছুই হল না। বরং—

আমাদের একেবারে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিয়ে সেই অগ্নিবর্ণ আলোর গোলক আস্তে আস্তে তার আকাশ পরিক্রমা শেষ করে সাগরের জলে ডুবে যেতে লাগল। সমুদ্রের জল তরল অগ্নিধারার মত জ্বলতে লাগল। আর তখুনি বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল সালফার বা গন্ধক পোড়ার উগ্র দুর্গন্ধ। তাহলে কি সেই জ্যোতির্ময় গোলক সমুদ্রের জল আর বাতাসের সংমিশ্রণে

কোন রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফল ? কে জানে।

সেই অত্যাশ্চর্য-অতিপ্রাকৃত আলোর উৎস কিন্তু বিদায় নেবার সময়েও দেখিয়ে দিয়ে গেল আর এক অপরূপ বর্ণরাগের শোভা। সমুদ্রের জলের সান্নিধ্যে আসতেই সেই রক্তবর্ণ গোলকের ভেতরে যেন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে গেল। আর সাগরের বুকে ছড়িয়ে পড়ল অযুত কোটি—অজস্র আর অগণন আগুনের স্ফুলিঙ্গ। সমুদ্রের জলের ভেতরে যেন রাশি রাশি আলোর দীপালি জ্বলজ্বল করতে লাগল। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই সাগরের কালো জলে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল সেই অপরূপ আলোকমালার মনোহর দৃশ্য। মিলিয়ে গেল—অদৃশ্য হয়ে গেল একটু আগের বর্ণোজ্জ্বল আলোর ছটার তুলনায় আরো বেশি অন্ধকারের কালি গুলে দিয়ে।

সেই ভয়ানক উজ্জ্বল আর রক্তবর্ণ আলোর সর্বব্যাপী গ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে আকাশ আস্তে আস্তে তার স্বাভাবিক নীলাভ চেহারা নিয়ে দেখা দিল। তারার ঝাঁকও উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল আকাশে নিচে শান্ত সমুদ্র যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। নিশাচর সামুদ্রিক পাখিরা সাগরের জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে উড়ে অন্ধকার দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল—সেই আশ্চর্য সুদূর এক স্বপ্নের ইন্দ্রজালের মত এই দৃশ্যকে এতক্ষণ বর্ণোজ্জ্বল আলোর বন্যা একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়েছিল।

মৃদুমন্দ বাতাস বইতে লাগল। অন্ধকার সমুদ্রের কালো জলে বাতাসের অস্ফুট কলোল্লাসের একটানা মর্মরধ্বনি দূর থেকে শোনা গেল। জাহাজ কাঁপিয়ে নাবিকদের সমবেত হর্ষধ্বনি উঠল। জীবন ফিরে পেয়েছে বলে পরস্পরকে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে লাগল। তাদের সম্মিলিত কলরব সেই প্রগাঢ় স্তব্ধতাকে খান খান করে ভেঙ্গে ফেলল। যারা অজানিত ভয়ে আশংকায় প্রায় অচৈতন্য হয়ে গিয়েছিল তারা হাতজোড় করে আকাশের দিকে তাকিয়ে করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করল। তাদের সম্মিলিত কণ্ঠের সেই আকুল করুণ প্রার্থনায় যেন মনে হল নিদারুণ সেই বিভীষিকার রাত্রি পেরিয়ে এসেছে বলে কোন পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ করছে।

পুবের আকাশে ভোরের রেখা জেগে উঠল। দূর থেকে বন্দরের ইয়ার্ড নজরে পড়ল। নোঙরের মোটা দড়ি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে রেডী করতে লাগল খালাসীরা। পোর্টে জাহাজ ভিড়লেই—নোঙর ফেলতে হবে। বহুদিন-বহুদিন পর মাটি দেখতে পেয়ে ক্রুদের ভেতরে উল্লসিত গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। এইসময়—

ঠিক এইসময় আমি আমার মনের ভেতরে ডুব দিলাম—সেই শ্বাসরোধকারী—সেই সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন করা আশ্চর্য—অলৌকিক দৃশ্য আকাশে স্থায়ী হয়েছিল কতক্ষণ ? মাত্র—

ত্রিশ মিনিট। আধঘণ্টা। অনেক—অনেক পরিতৃপ্তি আর সন্তোষের উচ্ছ্বসিত উক্তি কানে এল। কিন্তু কোন নাবিক কি পোড় খাওয়া

অর্থাৎ অভিজ্ঞ বহুদর্শী অফিসাররা পর্যন্ত কেউ কিছুই বলল না। বলল না—কারণটা কি? কেনই বা মাঝরাতে সমুদ্রের বুকের ভেতর থেকে উঠে এল সেই আলোর গোলক আর কেন তার শরীর থেকে রাশি রাশি জ্বলন্ত নক্ষত্র ছিটকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ল আকাশের বুকে! কেন সালফার পোড়া বিকট দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।—শঙ্কুর মত দেখতে সেই নক্ষত্র যদি উল্কাই হয়, তাহলে তার আলো মোমবাতির শিখার মত ক্ষীণ, অস্পষ্ট কেন? এসব অসম্ভব আর অস্বাভাবিক কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধে কেউ একটা কথা বলল না। অথচ তাঁরা সব আমার চেয়ে বয়সে তিন ডবল বড়। সারাটা জীবন সমুদ্রে কাটিয়েছে। তাঁরা কেউ কিছু বললে আমি হয়ত প্রকৃতির এই অদ্ভুত খেয়ালীপনার সম্বন্ধে একটা আইডিয়া পেতাম। তাই বড়রা কেউ যখন কিছুই বলল না—তখন আমি তের বছরের একটা ছেলে আর কি ভাবব—কি ভাবতে পারি! আমার শুধু মনে হল—মনে হয়েছিল সৌরজগৎ আর মহাসমুদ্র দুজনে হাত মিলিয়ে রচনা করেছিল তিলে তিলে সেই নানারঙের সমারোহের অলৌকিক দৃশ্য।

জানেন সাফল্যবাবু (দর্শনের ছাত্র—পত্রলেখক সাফল্য নন্দী) ইংরেজ নাবিক মিঃ ফ্র্যাঙ্ক, টি, বুলিয়ন পরিণত বয়সে তাঁর কৈশোরের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা এই পর্যন্ত লিখে উপসংহারে বলেছেন—আজও আমার স্মৃতির ভেতরে চল্লিশ বছর আগের সেই আশ্চর্য অলৌকিক দৃশ্য রঙের সমারোহ নিয়ে জ্বল জ্বল করছে। তখন নেহাতই ছেলেমানুষ ছিলাম। ভেবেছিলাম মাঝরাতে সমুদ্রের বুকের ভেতর থেকে সূর্য ওঠার মত রক্তবর্ণ আলোর গোলকের অত্যুজ্জ্বল আবির্ভাবের আছে নিশ্চয়ই কোন কারণ। কিন্তু আসলে কোন কারণই নেই কোন হেতুই নেই। তা কে কি বলবে? এই তথ্যটিই আমার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লেখা চিঠির উত্তরে লণ্ডনের ফিজিক্যাল সোসাইটি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। বললেন, এসবের কোন বৈজ্ঞানিক কি পারলৌকিক কোন কারণই নেই—এগুলো অতিপ্রাকৃত ঘটনা—Nothing Scientific or Spiritual—only miracle!

সপ্তম প্রেতমণ্ডল

Telepathy and Clairvoyance both—a mental phenomenon
—prof. crooks.

চিন্তাচলন এবং দিব্যদৃষ্টি দুটোই মনোজগতের আশ্চর্য একটা ঘটনা।

এবারে চিঠি লিখলেন এক ভদ্রমহিলা—বাসন্তী জোয়ারদার শিলিগুড়ি থেকে। তাঁর সুদীর্ঘ চিঠির অনেক বক্তব্যের সারসংক্ষেপ হল—টেলিপ্যাথি কি আর ক্লেয়ারভয়েন্সই বা কি? তিনি টেনিসনের কবিতায় পড়েছেন—

Star to star vibrates light may soul to soul, strike through a *finer element of her own* যেমন এক তারা থেকে অন্য তারায় আলোক রশ্মি তরঙ্গায়িত হয়ে যায় সেইরকম এক আত্মা অন্য এক আত্মায় সংবেদন সৃষ্টি করতে পারে একটি সুক্ষ্ম ভূমা পদার্থের সাহায্যে—এই তথ্যটি কি সত্যি? একজন যে কথাটি ভাবছে আর একজন সেই কথাটিই বলে দেয় কি করে? টেলিপ্যাথির আড়ালে রহস্যটা কি?

আর ক্লেয়ারভয়েন্স বা দিব্যদৃষ্টি—অর্থাৎ কলকাতায় বসে হাজার হাজার মাইল দূরে লণ্ডনের বা আর কোন দূরের জায়গার ঘটনা স্পষ্ট দেখতে পায় কি করে? এই যে দিব্যদৃষ্টি ক্ষমতার অধিকারী কি একমাত্র যোগীরাই? শুনেছি সাধারণ মানুষও নাকি সময় সময় বহু—বহুদূরের ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করার শক্তি অর্জন করে।

আরও অনেক—অনেক কথা লিখে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন—টেলিপ্যাথি আর ক্লেয়ারভয়েন্স সম্বন্ধে যদি কিছু আলোকপাত করেন তাহলে বড় উপকৃত হব।

মহাশয়া,

গোড়াতেই সবিনয়ে জানিয়ে রাখি আমি কিন্তু টেলিপ্যাথি কি ক্লেয়ারভয়েন্সের এক্সপার্ট বা বিশেষজ্ঞ নই। আমার গতিবিধি শুধু পরলোকবিদ্যার চৌহদ্দির ভেতরেই সীমাবদ্ধ। অবশ্য এই দুটো সাবজেক্ট অনেকটাই বিজ্ঞান ঘেঁসা হলেও—প্রেতচর্চারই অন্তর্ভুক্ত। প্রথমে টেলিপ্যাথির থিয়োরীর ভেতরে না গিয়ে একটা কংক্রীট ঘটনা বলি—

১৯৬১ সাল জুন মাস। ভুবনবিখ্যাত লেখক আর্থার কয়েসলার (Arthur koestlet) এবং তাঁর স্ত্রী আলাপব্যাচ গ্রামে তাঁদের গ্রীষ্মকালীন আবাসে এলেন। আলাপব্যাচ হল অস্ট্রিয়ার পার্বত্য প্রদেশ টাইরলের একটি প্রাচীন সমৃদ্ধ গ্রাম। এই জনপদের চারিদিকেই নীল নীল পাহাড়ের পাঁচিল। আর যেদিকে তাকাও দেখবে আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে এক একটা গীর্জার চুড়ো।

প্রত্যেকটাই ক্যাথলিক চার্চ। এখানে ক্যাথলিকদের অত্যন্ত বেশি আধিপত্য। তাঁদের ধ্যানধারণা আর ঐতিহ্যের স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে এই গ্রামের চারিদিকে। এবার শুনুন লেখকের জবানীতে—

'বলাবাহুল্য আমরা ক্যাথলিক নই। তানাহলেও কিন্তু—আমরা ক্যাথলিক পুরোহিত হের ফাদার ডানিনজারকে বাড়িতে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম। তিনিই আমাদের বেশ যত্ন করে স্থানীয় আচার আচরণ এবং ক্যাথলিকদের বিভিন্ন প্রথার সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন। একদিন—

একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল। সেদিনটা ছিল—রবিবার ২৫শে জুন। এইদিন ক্যাথলিকদের কি যেন একটা ধর্মীয় উৎসব ছিল। আমরা বিশপ ডানিনজারের জন্য অপেক্ষা করছি। তাঁর সঙ্গে আমরা চার্চে যাব। আমার স্ত্রী বারবার উৎসুক চোখে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছেন। আমি কিন্তু অত বেশি উঁকিঝুঁকি করছি না। সোফায় আরামে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ছি—ডক্টর আন্দ্রে মোরোয়েসের লেখা পেনিসিলিনের আবিষ্কারক আলেকজান্দার ফ্লেমিং-এর জীবনী!

মায়েরয়েসসাহেব এই বইতে বেশ একটা ইণ্টারেস্টিং আলোচনা করেছেন 'হিসপ' নিয়ে। হিসপ হল এক ধরনের উগ্র সুগন্ধী গাছের শিকড় যা প্রাচীনকালে বনৌষধি হিসেবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু—

শুধু ওষুধ নয়, মায়োরয়েস বলেছেন 'বিবলিক্যাল হিসপ' অর্থাৎ বাইবেলেও আছে এই হিসপের উল্লেখ—সুপ্রাচীনকালে হিব্রুরা তাদের ফসল সংগ্রহের উৎসবের সময়ে পাপক্ষালনের জন্য যে ক্রিয়ানুষ্ঠান করত তার প্রধান উপকরণ ছিল এমন একটি গাছের শিকড় যাতে ছত্রক বা ছাতা অর্থাৎ পেনিসিলিয়াম দেখা যেত। আর এই শিকড়ই যে সেই 'হিসপ' তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় বাইবেলের একান্ন নং স্তোত্রের সপ্তম স্তবকে—হে করুণাময় ঈশ্বর আমাকে 'হিশপ' দিয়ে পরিশুদ্ধ কর আমার সব পাপক্ষালন করে আমাকে পবিত্র কর—তোমার দয়ায় আমি নিস্কলঙ্ক হব—শুদ্ধ হব—

বিচিত্র এই বনৌষধি এবং ধর্মীয় ক্রিয়াপ্রকরণের উপকরণ—হিসপের কথা পড়তে পড়তে আমার মনে ঘনিয়ে এল অনেক—অনেক প্রশ্ন—হিসপ দেখতে কেমন; কোন দেশের কোন অরণ্যে এই গাছ জন্মায়? হিব্রুরা ব্যবহার করত তাহলে কি ইজরাইল-ই তার জন্মভূমি—এই গাছের শিকড়ের ছত্রাক বা ছাতা—সেই পেনিসিলিয়াম থেকেই কি ফ্লেমিংসাহেব করেছিলেন তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার—পেনিসিলিন?

আরে! তুমি এখনও বই মুখে করে বসে আছ—হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এলেন আমার ব্যস্তবাগীশ সহধর্মিনী ফাদার ডানিনজার। এসে গিয়েছেন—গেষ্টরাও এসে পড়েছেন—চলে যেতে যেতে দূর থেকে বললেন—আমি একা সামলাব কি করে—

আমাকে উঠতেই হল।

কিন্তু কি মনে করে আমি বইটিতে হিসপ প্রসঙ্গে যেখানে আলোচনা আছে সেখানে একটা চিহ্ন বা 'পেজমার্ক' দিয়ে নেমে এলাম। দেখলাম সাত্যিই অতিথি অভ্যাগতদের মৃদু গুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠেছে—আমার সুদৃশ্য বিশাল ড্রইংরুম। কিন্তু গেস্টদের ভেতরে খামারের মালিক ওথমার র‍্যাডিনজারকে সস্ত্রীক দেখে রীতিমত বিস্মিত হলাম।

বেশ কয়েক বিঘে জমির মালিক এবং খামার আছে, প্রচুর গবাদ পশু আছে বলে বড্ড দেমাক লোকটার। রাস্তা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে এমন করে ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যায়—মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করে না—এই দাম্ভিক, আত্মকেন্দ্রিক লোকটা আমার বাড়িতে—

কি ব্যাপার? আড়ালে ডেকে নিয়ে মিসেসকে বলতেই তিনি হেসে হেসে চাপা গলায় বললেন, ওমা! উনিই তো আজকে আমাদের বাড়ির ফাংশানের হিরো—

হিরো!

আঃ এখন অত কথা বলার সময় নেই বাপু—লক্ষ্মীছেলের মত চুপটি করে দেখ—কি হয়—

অষ্ট্রিয়ার প্রথা অনুযায়ী আমরা প্রতিটি অতিথিকে সুগন্ধী জিনের পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করলাম। অতিথিরা পরস্পরের গ্লাস স্পর্শ করে দীর্ঘজীবন ও সুস্বাস্থ্য কামনা করলেন।

এইবার আসরে এগিয়ে এলেন ফাদার ডানিনজার। অষ্ট্রিয়ার লোকাচার অনুসরণ করে এই ফসল সংগ্রহের বা হারভেস্টের উৎসবের প্রধান অঙ্গ—সেই পাপক্ষালনের ক্রিয়ানুষ্ঠান অর্থাৎ পিউরিফিকেশান রাইটের কাজ শুরু করলেন—

প্রথমেই আমার বসার ঘরের চারিদিকের দেওয়ালে জানলা দরজায় জর্ডনের পবিত্র জল ছিটিয়ে পরিশুদ্ধ করলেন। তারপরে—

কৈ মিঃ র‍্যাডিনজার এবার আমার সামনে আসুন, গম্ভীর হয়ে হেঁকে বললেন আলাপব্যাচের ক্যাথলিক গীর্জার প্রধান বিশপ ডানিনজার।

মাথা নিচু করে গুটি গুটি এগিয়ে এল র‍্যাডিনজার। আমার মনে হল—মনে হল আমি যেন অত্যন্ত জটিল আর দুর্বোধ্য কোন নাটকের একটার পর একটা দৃশ্য দেখছি। শুধু দেখেই যাচ্ছি। বুঝতে পারছি না কিছুই—

বুঝতে পারছ না কেন আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিকে অনুসরণ করে মিসেস বললেন র‍্যাডিনজারের পিউরিফিকেশান করছেন ফাদার—

চার্চে নয় কেন? আমার বাড়িতে—

বাঃ ভুলে গেলে—তুমিই তো ফাদারকে বলেছিলে ক্যাথলিক কাষ্টমের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য দু'একটা অনুষ্ঠান আমাদের বাড়িতে করতে—

মুহূর্তে আমার সব মনে পড়ে গেল। মনযোগ দিয়ে সমবেত অতিথিদের সঙ্গে দেখতে লাগলাম পাপক্ষালনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান—

ফাদারের সামনে প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে বসেছে র‍্যাডিনজার। তার

দুটো হাতে মাথায় সুগন্ধী অলিভ অয়েল বেশ রগড়ে রগড়ে মাখিয়ে দিচ্ছেন বিশপ ডানিনজার। আমার মনে হল কৃষি খামারের মালিকের দেহ থেকে যেন সব পাপের গ্লানি মুছিয়ে দিচ্ছেন ফাদার। তেল মাখানোর পর তার মাথায় জর্ডনের জল—হোলি ওয়াটার ছিটিয়ে দেওয়া হল। এইবার চার্চের বড় ফাদার সাদা ধবধবে জোব্বার দুই পকেট থেকে বের করলেন দুটো জিনিস—

বাইবেল।

এক টুকরো শিকড়।

শিকড়টা ফার্মওনারের মাথায় স্পর্শ করে বাইবেল থেকে উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে পাঠ করতে শুরু করলেন—ও গড পারজ মি উইথ হিসপ অ্যান্ড আই স্যাল বি ক্লিন…তারপরেই র‍্যাডিনজারকে ঝাঁকি দিয়ে দ্রুত উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন ফাদার—চুপ করে আছেন কেন—বলুন হে পরম করুণাময় ঈশ্বর হিসপের সাহায্যে আমাকে পরিশুদ্ধ কর—পবিত্র কর। আমি পাপমুক্ত হয়ে নির্মল হব…

ফাদার—আপনি এসব কী—কি বলছেন, খুব উত্তেজিত হয়ে প্রায় আর্তনাদের মত করে বলেছিলাম—এটা কি হিসপের শিকড়—

স্ট্রেঞ্জ। আপনি এত এক্সসাইটেড হয়েছেন কেন—এটাই তো হোলি প্ল্যান্ট হিসপ; একটু থেমে ফাদার বললেন আবার শুনেছি অনেক অসুখ-বিসুখের না কি খুব ভাল ওষুধ—এই হিসপ—

কেন এরকম করছি? ছুটে দোতলায় গিয়ে মায়োরয়েসসাহেবের বইটা নিয়ে এসে হিসপের জায়গাটা ফাদারকে দেখিয়ে দিলাম। বললাম, এই হিসপের প্রসঙ্গটা পড়ে আমি যখন আকুল হয়ে ভাবছি—কেমন দেখতে এই শিকড় আর সঙ্গে সঙ্গে আপনি—

হ্যাঁ। সেই পবিত্র শিকড় নিয়েই আপনার বাড়িতে এসে গেলাম, ফাদার হেসে বললেন, তাই বলছেন তো?

ইয়েস ফাদার—কি করে কেমন করে এটা সম্ভব হয়?

ফাদার কোন কথা বললেন না।

তাঁর প্রাচীন মুখখানায় চিন্তার ছায়া। আস্তে আস্তে বললেন, এরকম হয় মিঃ কয়েসলার—এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে। একটু থেমে আবার বললেন, একজনের চিন্তা অন্য ব্যক্তির মনে সঞ্চারিত হতে পারে—

কিন্তু কেমন করে হয় ফাদার?

বলতে পারব না। এটা একটা অলৌকিক ব্যাপার। ঈশ্বরের এই পৃথিবীতে এমন অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না—

দেখুন বাসন্তীদেবী, একজন যে চিন্তা করছে ঠিক সেই কথাটা আর একজন বলতে পারে, বলেছেন ফাদার। কিন্তু কেন পারে—কেন এরকম হয়—তার কোন এক্সপ্ল্যানেশান দিতে পারেন নি।

দেওয়া যায় না। অলৌকিক কি অতিপ্রাকৃত কোন ঘটনার কি কারণ কখনো বলা যায়? তবে এইটুকু আপনাকে বলতে পারি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন, বাড়িতে একজন যে বিষয়ে চিন্তা করল, অন্য একজন ঠিক সেই কথাটিই বলে দিল। এখন ভাবতে হবে—এরকম ব্যাপার যদি সত্যিই বহুবার বহু-জায়গায় ঘটতে থাকে তবে তা একেবারেই আকস্মিকভাবে ঘটছে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—

চিন্তাশীল মনীষি, জ্ঞানীগুণী, দার্শনিক ও পরলোকবিদরা অনেকদিন থেকেই এই বিষয়ে গবেষণা করে চলেছেন। বেঙ্গল থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির বা বঙ্গদেশীয় তত্ত্ববিদ্যা সমিতির মুখপত্র ব্রহ্মবিদ্যায় একটি প্রবন্ধে বলেছেন প্রেতবিদ্যা বিশেষজ্ঞ তুলসীদাস কর—কোন চিন্তা যখন সোজাসুজি এক মন থেকে আর এক মনে পেঁছে যায় তখন স্বীকার করতেই হবে—একটি সূক্ষ্ম এবং অদৃশ্য ভূমা পদার্থ দুটো মনকে সংযুক্ত করে রয়েছে।

ভূমা অর্থাৎ বিরাট। সর্বব্যাপী পুরুষ বা ব্রহ্মানন্দ। বিশ্বব্যাপী মানুষের চলমান জীবনের লীলার সঙ্গে তো বিরাট পুরুষের বা ব্রহ্মানন্দের এক অখণ্ড যোগ। তাই হয়তো ঈথারের ভেতর দিয়ে একজনের চিন্তার প্রবাহ আর একজনের মনে গিয়ে পেঁছায়।

চিন্তার রেশ যে তার অনুপরমানু নিয়ে ঈথারে ভেসে ভেসে বেড়াতে পারে এবং কোথাও না কোথাও তার অস্তিত্বও থাকতে পারে কিম্বা একেবারে অকল্পনীয়ভাবে অনেকদিন বাদে কোথাও প্রকাশিত হতে পারে তার একটা সত্যি ঘটনা বললে হয়ত আপনার বুঝতে সুবিধে হবে—

এক রূপসী তরুণী। দীর্ঘাঙ্গী। খরযৌবনা। রূপযৌবন এবং পিতার সম্পদের প্রাচুর্য। কোন কিছুরই অভাব নেই। তবুও—তবুও তার বড় বড় দুটো নীলাভ চোখের কোণে কোণে বিষাদের গাঢ় ছায়া।

কি করি বলুন তো—ম্যাকফারসান বললেন তাঁর এক বন্ধুকে, মেয়েটা মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে দুই—দুইবার স্বামী পরিত্যক্ত হল—

দেখেশুনে আর একবার বিয়ে দিয়ে দিন—

ম্যাকফারসান কোন কথা বললেন না। নিজের ভেতরে মগ্ন হয়ে গেলেন। প্রথম বিয়েটা তো যথেষ্ঠ খোঁজখবর করেই নিজে দিয়েছিলেন। ছেলের টিম্বারের বিজনেস ছিল। যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য তেমনি মিষ্টি স্বভাব। ডোরার সঙ্গে ভাবসাবও ছিল খুব। কিন্তু—

কি যে হল কে জানে? ব্রেজিলে দলবল নিয়ে গেল কাঠ কাটতে। এই রকম মাঝে মাঝে কখনো ক্যানাডায়, কখনো অ্যামাজনে যেত কাঠ আনতে। আবার মাসখানেক কি মাস দেড়েক পরে ফিরে আসত। কিন্তু এবার ব্রেজিলে গিয়ে আর ফিরল না। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল ব্রেজিলের কোন রিজার্ভ ফরেস্টের এক রেঞ্জারের মেয়ের সঙ্গে লাভ ম্যারেজ করে সেখানেই

সেটল হয়ে গিয়েছে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ডোরা।

অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে তাকে শান্ত করল।

মাস তিনেক যেতে না যেতেই ডোরা এক ছোকরার প্রেমে পড়ল। ছেলেটি ব্যাঙ্কে চাকরি করত। ভাল চাকরি। কিন্তু হলে কি হবে—ডোরার যে কপাল মন্দ। বিয়ের এক মাস বাদেই ছেলেটির আগের স্ত্রী এসে বাড়িতে চড়াও হল। তাকে ডিভোর্স না করে কেন আবার বিয়ে করেছ বলে চার্জ করল। কোর্টে নালিশ করবে বলে শাসিয়ে চলে গেল। ছেলেটি ভয় পেয়ে সুড়সুড় করে বাড়ি ফিরে গিয়ে প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে আপোষ করে ফেলল। এবার ডোরা আর কাঁদল না।

পাথর হয়ে বসে রইল।

কি এত ভাবছেন মিঃ ম্যাকফারশান, বন্ধু বললেন, আপনার মেয়ে যদি রাজি থাকে—তাহলে ভাল ছেলের খোঁজ আমি দেব—

দেখি তো—এখন তো একেবারে আপ-সেট হয়ে আছে, বললেন ম্যাকফারসান।

ধীর পায়ে ভেতরে এলেন তিনি। বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে ডোরা। তার বুকের ভেতরটা ভারি—খুব ভারি হয়ে উঠল। সস্নেহে মেয়ের পিঠে হাত রেখে বললেন কিছুই তো খাস নি মা—একটু গরম জল করে নিয়ে আসি—হরলিক্স কি কমপ্ল্যান একটু খা—

ডোরা উঠে বসল। জলে ভেজা চোখদুটো মুছে নিয়ে স্থির অপলক চোখে যীশুর ছবির দিকে তাকিয়ে রইল।

ম্যাকফারসান গ্যাসের ওভেনে কেটলি চাপিয়ে দিলেন। একটু পরেই শোঁ শোঁ শব্দে জল ফুটতে লাগল। বাইরে একটানা উত্তরে বাতাসের শব্দ আর কেটলিতে ফুটন্ত জলের আওয়াজকেও ছাপিয়ে বহু বহু দূর থেকে কে যেন খুব ক্ষীণ কিন্তু তীক্ষ্ম কণ্ঠে বলল, সূর্য অস্ত যায় কিন্তু আবার ওঠেও তো…

ম্যাকফারসন চমকে উঠলেন। কে বলল কথাটা? ডোরা বলে নি তো? তার এই মানসিক অবস্থায় কি এসব বলা সম্ভব? নির্জন জনমানবহীন বাড়িটার চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর সন্দেহ হল। তাঁরই মনের ভেতর থেকে কথাটা যেন কেউ বলে উঠল—

যাই হোক। একেবারে এক গ্লাস কমপ্ল্যান তৈরি করে নিয়েই শোকার্ত মেয়ের কাছে এলেন তিনি। মাথায় হাত রেখে মৃদু কণ্ঠে বললেন, এইটুকু খেয়ে নে মা, একটু থেমে আস্তে আস্তে বললেন, ভেবে দেখিস মা, সূর্য অস্ত যায় ঠিকই আবার ওঠেও তো—

ঠিক বলেছ বাবা—ঠিক বলেছ, অদৃশ্য কোন প্রেরণায় ঝকমক করে উঠল ডোরা। নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, সংসারে কিছুই হারায় না—

ডোরাকে অনেক—অনেকদিন বাদে খুব শান্ত ও প্রসন্ন দেখলেন ম্যাকফারসান।

একবছর পর। আবার কনের সাজে সাজল ডোরা। ম্যাকফারসনের সেই বন্ধুরই বড় ছেলে। একেবারে চেনাশোনা ঘরের ছেলে। বাপ—মেয়ে দুজনেই খুশি। বহুদিন বাদে তাঁর সেই বিশাল প্রাসাদ সহস্র আলোর মালা পরে রূপসী হয়ে উঠল। আত্মীয় বন্ধু সমাগমে মুখর হয়ে উঠল সেই নির্জন বাড়ি।

ম্যাকফারসান এবং তাঁর বন্ধু এবং বৈবাহিক ঠিক করলেন, বিয়ের প্রীতিভোজটা বেশ জমকালো করে দূরে কোথাও করতে হবে। জায়গা ঠিক হল—লণ্ডন থেকে চল্লিশ মাইল দূরে এক শান্ত নিভৃত গ্রামের প্রান্তে ইংল্যাণ্ডের নৃপতি প্রথম জেমসের সমসাময়িককালের শৈলীতে তৈরি অর্থাৎ জ্যাকরিয়ান স্টাইলের এক বিশাল প্রাসাদ।

হুল্লোড় করে খানাপিনা শেষ হল। ফটোগ্রাফার এসে তাড়া দিয়ে বলল, দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে—প্লীজ তাড়াতাড়ি করুন—

ঠিক হয়েছিল জ্যাকরিয়ান ম্যানশানের সুদৃশ্য কারুকার্য করা মেনগেটের নিচে নবদম্পতির ছবি তোলা হবে। কিন্তু সেখানে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। —বাগানে চলুন, সেখানে প্রচুর আলো আছে, ফটোগ্রাফার সাজেশান দিল।

তাড়াতাড়ি করে সদলবলে বাগানের গেটের কাছে আসতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ম্যাকফারসান। গেটের শ্বেতপাথরের খিলানে ছোট ছোট লাল পাথরে খোদাই করা আছে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী—সান সেটস, ইট অলসো রাইজেস—সূর্য অস্ত যায় আবার ওঠেও—

বাসন্তীদেবী! যে কথাগুলো দৈববাণীর মত শুনেছিল ম্যাকফারসান, এবং যে কথাগুলো বলে মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়েছিল—ঠিক সেই কথাগুলোই সূক্ষ্ম ভূমাপদার্থের সাহায্যেই জ্যাকরিয়ান প্রাসাদে চলে এসেছিল। রক্তের অক্ষরে গেট শোভা পেয়েছিল—এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন পরলোকবিদরা।

অবশ্যই স্মরণ রাখবেন, টেলিপ্যাথিতে 'সাইকিক ফোর্স" অর্থাৎ আত্মার এবং মনের বিপুল শক্তিতেও অনেক সময় দেখা যায়, একান্ত করে যা ভেবেছেন—সেটাই বাস্তবে রূপায়িত হয়ে গিয়েছে। বছর দশেক আগে বরানগরের এক ট্যাক্সিচালকের মুখে শুনেছিলাম ঘটনাটি—

অফিস টাইম। বি. বা. দী বাগে সওয়ারি নামিয়ে দিয়ে গাড়ি পার্ক করছি। ভদ্রলোক রাইটার্সে কাজ শেষ করে ফিরবেন বলে গেলেন অতএব আমাকে ওয়েট করতে হবে। পার্ক করতে করতে হঠাৎ পিছনে একটা চাকা একটু ঠোক্কর খেল।

কি ব্যাপার?

চাকার নিচে এক টুকরো পাথর পড়েছিল। নোংরা কাদামাটি তার গা থেকে ঘসে ঘসে তুলতেই সাদা মার্বেল পাথর ঝিকিয়ে উঠল।

দেখুন তো স্যার, এই মার্বেল স্টোনটি কি আপনার? ভদ্রলোক ফিরে এলে তাকে দেখলাম। বললাম, আপনার বাড়ির বাচ্চাদের খেলার মার্বেলও হতে পারে—

না—না, আমার বাড়ির ছেলেরা মার্বেল খেলেই না—ওটা আমার নয়—

যাই হোক। বিয়ে-থা করিনি। যাদের বাড়িতে পেয়িংগেস্ট হয়ে থাকি তাদের ছেলেপুলের বালাই নেই। আবার আমি যে খেলব—সেটাও হাস্যকর। আমার বাল্যকালটা ত্রিশ বছর আগের একটা ঝাপসা ঝুলকালিপড়া ছবির মত অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। মোটের ওপর এই মার্বেলটা দিয়ে আমার কোন দরকারই নেই। কিন্তু মন বলে উঠল, থাক না কোন প্রয়োজনে লেগে যেতে পারে—আমি পকেটে রেখে দিলাম মার্বেলটা।

সেইদিনই বিকেলে শ্যামবাজারে পাঁচ মাথার মোড়ে এক পেট্রোল পাম্পে পেট্রোল নিতে ঢুকলাম। অ্যাটেনড্যান্ট ছোকরাটা একেবারে হালে ঢুকেছে। নভিস। তার ওপর আবার প্রচণ্ড ছটফটে। যে কয়েক লিটার চাইলাম পেট্রোল, সেটা ঠিকই দিল। কিন্তু আমি যেই তাকে বললাম, ভাই ব্যাটারীটায় একটু জলটল ভরিয়ে ঠিক করে দাও না?

ও, এ আর কি কঠিন কাজ, বলেই বড় বড় চুলে ভরা মাথাটা ঝাঁকিয়ে ছুটে চলে গেল গাড়ির ভেতরে। তাড়াতাড়ি করে ভারি ব্যাটারীটা টেনে নামাতে যেতেই তার স্টপার বা ছিপিটা কোথায় ছিটকে পড়ে গেল। যদিও কোনমতে ব্যাটারীতে জল ভরানো হল এবং টেনে তুলে ঠিক জায়গায় বসানোও হল—কিন্তু ব্যাটারীর মুখ থাকল খোলা! গাড়ি চললেই জল চলকে পড়বে। কি করা যায়।

পেট্রোলপাম্পের কর্মী ছেলেটি আর আমি তন্নতন্ন করে পাম্পিং স্টেশন চত্বরের চারিদিক দেখলাম। গাড়ির নিচে এমন কি রাস্তাতেও দেখে এলাম—কোথাও পেলাম না সেই স্টপার। হতাশ হয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিতে যাব এমন সময়ে পকেটে শক্ত মত কি একটা ঠেকল! বুকের ভেতরে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। আমার কাছেই তো মার্বেল রয়েছে। স্টপারের জায়গায় মার্বেল পাথরের টুকরোটা বসিয়ে দিলাম। দিব্যি ফিট করে গেল—

এই ঘটনাটিকে কি বলবেন বাসন্তীদেবী? এটা কি কয়েনসিডেন্স একসঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটেছে—(১) হঠাৎ মার্বেল পাথরের টুকরোটা কুড়িয়ে পাওয়া (২) ব্যাটারীর স্টপারের জায়গায় সেটা ফিট করে যাওয়া? স্টপারের বা ছিপির কাজ হবে বলেই পেয়েছিল মার্বেলটা, না মার্বেল পাথরের খণ্ডটা পেয়েছিল শুধু ছিপির কাজ চালানোর জন্যই? আর ড্রাইভারসাহেবের সেই ইনটুইশান —কোন না কোন দরকারে লেগে যেতে পারে—সেটাও একটা বড় ফ্যাক্টর। এইসব জটিল চুলচেরা বিচারে না যেয়ে তার চেয়ে অনেক অনেক সহজ হয়ে যায় যদি ভাবি সেই ভূমা—সেই সর্বব্যাপী বিরাট পুরুষ বা ব্রহ্মানন্দের

অদৃশ্য হাতই ট্যাক্সিচালককে মার্বেল পাথরের টুকরোটি উপহার দিয়েছিল—শুধু ভবিষ্যতের বিপদ বা অসুবিধা থেকে বাঁচার জন্যে—

আপনার চিঠিটার একেবারে গোড়াতে উল্লেখ করেছেন তো টেনিসনের সেই বিখ্যাত কবিতা—Star to star vibrates light, may soul to soul—এক তারা থেকে অন্য তারায় যেমন আলো প্রতিফলিত হয়, তেমনি এক আত্মা আর এক আত্মায় যে তার আকুতি, তার বিভিন্ন অনুভূতি সঞ্চারিত করে দিতে পারে তার একটা ঘটনা শুনুন—

২৬শে মে, ১৯৮৭। ঠিক পাঁচমাস আগেকার কথা। শিলিগুড়িতে সেজ শ্যালক দীপবের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি। কথায় কথায় সে বলল, আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে মাছের চাষ করব বলে একটা পুকুর ইজারা নিয়েছি, একটু থেমে আবার বলল, বেশ কয়েকদিন ধরে তার নোংরা জল ছেঁচে ফেলা হচ্ছে—যাবেন নাকি দেখতে?

আমি রাজি হলাম। আমাকে মোটামুটি পুকুরটার লোকেশান বলে দিয়ে সে আগে বেরিয়ে গেল। রোদ পড়ে এলে আমিও রওনা হলাম।

সেবক রোড। শিলিগুড়ি সার্কিট হাউস বাঁয়ে রেখে চওড়া পীচ ঢালা ঝকঝকে দূরবিসর্পিল রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছি। রাস্তার ধরে এক একটা মাইল পোষ্ট। তার কোন ফলকে লেখা আছে—গৌহাটি—৫৭৫ কি. মি. কোনটায় বারহি—৫৭৩ কি. মি. আবার কোনটায় বাগডোগরা—১১ কি. মি.। নামগুলোর মাধ্যমে অদেখা সেই জায়গাগুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। অবশ্যই মনটাকে মধুর এক অনুভবের প্রসন্নতায় আপ্লুত করার মত আছে আরও উপকরণ—যতদূর চোখ যায় রাস্তার দু-পাশে সার সারি দেবদারু আর কৃষ্ণচূড়া, কোথাও কোথাও আছে রাধাচুড়ো ও দীর্ঘ দেবদারুর ঘন সবুজের পটভূমিতে কৃষ্ণচুড়ার গাঢ় রক্তবর্ণ আর রাধাচুড়োর আগুনের মত হলদে রঙের বিপুল সমারোহে মনটা কেমন অভিভূত আচ্ছন্নতার ভেতরে তলিয়ে যায়। দূরে মহানন্দার বিস্তীর্ণ বালুচর ছবির মত সুন্দর এক একটা ঘরবাড়ি। মনে হয় যেন এক সুদূর স্বপ্নের দেশে—

এই যে সুভাষদা—আমরা এখানে—এ—এ—এ—রাস্তার পাশে বহু—বহুদূরের এক নামাল জমি থেকে হেঁকে বলল দীপক। নজরে পড়ল সেখানে অনেক লোকের জটলা। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গেলাম।

বেশ বড় পুকুর। মজুররা কেউ টিনে করে কেউ বা বালতি দিয়ে জল ছেঁচছে। জল একেবারে নিচে অর্থাৎ 'বেড়ে' চলে এসেছে। কিন্তু তলার জলটুকু কিছুতেই যাচ্ছে না। দীপকের মুখখানা অন্ধকার। বন্ধুদের ভেতরে উত্তেজিত বচসা চলছে।

—আরে বেডটা ইট দিয়ে বাঁধিয়ে দিলেই তো হয়—

—না। কখনো না—ফ্রেস জল যখন আমরা ছাড়ব, তখন ইট-সিমেন্টের কংক্রীটের ভেতরে মাছ থাকতে পারবে?

—কি করা যাবে বলে, দশ-বারোদিন ধরে বিশজন লেবারের মজুরি দিচ্ছি কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না—

দীপক তাদের কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে যেন নিজের মনকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, বাগডোগরায় আমার বন্ধু সুজিতের পাম্পিং মেশিনটা যদি একদিনের জন্যও পেতাম—

ঘরর-ঘরর—ঘরর রাস্তায় গাড়ির শব্দ শোনা গেল। একটা ম্যাটাডোর পাম্পিং মেশিন নিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে। দীপক দুহাত তুলে উল্লাসে চিৎকার করে বলল—সুজিত—আয়—আয় তোর কথাই ভাবছিলাম—

পাম্প চালানো হল। পুকুর শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেল।

এবার আপনাকে ক্লেয়ারভয়ান্স বা দিব্যদৃষ্টি সম্বন্ধে যতটুকু জানি বলার চেষ্টা করছি—

Clairvoyance ফরাসী শব্দ। কথাটা বিদেশী হলেও অর্থটা কিন্তু অপরিচিত নয়। clair ল্যাটিন শব্দ অর্থাৎ clear—পরিস্কার। আর voyance হল vedere বা দেখা। তাহলে clairvoyance-এর অর্থ দাঁড়ালো clear vision বা স্বচ্ছ দৃষ্টি। আরও বিশদ করে বলা যায় যা আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে অবগুণ্ঠিত এবং যবনিকার অন্তরালে বলে মনে হয়, যে দৃষ্টির সাহায্যে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় তাকেই আমরা বলি ক্লেয়ারভয়ান্স বা দিব্যদৃষ্টি।

ক্লেয়ারভয়ান্স নিয়ে এখন পৃথিবীর দেশে দেশে গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। ক্লেয়ারভয়ান্স বা দিব্যদৃষ্টি এখন একটি প্রমাণিত সত্য। দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে যায় বর্তমান ছাড়িয়ে সুদূর অতীতের কুয়াশা পাড় দিয়ে দূরের বহুদূরের অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। তাঁরা ভূ:ল কে যেমন জড়দেহ তেমনি সূক্ষ্মলোকে সূক্ষ্মদেহধারী অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ করতে পারেন—

অত তত্ত্বকথার কচকচির ভেতরে না গিয়ে বিচিত্র ও দুর্লভ দিব্যদৃষ্টির অধিকারী এক মনীষীর জবানীতেই শুনুন তাঁর ক্লেয়ারভয়েন্সের অসামান্য অলৌকিক ক্ষমতার এক অদ্ভুত বৃত্তান্ত—

আমি একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। আমার একেবারে কোন অপরিচিত লোকের সঙ্গে হয়ত কথা বলছি। তিনিও হয়ত অনেক—অনেক কথা বলে চলেছেন। কিন্তু আমার কানে কিছুই যাচ্ছে না। ভদ্রলোকের সাবেক জীবনের সমস্ত ঘটনা এমন কি কোন কোন ঘটনার খুঁটিনাটি পর্যন্ত ছবির মত আমার চোখের সামনে দিয়ে যেন মিছিল করে চলে যেত। প্রথমে ভেবেছিলাম—

ভুল—সব আমার মনের ভুল! উদ্ভট। অসম্ভব। অবাস্তব। কিন্তু চমকে উঠলাম তখন যখন দেখলাম, আমি আমার মনের চোখে যেসব ইমেজ

দেখেছি সব—সবই তো আশ্চর্যভাবে মিলে যাচ্ছে। আমার ভেতরে যে ক্লেয়ারভয়ান্সের আশ্চর্য শক্তির বিকাশ হয়েছে সেটা আরো স্পষ্ট করে একেবারে নিশ্চিত করে বুঝতে পারলাম সেদিন—

সুইজরল্যান্ডের ওয়াল্টসাণ্ট শহরের এক ভাইনে অর্থাৎ সরাইখানায় খেতে বসেছি। আমারই টেবিলের আর এক দিকে আরও কয়েকজন যুবক খুব হুল্লোড় করে খাচ্ছিল।

—আরে রাখ তো—জেনে রাখিস সুইজারল্যাণ্ডের লোকগুলো বুজরুক, ঠক, ধাপ্পাবাজ—

—তুই এত চটছিস কেন রে ?

—আরে ভাই মুখ দেখে আমার ভবিষ্যৎ বলে দেবে বলে একটা সুইস আমাকে এমন ঠকিয়ে দিল—

আমি—আমি যদি আপনার ভবিষ্যৎ বলতে পারি, একটানা বিদ্রূপ আর নিন্দা শুনতে শুনতে অসহ্য হয়ে তাদের ভেতরে নাক গলিয়ে বললাম, সেই ছোকরাকে ভবিষ্যৎ পরে হবে, আগে আপনার অতীতটা শুনুন—

যুবকটি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল।

আপনার পুরানো জীবনের ঘটনাগুলো যদি মিলে যায় তাহলে স্বীকার করবেন—বলুন—

নিশ্চয়ই। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব, একটু যেন চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতেই সে বলল।

আপনি পাকা ক্রিমিন্যাল। দিব্যদৃষ্টির শক্তির সাহায্যে যা প্রত্যক্ষ করেছি বলতে শুরু করলাম, অবশ্য ছাত্রজীবন থেকেই আপনি ছোটখাটো অপরাধ করে চলেছেন। একটু থেমে তার বিহ্বল চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে আবার বললাম, কিছুদিন আগেও তো আপনি যার কাছে চাকরি করতেন সেই মালিকের টাকাপয়সা রাখার গোপন জায়গাটা দেখে নিয়েছিলেন। সেই গুপ্তস্থান এবং তার সিন্দুক থেকেও আপনি প্রচুর অর্থ—

বলবেন না—আর বলবেন না—আগুনের ছ্যাকা লাগলে যেমন হয় ? তেমনি ছটফট করে আমার কাছে এসে হাতদুটো ধরে দ্রুত কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল, আমি পালিয়ে আছি—এখনও কেউ জানে না—প্লীজ কাউকে বলবেন না —বলেই ঝড়ের মত সে বেরিয়ে গেল—এই কথাগুলো বলেছেন সুইজারল্যাণ্ড নিবাসী জার্মান যোগী এবং প্রখ্যাত লেখক শোক্কে (Zschhokke)—শোক্কে তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার এই ঘটনাটির আরও বিশদ বিবরণ দিয়েছেন তাঁর আত্মচরিতে—এই খবরটি দিয়েছেন আর এক অসাধারণ দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি—পরলোকবিদ এবং সিদ্ধযোগী বিশপ সি. ডবলিউ লেডবীটার। তিনি আরও জানিয়েছেন ক্লেয়ারভয়ান্স বা দিব্যদৃষ্টি হল সময়ভিত্তিক বা কালিক। এই কালিক দিব্যদৃষ্টির দুই বিভাগ (১) অতীতকালের দৃষ্টি বা Retrocognition or Retrovision এবং আরও বলা যায় অতীত ঘটনার

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন কিছুকে অবলম্বন করে জ্ঞানলাভ করার ক্ষমতা—যার বিজ্ঞানসম্মত নাম—সাইকোমেট্রি। (২) আর একটি হল প্রাকদৃষ্টি অর্থাৎ বর্তমানেই ভবিষ্যতের ঘটনার প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করা।

শোকে বর্ণিত সেই অসাধু যুবকের ঘটনাটা হল সাইকোমেট্রির একটা উপযুক্ত নজির।

অতীত দৃষ্টির আর একটি উদাহরণ—

স্থান—বৃন্দাবন। কলকাতা থেকে এসেছেন আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। ব্রাহ্মধর্মপ্রচারের বক্তৃতা করবেন। শ্রোতারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আচার্য উঠলেন ভাষণ দিতে। কিন্তু—

কি আশ্চর্য। গোড়া থেকেই তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেম, লাস্যময়ী গোপিনীদের ছলাকলা, অর্থাৎ এক কথায় গোষ্ঠলীলার এমন নিখুঁত বিবরণ তাঁর স্বভ বসিদ্ধ ওজস্বিণী ভাষায় বলতে শুরু করলেন, মনে হল তিনি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন সব কিছু—

ব্রাহ্মধর্মের ভক্তরা উসখুস করতে লাগল। আচার্য নিরাকার সেই পরমব্রহ্মের কথা তো কিছুই বলছেন না। বক্তৃতা শেষ হল। আচার্যের বন্ধুরা বললেন, এ আপনি কি করলেন ?

—স্থানমাহাত্ম্য, আচার্য গম্ভীর হয়ে বললেন, যে সব দৃশ্য একটার পর একটা আমার চোখে ভেসে উঠছিল আমি তারই বর্ণনা করতে বাধ্য হয়েছি—

অমৃতলাল সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর আচার্য বিজয়কৃষ্ণের 'সাধনা' ও উপাসনা গ্রন্থে এই আশ্চর্য ঘটনার বিবরণ দিয়ে মন্তব্য করেছেন—আচার্য পৌরাণিক-কালের সেই বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ লীলা দিব্যচোখে প্রত্যক্ষ করেছিলেন—

বাসন্তীদেবী আপনি হয়ত ভাবছেন, কি করে এসব সম্ভব হয়—কেমন করে জার্মান লেখক শোকে সেই যুবকের দুষ্কৃতির কথা জানতে পারলেন, আর বৃন্দাবনের সেই সুদূর পৌরাণিককালের গোষ্ঠলীলার দৃশ্যই বা কি করে দেখতে পেলেন আচার্য বিজয়কৃষ্ণ। আপনি বলবেন, কেন দিব্যদৃষ্টি সাহায্যে!

কিন্তু ম্যাডাম, কখনো ভেবে দেখেছেন, দিব্যদৃষ্টির অধিকারী ব্যক্তির চোখের সামনে সাবেক দিনের ছবিগুলো আসছে কি করে। ক্যামেরার ভেতরে ফিল্ম রোলে যেমন ছবি তোলা থাকে, তেমনি কি কোথাও কোন অদৃশ্যলোকে অতীতদিনের ঘটনাগুলোর অস্তিত্ব থাকে ?

প্রখ্যাত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ওয়াইল (weyl) এই ক্লেয়ারভয়ান্সের অতীত দৃষ্টি বা সাইকোমেট্রি প্রসঙ্গে জানিয়েছেন আমরা যাকে কাল বলে কল্পনা করে থাকি—সেই কালের স্রোতে বহমাণ বিভিন্ন ঘটনা, নানা বস্তু এবং সহস্র রকমের দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও নির্দিষ্ট গতিতে চলছি। ঠিক সেইরকম গতিতেই নানাঘটনার দৃশ্য আমাদের দিকে সরে সরে আসছে। অতীত

ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনাই থরে থরে সুসজ্জিত হয়ে অদৃশ্যলোকে নিত্য অবস্থান করছে। আমরাই পর পর একটি ঘটনার নিকটস্থ হচ্ছি—তারা কিন্তু সংঘটিত হচ্ছে না। বেলগাড়িতে যাওয়ার সময় যেমন একটার পর একটা দৃশ্য আমরা দেখতে পাই—এ-ও অনেকটা সেইরকম। তাই ওয়াইলসাহেব স্পষ্টই বলেছেন—Events do not happen we may come across them।

সাইকোমেট্রি বা অতীতদৃষ্টির আরো একটি ব্যাখ্যা করেছেন থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি এবং একনিষ্ঠ ভারতহিতৈষী অ্যানি বেসান্ট এবং পরকালবিদ বিশপ লেডবীটার—প্রাকৃতিক সমস্ত ঘটনারই চিত্র কারণলোকে বা বিজ্ঞানময় লোকে সংক্ষিপ্তভাবে (abstract) কিম্বা গণিতের ভাষায় অপেক্ষকরূপে রক্ষিত হয়। যোগীর বা মিডিয়ামের দিব্যদৃষ্টির শক্তির সাহায্যে সেই সযত্নে রক্ষিত অপ্রকট বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে প্রকটিত হয়ে যায়।

আরও বলেছেন শ্রীমতী বেসান্ট—হিন্দুদের ভেতরে একটা বিশ্বাস আছে প্রেতলোকের বড়কর্তা যমরাজের একটি দপ্তরখানা বা সেক্রেটারিয়েট আছে। সেখানকার ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারীর নাম—চিত্রগুপ্ত। বড় বড় লেজারে নাকি সকলের পাপপুণ্য, ভালমন্দ কাজের হিসেব তিনি লিখে রাখছেন। দেহত্যাগের পর প্রত্যেকের কৃতকর্ম অনুযায়ী বিচার হবে—কথাটা কল্পনাপ্রসূত মনে হলেও তার ভেতরে একটি বৈজ্ঞানিক সত্য আছে—চিত্রগুপ্ত কথাটা উল্টে দিয়ে পড়লে হয় গুপ্তচিত্র বা Occult record. একে আকাশচিত্র বা Akasic Record-ও বলা হয়, যে রেকর্ডে বিজ্ঞানময় বা কারণময় লোকের অতীত ঘটনার চিরস্থায়ী চিত্র থরে থরে সাজানো থাকে। তাই তো—

তাই তো দুই বোনের চোখে ফ্রান্সের একশো বছর আগের দৃশ্যগুলো ভেসে উঠেছিল।

দুই বোন। দুই সুন্দরী আর বিদুষী। ১৯০১ সালে তাঁরা বেড়াতে এলেন ভার্সাইয়ে। উদ্দেশ্য আর কিছুই না—একটু হাওয়া বদল আর ইতিহাসের জায়গাগুলো একটু ঘুরে ফিরে দেখা। ভার্সাই থেকে তারা ট্রেননে বেড়াতে গেলেন। ট্রেননের মাটিতে ফরাসী বিপ্লবের রক্তের দাগ। তাঁরা দুইজনই মিস মবার্লি এবং মিস জোর্ডেন ইতিহাসের ছাত্রী। দুইজনই অক্সফোর্ডের সেন্ট হিউ (St. Hew) কলেজে পর পর অধ্যক্ষা হয়েছিলেন। অতএব খুব উৎসাহ নিয়ে ট্রেননের চারিদিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলেন তাঁরা। কিন্তু—

একী! থমকে দাঁড়াল তাদের হৃদস্পন্দন। এসব কী দেখছেন তারা! রাস্তা দিয়ে যেসব পথচারী মেয়েপুরুষ চলেছে তাদের প্রত্যেকের পরণে প্রায় একশো বছর আগে ফরাসী বিপ্লবের যুগের পোশাক কেন? এরা কি এখনও সেই ১৭৮৯ সালের ভেতরেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। আশ্চর্য তো। শহরের উপকণ্ঠে এমন গাছগাছালিতে ভরা বড় বড় বাগান। দূরে দূরে এমন গহন অরণ্য আছে যা আধুনিককালে থাকার কথা নয়। আদ্যিকালের নড়বড়ে

বাঁশের সেতুর ওপর দিয়ে বড় কষ্টে লোকজন যাতায়াত করছে। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা এলেন রাজপ্রাসাদ দেখতে। প্রধান তোরণের দুইদিকে সারি সারি প্রহরারত সশস্ত্র সৈন্য এবং প্রহরীদের পরণেও সেই বিপ্লবের যুগের পোশাক। এখানে কি বিশের এই শতকেই আঠারদশ শতাব্দী বিরাজ করছে! এই সন্দেহটাই সত্য প্রমাণিত হল যখন তাঁরা দেখলেন এক সুন্দরী মহিলা গ্রীষ্মকালের বেশ ঢিলঢালা হাল্কা পোশাক পরে সেই প্রাসাদের অলিন্দে ধীর পায়চারি করছেন।

পরবর্তীকালের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে বিপ্লবের পর রাজশক্তির চরম পরাজয় বিলাসী নৃপতি ষোড়শ লুইয়ের অসামান্য রূপসী পত্নী মেরী আঁৎওয়াৎ (Marie Antoinette) যখন নিতান্ত সাধারণ মানুষের মত জীবনযাপন করতেন, সেই সময় ঠিক এই রকমের পোশাকই পরতেন। মবার্লি আর জোর্ডনের তের বছর পর—১৯১৪ সালে তিনজন শিক্ষিত ব্যক্তি ভার্সাইয়ের ট্রেননে এসেছিলেন এবং তাঁরা একটানা ছয় বছর ছিলেন এখানে। তাঁরাও ভার্সাইয়ের সর্বত্রই শতবৎসর পূর্বের জীবনধারাই প্রত্যক্ষ করে খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। এই ঘটনাটি নিঃসন্দেহে অতীতদৃষ্টি বা সাইকোমেট্রির একটি প্রকৃষ্ট নজির। ট্রেননের আকাশে বাতাসে ফরাসী বিপ্লবের এবং মেরী আঁৎওয়াতের জীবনের অতীত ঘটনাগুলো সযত্নে অদৃশ্য কালিতে লেখা ছিল। মিস মবার্লি এবং জোর্ডেণ বা সেই ভদ্রলোকেদের চোখে হঠাৎ প্রকটিত হয়ে উঠেছিল সাবেকদিনের দৃশ্যগুলো।

বাসন্তীদেবী এবার প্রাক-দৃষ্টি অর্থাৎ ভবিষ্যতের ঘটনা সম্বন্ধে জানতে পারার অলৌকিক শক্তির আলোচনায় যাওয়া যেতে পারে।

১৮৬৪ সালের এপ্রিল মাসে আততায়ীর গুলিতে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন নিহত হলেন। ঠিক তার একবছর আগে—১৮৬৩ সালে ডিয়েপশহরে প্রেতচক্রের বা সিয়ান্সের আসর বসেছে। প্রখ্যাত মিডিয়াম বা যোগী মি. ডি. ডি হোম হঠাৎ বলে উঠলেন, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অনারেবল প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন, হঠাৎ উইংসের আড়াল থেকে এক ঘাতক বেরিয়ে এসে তাঁকে গুলি করল—একটু থেমে তিনি আবার বললেন, এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড এক বছরের ভেতরেই ঘটবে—

ঠিক একবছর না হলেও, সময়ের একটু হেরফের হয়েছিল কিন্তু ১৮৬৪ সালের শেষেই মিডিয়াম হোম যেমন বলেছিল ঠিক তেমনি করেই নিহত হয়েছিলেন প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন।

শুধু তাই নয়। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার ছয় সপ্তাহ বা দেড় মাস আগে লিঙ্কন এক ভয়াবহ স্বপ্ন দেখেছিলেন—একটি সুদৃশ্য শবাধারের চারদিকে সশস্ত্র রক্ষীরা দাঁড়িয়ে আছে। তারা পাহারা দিচ্ছে কফিন।

কার শবদেহ ?

কেন স্যার আপনি জানেন না প্রেসিডেণ্ট লিংকনকে যে হত হয়েছেন।

তারপরও তিন-তিনবার তিনি তার জীবনের মর্মান্তিক পরিণতির আভাস পেয়েছিলেন। দেখেছিলেন দুঃস্বপ্ন—বিশাল এক নদী। যেমন গভীর কালো তার জল তেমনি উত্তাল তার স্রোত। সেই নদী তিনি নৌকাতে চড়ে পাড়ি দিচ্ছেন।

প্রচণ্ড ঝড় এল। নৌকো তলিয়ে গেল। তিনিও ডুবে গেলেন। বন্ধুবান্ধব বা সভাসদদের কাছে এই স্বপ্নের কথা বহুবার বলেছেন—কিন্তু নিজে এতটুকু সতর্ক হন নি।

লর্ড ডাফরিণ।

১৮৮৪ থেকে ১৮৮৮ চার বছর তিনি ছিলেন ভারতের বড়লাট। অবসর নিয়ে নিজের দেশ আয়ারল্যাণ্ডে ফিরে গিয়েছেন। নিশ্চিন্ত এবং নিরুদ্বেগ জীবনযাপন করছেন।

একদিন বাগানে বসে আছেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল, দূরে পপলার গাছের নীলাভ ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে এক অতি কদর্য বীভৎস ছায়াদেহ। তিনি একটু এগিয়ে দেখলেন, একটা অত্যন্ত কুৎসিত দর্শন মানুষ। মুখখানাও কেমন হিংস্র বলে মনে হল। কিন্তু তাকে আসতে দেখেই লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

বছর দুইয়েক পরে তিনি ফ্রান্সে ইংল্যাণ্ডের রাজদূত নিযুক্ত হলেন। প্যারিশে ইংল্যাণ্ডের দূতাবাস থেকে কিছু দূরে একটা রেস্টুরেণ্টে তিনি দুপুরের লাঞ্চ শেষ করে ফিরে এলেন নিজের অফিসে। গ্রাউণ্ডফ্লোরে লিফটের জন্য অপেক্ষা করছেন। মিনিট দুয়েক পরেই সাঁসাঁ করে লিফট নেমে এল। আশ্চর্য। লিফটচালক সেই কুৎসিত লোকটা। তার বুকের ভেতরে একটা অস্বস্তি কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। তিনি গেলেন না। অফিসের আর ছয়জন লোক গেল। একটু ওপরে যেতে না যেতেই দড়ি ছিড়ে লিফট পড়ে গেল। সেই ছয়ব্যক্তি এবং লিফটম্যান নিহত হল।

তাঁর অফিস এসট্যাবলিশমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে খোঁজখবর নিয়ে জানলেন—লিফটম্যান অল্প কিছু দিন আগে কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। কোথাকার লোক কী বৃত্তান্ত কিছুই জানা নেই।

বাসন্তীদেবী। বলতে কোন দ্বিধা নেই—লর্ড ডাফরিণ আর অনারেবল প্রেসিডেণ্ট লিংকন, দুইটি ক্ষেত্রেই প্রাকদৃষ্টি হয়েছিল। সেই অভ্রান্ত ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ডাফরিনের জীবন রক্ষা করেছিল। কিন্তু লিংকনকে পারেনি। তিনি ছিলেন নিজের সম্বন্ধে উদাসীন। থাক সে সব কথা—

লিংকন বা ডাফরিণ কেউ-ই না ছিলেন যোগী, না ছিলেন মিডিয়াম। কখনো যোগ কাল চর্চা করেছেন বলেও জানা নেই। তাহলে দিব্যদৃষ্টি হল কি করে? অধ্যাত্মবাদীরা এবং ক্লেয়ারভয়্যান্স গবেষকরা বলেছেন সাধারণ লোকও খুব অসুস্থ অবস্থায় বা কখনো খুব শোকার্ত হলে এবং কখনো বা একেবারেই

আকস্মিক ভাবে কোন কারণ না থাকলেও প্রাকদৃষ্টিসম্পন্ন হতে পারেন।

ডোজি।

এক মেথডিস্ট পুরোহিতের দশ বছরের ফুটফুটে মেয়ে। অমন ফুলের মত সুন্দর মেয়ে, কিন্তু কি কাল রোগেই যে ধরেছে—মাসখানেক হল মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে। জীবনের কোন আশাই নেই। এখানে বলে রাখা দরকা — এই করুণ মর্মান্তিক কি অলৌকিক ঘটনাটির বিবরণ দিয়েছেন প্রখ্যাত প লোকবিদ Rev. C. Drayton এবং সেটা প্রকাশিত হয়েছিল American Society for Physical Research এর Journal-এ June, 1918-এর সংখ্যায়।

ডোজির বড় ভাই অ্যালির মৃত্যু হয়েছিল সাত মাস আগে। কিন্তু আমাদের মনে হত, অ্যালির স্পিরিট তার কাছে প্রতিদিনই আসত। ডোজিকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে, সে কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবত। চোখের দৃষ্টি হয়ে যেত কেমন সুদূর। অস্ফুটস্বরে বলত— একটু অপেক্ষা কর। অ্যালি আসুক, তাকে জিজ্ঞাসা করে বলব—

তুমি কি সত্যিই অ্যালিকে দেখতে পাও ডোজি?

ও মা! শুধু অ্যালি কেন, আপনাদের কাছে অদৃশ্য পরলোকের এমন অনেক লোককেই আমি দেখতে পাই—কত কথা বলি, হাঁফাতে থাকে ডোজি। রোগজীর্ণ পাণ্ডুর মুখ। কিন্তু আশ্চর্য একটা অপার্থিব আলোর আভায় কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সেই মুখখানা।

জানো, সময়-সময় আমার মনে হয়, আবার খুব—খুব ক্ষীণ অস্ফুট স্বরে যেন অনেক—অনেক দূর থেকে বলল ডোজি, আমি যেন দুইটি লোকেই একসঙ্গে বাস করছি। এই ইহলোক আর মৃত্যুর পরপারের সেই—

কেমন আছ ডোজি? ডোজির স্কুলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেব এলেন। তিনি জীবন-মৃত্যু ইহলোক-পরলোক নিয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎ বলে ফেললেন—Over the dark River (অন্ধকার নদীর পরপারে)

তিনি চলে যাওয়ার পর ডোজি তার বাবার কাছে জিজ্ঞাসা করল কথাটার অর্থ কি বাবা?

বুঝলি না। ইহলোক আর পরলোকের মধ্যে একটা নদীর মত ব্যবধান।

সব ভুল—একেবারে ভুল মিথ্যা কথা। দুহাতে বুক চেপে ধরে কঁকিয়ে বলে উঠল ডোজি—কোন নদী নেই। একটা পর্দা পর্যন্ত নেই। দুটো লোকের মধ্যে একগাছি সুতোর ব্যবধানও নেই—

একদিন ডোজিকে দেখতে এল তাঁর এক শিক্ষিকা। তিনি অনেক—অনেকদিন আগে শিশু অবস্থাতেই দুইটি সন্তান হারিয়েছিলেন। ডোজি তাদের কথা কখনো শোনেনি। তাদের দেখা তো দূরের কথা। তাদের ফটোগ্রাফ পর্যন্ত দেখেনি। কিন্তু—

কি আশ্চর্য সহজ স্বাভাবিকভাবে তার শিক্ষিকাকে বলল, আপনার ছেলেমেয়েদের জন্য কষ্ট করবেন না—মন খারাপ একেবারে করবেন না—ওরা এখানে আছে—দেখতে পাচ্ছি খুব ভাল আছে—এই পর্যন্ত বলে রেভারেন্ড ড্রেটন জানিয়েছেন—ডোজি তার দিব্যদৃষ্টির সাহায্যেই শিক্ষিকার সন্তান দুটোকে দেখতে পেয়েছিল। এইভাবে অ্যালিকেও দেখত।

তাহলে বুঝতেই পারছেন বাসন্তীদেবী—দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে দুর্নীরিক্ষ্য পরলোককে প্রত্যক্ষ করা এবং অনাগত ভবিষ্যতকে দেখতে পাওয়া অর্থাৎ প্রাকদৃষ্টে একটি অতি বাস্তবও প্রমাণিত সত্য। পরলোকবিদ্যার পণ্ডিত এবং অধ্যাত্মবাদীরা আরও বলেছেন প্রাকদৃষ্টির প্রসঙ্গে—দিব্যদৃষ্টির শক্তি সমস্ত মানুষের ভেতরেই সুপ্ত অবস্থায় আছে। শুধু একাগ্র সাধনার দ্বারাই তা প্রকট হতে পারে। আরও স্মরণ রাখতে হবে, ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনাই তো 'Determined' অর্থাৎ নির্ধারিত হয়েই আছে। আর ভবিষ্যতের ঘটনার ছায়াপাত হয়ে থাকে বর্তমানে—Future events Cast their shadows before. কিন্তু কেন?

লেডীবিটারস হেব তাঁর Clairvoyance গ্রন্থে বলেছেন, আমরা জানি স্থূলাতিরিক্ত একটি সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মাতিরিক্ত একটি কারণ জগৎ আছে। কারণ জগতে যে ধরনের কারণ ঘটে, সেই অনুযায়ী সূক্ষ্মজগতে পরিবর্তন হয় এবং পরে স্থূলজগতে সেই কার্য সংঘটিত হয়ে থাকে। কারণ জগতে বর্তমান কারণটা জানতে পারলে স্থূলজগতের ভবিষ্যতের কাজটা জানতে পারা যাবে। মানব মণীষার শুরু থেকে—সোজা কথায় বলা যায় মানুষের জ্ঞানের উন্মেষের পর থেকেই—এই' 'Cause and effect' বা কার্যকারণের সূত্র স্বীকৃত হয়ে এসেছে। কিন্তু—

মনে রাখতে হবে কারণ-জগতে কারণ যাই ঘটুক তার ভবিষ্যৎ কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত। সুনির্দিষ্ট। একেই বৈজ্ঞানিকেরা বলেন 'Determinism'।

লেডীবিটারের এই 'Determinism' প্রসঙ্গেই বলতে হয় আমাদের উপনিষদেও কিন্তু আছে Determinism, যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলছেন—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গী।
সূর্যশ্চন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ॥

অক্ষরপুরুষের প্রশাসনে বা ভয়ে অর্থাৎ তাঁর বিধান অনুসারেই সূর্য, চন্দ্র নিজ নিজ কক্ষে থেকে কিরণ দিচ্ছে, নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বায়ু, ইন্দ্র, যম—প্রত্যেকে নিজের কাজে ব্রতী হয়ে আছে। এতটুকু ব্যতিক্রম হয় না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—দুই ভূখণ্ডেরই দার্শনিক, কবি এবং বৈজ্ঞানিকেরা কার্যকারণের এই অভ্রান্ত এবং অমোঘ নিয়মের অনুশাসন মেনে নিয়েছেন। পারশ্যের মরমী কবি এবং দার্শনিক এবং সেকালের অগ্রগণ্য জ্যোতিষী ও অংকশাস্ত্রের মস্ত পণ্ডিত ওমরখৈয়ামও তাঁর রোবাইতে বলেছেন—

মৃত্তিকাতে তৈরি যেদিন
মূর্তমানব পৃথ্বীতল,
সেই মাটিতেই বীজটি বপন—
ভবিষ্যে যা ধরবে ফল।
সেই সৃজনেব প্রথম উষার
ভাগ্যলিপিব অঙ্কপাত
ফুটবে পুনঃ শেষ বিচারের
প্রলয় উষার জন্মসাত !

এই রোবাইতের মর্মার্থই হল—পৃথিবী যেদিন প্রথম মৃত্তিকাতে তৈরি হল—সেইদিনই সেই প্রথম উষাতেই তার ভবিষ্যতের অঙ্ক অদৃশ্য কালিতে লেখা হয়ে গেল।

ক্লেয়ারভয়্যান্সের গবেষকরা জানিয়েছেন শুধু মিডিয়াম (ভূতাবিষ্ট) এবং যোগীরা ছাড়াও উগ্র অনভূতিসম্পন্ন (Sensitive) এবং আবেগপ্রবণ কিশোর ব। তরুণদের ভেতরেও দিব্যদৃষ্টিব অলৌকিক শক্তির চমকপ্রদ বিকাশ দেখা যায়। তারা অকস্মাৎ অদৃশ্য ভবিষ্যৎ লিপি দেখতে পায়।

কিন্তু বাসন্তীদেবী প্রাকদৃষ্টি কি আকস্মিক ? না। রীতিমত একটা কট্টর বৈজ্ঞানিক যুক্তিও আছে। বিশপ লেডীবিটারসাহেব তাঁর ক্লেয়ারভয়্যান্স গ্রন্থে বলেছেন, আলোর গতি ঘণ্টায় ১,৮৬,০০০ মাইল। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে আট মিনিট। এমন সব নক্ষত্রও আছে যার আলো আসতে একশো কি হাজার বছব এমন কি দশ হাজার বছর পবে দেখতে পাই। তাহলে হাজার বছর আগে নক্ষত্র থেকে নির্গত হয়েছে যে আলো তা আমরা আজ দেখছি—তাই যদি সত্য হয়, এখন অসীম গতিতে আমাদের মনকে সেই নক্ষত্রের দিকে চালিত করি তাহলে হাজার বছর পূর্বে সংঘটিত হয়ে গিয়েছে যে ঘটনা তা আগেই প্রত্যক্ষ করতেও পারি। আরও সহজ করে বলা যায় পার্থিব যে ঘটনার আলো আকাশে বাইরের দিকে ১,৮৬,০০০ মাইল গতিতে ছুটে চলেছে, আমরা আমাদের মনকে যদি অসীম গতিতে উক্ত আলোর দিকে ধাবিত করি তাহলে সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যেতেও পারে—

আছে—আবও একটা অদ্ভুত কিন্তু চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও। কিন্তু তার আগে এই কলকাতা শহরের দু-একটা অলৌকিক ঘটনা বলি। বলাবাহুল্য দিব্যদৃষ্টিরই একটা বড় বিচিত্র কিন্তু খুব করুণ সেই বৃত্তান্ত—

খুব ধুমধাম করেই বিয়ে হয়েছিল। সপ্তপদী হয়েছিল কুশণ্ডিকা হয়েছিল—যাগযজ্ঞ কবে পুরোহিতমশায়, স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ

করেছিলেন।

না। এটি ছিল না কোথাও। তবুও কি যে হল কে জানে বিয়ের পরে তিন মাস যেতে না যেতে তার স্ত্রী মারা গেল। তার মানে রায়সাহেব ব্রজবিহারী রায়চৌধুরীর বড়ছেলে অরুণ। গভীর শোকে ভেঙ্গে পড়ল বাড়ি। রায়সাহেবের স্ত্রী প্রৌঢ়া তরঙ্গিনী ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, ঠাকুর কি পাপে তুমি আমাদের এমন কঠিন শাস্তি দিলে—

ঠাকুর-টাকুর নেই, গর্জে উঠল ব্রজবিহারী, আমার সামনে একদম কাঁদবে না বলে দিচ্ছি—একটু থেমে কয়েকমুহূর্ত কি ভেবে আবার বেশ থেমে থেমে স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করার মত করে বলল, আমি খুব শীগগীরই আবার ছেলের বিয়ে দেব—দেখি তোমার ঠাকুর কি করে আটকায়—

ওরকম কথা মুখেও এনো না গো—কান্নাজড়ানো অস্পষ্ট কণ্ঠে করুণ মিনতি ফুটে উঠল।

ব্রজবিহারী নাস্তিক।

দেবদ্বিজে ভক্তি নেই।

ভক্তি হবে কি করে? বড়লোকের ছেলে। ঐশ্বর্যের ভেতরে বড় হয়েছে। জীবনে কখনো দুঃখ কি দারিদ্র্যের সঙ্গে পরিচয় হয়নি। তাই একটু সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স দেখিয়ে স্টাইল করে ভগবানকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে তো কোন অসুবিধা নেই।

সত্যিই ব্রজবিহারী কয়েকমাস পরেই ছেলের বিয়ে ঠিক করে ফেলল। তার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর মেয়ে। দুই পরিবারের ভেতরে বহুদিনের চেনাশোনা এবং গভীর আত্মীয়তা। অতএব দুই তরফেই খুশির হাওয়া বইতে লাগল। কিন্তু—

একদিন শেষরাতের শিশিরে ভিজে ভিজে ফিকে জ্যোৎস্নায় পরীর মত বাতাসে পা ফেলে ফেলে এল একটি মেয়ে। তার গলায় বেলীফুলের মালা। মুখে চন্দনের লবঙ্গলতিকা। সিঁথিতে সিন্দুরের রেখা। পরণে রক্তবর্ণ বেনারসী। বাতাসে দামী সেন্টের সুগন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে নিঃশব্দে চলে এল তরঙ্গিনীর ঘরে। আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলল, মা—আপনারা এসব কি করছেন—এখনও আমাদের বিয়ের গোড়ের মালা শুকিয়ে যায় নি। এখনো ধুলো বালি জমে মলিন হয়নি আমাদের বিয়ের টোপর—এখুনি আমার স্বামীকে কেড়ে নিচ্ছেন—তীব্র আবেগে তার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে এল। কিন্তু কয়েকমুহূর্ত পরে চোখদুটো মুছে নিয়ে কান্নাটান্না ঝেড়ে ফেলে বলল, খবরদার —ছেলের বিয়ে দেবেন না—ভয়ানক ক্ষতি হবে ওর—বলেই ঘরের গাঢ় অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর বাতাসে বিলীয়মান হয়ে গেল চাপা কান্নার শব্দ।

ঘুম ভেঙ্গে গেল তরঙ্গিনীর।

ঘামে ভিজে উঠেছে তার সারা দেহ। কাঁদতে কাঁদতে এসে সব বলল, ব্রজবিহারীকে। পাশ ফিরে শুয়ে সে বলল, বরাবর দেখেছি তোমার বায়ু খুব চড়া—জবাকুসুম মাখো—

হুহু করে বিয়ের দিন এগিয়ে আসতে লাগল। অদৃষ্ট, বিধাতা ইত্যাদি সব ধোঁয়াটে অস্পষ্ট শক্তিগুলোর ওপরে টেক্কা দেওয়ার জন্যই যেন ব্রজবিহারী বিয়েতে আরো অনেক—অনেক বেশি জাঁকজমক করবে ঠিক করেছে। বিয়ের পনেরদিন আগে নহবত বসবে। পুরো একটা হপ্তা পাড়ার কোন বাড়িতে একবেলাও হাঁড়ি চড়তে দেবে না—এইসব প্ল্যানমাফিক পুরোদমে কাজও চলছে। কিন্তু—

সেই নিদারুণ ব্যস্ততার ভেতরে ব্রজবিহারীর শক্ত, কঠিন কংক্রীটের মনটাও মুহূর্তের জন্যে যেন একটু চিড় খেয়ে গেল—তবু তো কখনো মিথ্যে কথা বলে না। তাহলে কি পরকাল বলে সত্যিই কিছু আছে? আর সেই পরলোক থেকে মৃত মানুষের বিদেহী প্রেতাত্মা কি এসে দেখা দিতে পারে। কিন্তু তারপরেই বিয়ের হাজারো রকমের কাজের ভেতরে ডুবে গেল। আর পরোলোকতত্ত্বটত্ব ইত্যাদি ছাইপাশ কথা অতি সহজেই ভুলেও গেল।

বিয়ের যখন আর ঠিক মাত্র দুইদিন বাকী তখন আবার একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। বোম্বে থেকে ছোট ছেলে বরুণের চিঠি এল। নিয়ে এল ভয়ানক অশুভ একটা ঘটনার আভাস। বরুণ বম্বেতে অ্যাটমিক রিসার্চে কাজ করে। সে লিখেছে বাবা, আপনি জানেন—আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। কখনো মিথ্যা কুসংস্কারকে এতটুকু প্রশ্রয় দেই না। কিন্তু বাবা, এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে যার কোন সায়েণ্টিফিক এক্সপ্ল্যানেশান পাচ্ছি না—

সেদিন মাঝরাতে একটা বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখলাম। দাদা আর বুলাদি (ধীরেশ কাকাবাবুর মেয়ে। আমার ভাবী বৌদি) এবং তাঁর ছোটবোন লীলা ঘোড়ার গাড়ি করে গড়ের মাঠে বেড়াতে বেরিয়েছে। রেসকোর্সের পাশ দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে ঘোড়াদুটো।

সন্ধ্যার ভুসো ভুসো কালির মত অন্ধকারে গড়ের মাঠের গাছগুলোকে এক একটা ভূতের মনে হচ্ছে। সেই অন্ধকার ভেদ করে গাড়ি ছুটছে। হঠাৎ ঘটে গেল সাংঘাতিক দুর্ঘটনা—

উল্টোদিক থেকে একটা হয়ত প্রাইভেট কারের হেডলাইটের আলো গ্রেহাউণ্ডের মত অন্ধকারটাকে তাড়া করতে করতে ছুটে আসতে লাগল।

কোচম্যান—সাবধান, ঘোড়া ভয় পেতে পারে—দাদার এই কথা আর শেষ হল না। হেডলাইটের উগ্র সাদা আলোর ঝলক ঘোড়ার চোখে পড়তেই হঠাৎ ভয় পেয়ে চিৎকার করে সামনের পাদুটো উঁচু করে দাঁড়াল ডানদিকের ঘোড়াটা। পটাস করে লাগাম ছিঁড়ে চলে গেল ঘোড়াটা। গাড়ি উল্টে গড়িয়ে পড়ল পাশের নয়নজলিতে। দাদার ডান হাত ফ্র্যাকশ্চার হয়ে গেল। বুলাদি অজ্ঞান হয়ে গেল। কিছুই হল না লীলার। আমাদের ভাবী বৌদির জ্ঞান ফিরে এল তিনদিন পরে। সামান্য কয়েক মিনিটের জন্যে। ডাক্তার বললেন—সিভিয়ার ইণ্টারন্যাল হেমারেজ—চার দিনের দিন তিনি মারা গেলেন।

বাবা, আমি জানি—আপনি ঈশ্বর পরকাল পাপ-পুণ্য এসব কিছুই

মানেন না। কিন্তু বলতে পারেন এরকম মর্মান্তিক দুঃস্বপ্ন আমি কেন দেখলাম। আমার ভালো বোধ হচ্ছে না। মাস তিনেকের জন্য দাদার বিয়েটা স্থগিত করা কি যায় না?

বাজ পড়ল ব্রজবিহারীর মাথায়। স্ত্রী তরঙ্গিনীর অরুণের প্রথমা স্ত্রীর প্রেতাত্মা দেখা, বরুণের এই স্বপ্ন সব যেন তার মনের ভেতরে তোলপাড় করতে লাগল। পুকুরের শান্ত, নিস্তরঙ্গ জলে একটা ঢিল ফেললে যেমন হয় বৃত্তাকার একটা ঢেউ ক্রমশ বড় হতে হতে জলে মৃদু আলোড়ন তুলে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যায়। কঠোর বাস্তববাদী ব্রজবিহারীর সেই কঠিন হিমশীতল মনের হ্রদে প্রচণ্ড তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। কিন্তু—

কিছুই করা গেল না। মাত্র দুইদিন আগে কি বিয়ে বন্ধ করে দেওয়া যায়? তার অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু কি মনে করবে! বিয়ে হয়ে গেল।

অষ্টমঙ্গলার পর্ব মিটে যেতেই মধুচন্দ্রিকার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। অরুণ বুলাকে নিয়ে দার্জিলিং যাবে ঠিক করল। ম্যালের কাছে জওহরলাল নেহেরু রোডের ওপরে একটা দামী হোটেলও চিঠি লিখে বুক করে ফেলল।

রওনা হওয়ার আগে তারা ব্রজবিহারীকে প্রণাম করতে এল। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই অরুণ একটু অবাক হল। হাতে গড়গড়ার নলটা নিয়ে কেমন স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন বাবা। চোখে শূন্য দৃষ্টি।

কি হয়েছে বাবা আপনার?

বাবা আপনারা কি শরীর খারাপ করছে?

কোন কথাই বলল না ব্রজবিহারী। বলতে পারল না। শুধু হাস্যোচ্ছ্বল আর উদ্দীপ্ত সেই যুগলমূর্তির দিকে তাকিয়ে কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এল। কিছুতেই বলতে পারল না। তার মত মানসিকতার মানুষের পক্ষে কখনই বলা সম্ভব নয়—কিছুক্ষণ আগেই তামাক খেতে খেতে হঠাৎ তার মাথাটা কেমন 'রিল' করে উঠল। চোখের সামনে ঘনিয়ে এল শ্যাওলার মত হাল্কা গুঁড়ি গুঁড়ি অন্ধকার আর তার ভেতর দিয়ে সে দেখল ভয়ানক আর দুঃসহ এবং বীভৎস একটি দৃশ্য—

তাহলে বাবা আমরা কি যাব না?

মাথাটা অসুস্থ মানুষের মত বুকের ওপর ঝুলিয়েই হাত নেড়ে নিষেধ করল ব্রজবিহারী। বহু কষ্টে যেন অনেক—অনেক ব্যথার উজান ঠেলে অস্ফুট ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, যা—বৌমাকে সাবধানে রাখিস—

তারা চলে গেল। ঠিক সাতদিন পর টেলিগ্রাম এল—Accident—Bula expired। কি হয়েছিল!

বাড়িতে বসে ব্রজবিহারী হঠাৎ দিবাস্বপ্নের মত দিব্যদৃষ্টিতে যা প্রত্যক্ষ করেছিল হুবহু তাই ঘটেছিল। টাইগার হিল, ম্যাল, মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, দেশবন্ধুর বাড়ি ইত্যাদি দেখে তারা সেদিন প্রোগ্রাম করেছিল বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাবে।

গোটা বাগানটাই তৈরি হয়েছে পাহাড় কেটে। কোথাও পাহাড়ের ওপরে পাইনবীথি, কোথাও বা গুটিকয়েক পামগাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। ইউক্যালিপটাস, ফার্ন আর হাজারো রকমের গাছগাছালিতে এক অফুরন্ত সবুজের সম্ভার। বুলা দারুণ খুশি। বনহরিনীর মত ছুটে ছুটে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু দেখছে আর অরুণ থেকে থেকে আতংকে চিৎকার করছে—অমন করে ছুটোছুটি করছ কেন—

বলতে বলতেই হঠাৎ শাড়িতে পা বেধে উঁচু পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়তে লাগল বুলা। সেদিকে ছুটে যাওয়ার কোন উপায় নেই। চারিদিকে থেকে রব উঠল—গেল—গেল—গেল—ত্রিশ ফিট নিচে একটা জলে ভরা খাদের ভেতর পাওয়া গেল তার থ্যাতলানো বিকৃত প্রাণহীন দেহটা।

বাসন্তীদেবী লক্ষ্য করুন—রায়সাহেবের স্ত্রী তরঙ্গিনীকে তার মৃত পুত্রবধূ দেখা দিয়েছিল এবং ছেলের বিয়ে দিতে নিষেধ করেছিল। বরুণ স্বপ্ন দেখেছিল দুর্ঘটনায় তার ভাবী বৌদি মারা গিয়েছে। ব্রজবিহারীর সংসারে আসন্ন কোন ভয়ানক অমঙ্গলের আভাস নানাভাবেই পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল কিন্তু—

ব্রজবিহারীর মত কঠিন বস্তুবাদীর কি করে দিব্যদৃষ্টি হল? হয়—হতে পারে। ব্রজবিহারী কেন, তার চেয়েও নাস্তিক এবং পাষণ্ড নিষ্ঠুর মানুষের দিব্যদৃষ্টি হতে পারে। এই প্রসঙ্গেই অধ্যাপক উইলিয়ম ক্রুকস জানিয়েছেন একটি খুব চমকপ্রদ তথ্য—Rational and Scientific basis of the higher mental phenomenon, viz, telepathy and clairvoyance can only be explained by the nature of a pendulum, অর্থাৎ ক্রুকসসাহেব বলতে চাইছেন, মানুষের দুজ্ঞের্য় মনোজগতের অস্বাভাবিক ঘটন দিব্যদৃষ্টি আর চিন্তাচালন অর্থাৎ বিনা সংকেতে চিন্তার আকস্মিক যোগাযোগের যুক্তিসম্মত এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ব্যাখ্যা করা যায় একমাত্র পেণ্ডুলাম বা দোলকের গতিপ্রকৃতি দিয়ে। তারপরেই তিনি নিচের এই চার্টটি লক্ষ্য করতে বলেছেন—কিন্তু গোড়াতেই তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—General rule is pendulam swings double its rate at each step. সাধারণ নিয়মে পেণ্ডুলামের দোলনের গতি এক এক স্টেপে বা বারে দ্বিগুণ হয়ে যায়।

স্টেপ	দোলনের গতিবেগ (এক সেকেণ্ড সময়ে)	গতির অস্বাভাবিক ফলাফল	
১	২	দ্বিগুণ	গতি
২	৪	চারগুণ	গতি
৩	৮	আটগুণ	গতি
৪	১৬	ষোলগুণ	গতি
৫	৩২	বত্রিশগুণ	গতি

ক্রুকসসাহেবের মতে মানুষের চিন্তার ভাইব্রেশানও বা অনুকম্পনের গতিও পেণ্ডুলামের মতই প্রত্যেকটা স্টেপে দ্বিগুণ, দ্বিগুণ থেকে চারগুণ ক্রমশ ডবল এবং তারও বেশি হতে হতে তীব্র হয় এবং তার সঙ্গে কিছু আবেগময় উপাদান মিশে মনের ভেতরে একটা বিক্ষোভের কেন্দ্র অথবা তীব্র একটা গতির কেন্দ্র সৃষ্টি করে। আর সেই কেন্দ্র থেকেই বৃত্তাকারে চিন্তার ঢেউ অথবা ভাইব্রেশান বা কম্পন পেণ্ডুলামের মত উপরোক্ত গতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষুব্ধ সেই চিন্তার প্রবাহ প্রচণ্ড বেগে এসে মনকে আঘাত করে। মন তার সঙ্গে সুর মেলায় বা তার সঙ্গে একটা সমনব্য়সাধন করে এবং তাকে রূপান্তরিত করে সেই অনুভূতিতে বা চিন্তায় যা একেবারে গোড়াতে শুরু হয়েছিল। এবং এই সময়েই সেই দুশ্চিন্তা অত্যন্ত প্রকট হতে হতে ধীরে ধীরে দূরপ্রসারী হয়ে অনাগতকালের কোন দুর্ঘটনার মর্মান্তিক দৃশ্যকে প্রত্যক্ষ করে তুলতে পারে।

রায়সাহেব ব্রজবিহারী যোগী নয়। এমন কি খুব একটা আবেগপ্রবণ কি তীক্ষ্ম অনুভূতিশীল মানুষও নয়। নেহাতই ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট বা বস্তুসর্বস্ব মানুষ। এইরকম লোকের দিব্যদৃষ্টি হওয়াটা খুবই আশ্চর্যের। কিন্তু—

তবুও ছেলে দার্জিলিং রওনা হওয়ার আগেই সেখানে ঘটবে এমন দুর্ঘটনার দৃশ্য সে প্রত্যক্ষ করেছিল। তার কারণ হল—তরঙ্গিনীর কাছে তাঁর মৃত্যু প্রথমা পুত্রবধূর বিদেহী আত্মার আবির্ভাবের ঘটনা তার মনকে আন্দোলিত করেছিল। তারপরেই ছোটছেলের চিঠিতে দুঃস্বপ্নের মর্মস্পর্শী বিবরণ এবং বিয়ে স্থগিত করার ব্যাকুল অনুরোধ তার চিন্তিত আন্দোলিত মনকে প্রচণ্ড বেগে আলোড়িত করে তুলল। সেই দুশ্চিন্তার ঢেউ বা ভাইব্রেশান আরো তীব্র আরো ব্যাপক হয়ে একেবারে প্রসারিত হয়ে গেল অনাগতকালের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে। আর সেখানকার ভয়াবহ দৃশ্যও তার চোখে ছবির মত ভেসে উঠল। তাই—

হয়ত তাই ক্লেয়ারভয়্যান্সের থিয়োরীতে আছে—সময় সময় সাধারণ লোকও দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হতে পারে। আশা করি—টেলিপ্যাথি এবং ক্লেয়ারভয়্যান্স সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করতে পেরেছি বাসন্তীদেবী।

নমস্কারান্তে—

অষ্টম প্রেতমণ্ডল

Soul is the seat of highest mental activities.

—Aristotolie

বুদ্ধি বিবেক নীতি ইত্যাদি উচ্চপর্যায়ের মানসিক কর্মকাণ্ডের উৎস-হল আত্মা—

অ্যারিস্টোটল

....

মহাশয় !

আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে সিয়াম্সের বা প্রেতচক্রের একটা সমিতি তৈরি করেছি। প্রায়ই আমরা ছুটিছাটার দিনে সন্ধের পর কয়েকজন গোল হয়ে বসি। আর পরলোকের বিদেহী আত্মার বা স্পিরিটদের সঙ্গে কমিউনিকেশানের চেষ্টা করে থাকি। আপনাকে বলতে কোন বাধা নেই লজ্জাও নেই—ধুপধুনো জ্বালিয়ে ঘর আধো আধো অন্ধকার করে বেশ ঘটা করে বসি বটে। কিন্তু—

কোন লাভ হয় না। হয়ত এক আধটু খুট করে শব্দ হল অন্ধকার ঘরের কোণে। কিম্বা কারো মাথাটা ভার—খুব ভার হয়ে উঠল। সে মনে করে বসল, স্পিরিট ভর করেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারি—সেসব কিছুই না। ঘরের কোথাও প্রেতাত্মার নামগন্ধ নেই!

দেখ হে বাপু, আমার কাছে সাফসুফ কথা। তোমরা প্রত্যেকে কনফার্মড বেকার। ফ্রাস্ট্রেটেড, আমাদের এইসব স্পিরিচুয়াল অ্যাক্টিভিটির কথা শুনে বেশ ঝাঁঝিয়ে বললেন মাস্টারমশাই অশোক মিত্তির। ভদ্রলোক মার্কসিস্ট। কাটা কাটা কথায় বললেন ভূতপ্রেত এসব ফিউড্যাল অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক যুগের কতগুলো মিথ্যা ও অলীক ধারণা! ভূতটুত ব্রহ্মদৈত্যটৈত্য ইত্যাদি বলেটলে সেকালের রাজা জমিদারেরা গরীবদের শোষণ করত—

স্পিরিট বা আত্মা বলে কি কিছুই নেই স্যার—

আঃ হাঃ তোরা এক একটা হাঁদারাম বুঝলি। আরে ফলের যেমন বীজ মানুষেরও তেমনি হল আত্মা বা self বা বলতে পারিস একেবারে essence অর্থাৎ সারবস্তু, থেমে গেল তুখোর অশোক মিত্তির। কয়েকমুহূর্ত কি ভেবে নিয়ে বেশ ভার ভার গলায় আবার বলল, তোরা তো কেউ কিছু পড়াশুনা করিস না। জানিস পৃথিবীর সবচাইতে পুরানো বনেদী সভ্য জাতি গ্রীক এবং হীব্রুরা সেই কতযুগ আগে বলে গিয়েছে, দেহের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু কখনো কখনো সেটা হ্রস্ব থেকে হ্রস্বতর হতে হতে প্রায় শূন্য এবং ছায়াময় একটা বিন্দুর মত অস্তিত্ব নিয়ে কোথাও টিকে থাকলে থাকতে পারে একটু থেমে আবার বেশ জোর দিয়েই বললেন, সেই ছায়াবিন্দু বা আত্মাকে কখনই কেউ দেখতে পায় নি।

আরও অনেক—অনেক কথাই সেদিন বলেছিলেন মাস্টারমশাই। পার্টি'র—হোলটাইমার। প্রচণ্ড ডগম্যাটিক। তাই সেসব কথা এখানে অবান্তর।

না, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা—এমন বস্তাপচা প্রশ্ন করব না। এই আলোচনা অনেক হয়েছে। আমি জানতে চাই—soul বা আত্মা কি? আর 'প্রেতাত্মা' কথাটির ভেতরে কিন্তু আত্মা শব্দটি আছে। তাহলে কি মনে করা যেতে পারে প্রেতাত্মার···উৎসই আত্মা আরও অনেক—অনেক কথা লিখেছেন মালদহের যুবকদের এক অধ্যাত্মবাদী সমিতির সম্পাদক দিলীপ ব্যানার্জী।

আপনার প্রশ্নটি জটিল এবং সূক্ষ্ম। আত্মা কি—তার সংজ্ঞা কি নিয়ে এত অজস্র পরস্পর বিরোধী মতামত আছে যে সেসব নিয়ে আলাদা একটা বই হতে পারে!

বোধহয় জানেন, পৃথিবীর তাবড় তাবড় পণ্ডিতদের চিন্তার খেই ধরতে হলে শরণাপন্ন হতে হয় এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার। ব্রিটানিকা বলে—Soul is an immaterial thing lying invisible within body অর্থাৎ দেহের ভেতরেই অদৃশ্য হয়ে থাকে এক অশরীরি বস্তু হল—আত্মা। কিন্তু আরও বলেছে এই অদৃশ্য এবং অশরীরি জিনিসটাই হল মানুষের জীবনের আসল উৎস বা প্রাণশক্তি। আর বুদ্ধি চিন্তা, বিবেক, নীতিজ্ঞান ইত্যাদি বেশ উচ্চপর্যায়ের মানসিক কর্মকাণ্ডের ভূমিই হল আত্মা—Seat of the highest mental activities···হয়ত এইজন্যেই 'আত্মা' কথাটির সঙ্গে মন চেতনা স্পিরিট এবং self বা অহং শব্দগুলোর শুধু যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে তা নয়—এই শব্দগুলোর প্রত্যেকটাই 'আত্মারই' প্রতিশব্দ বা সিনোনিম হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেই প্রাচীন যুগ থেকেই।

আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন ভুবনবিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো। বলেছেন—আত্মা হল অত্যন্ত খাঁটি বা pure এবং চিরশাশ্বত এমন একটা উপাদান যার অস্তিত্ব ছিল দেহের অনেক আগেই এবং এই আত্মা মৃত্যুর পর দেহের খাঁচা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর—মুক্ত হয়েই আরও পরিশুদ্ধ হয়ে বায়ুমণ্ডলে বিরাজ করে। আর মানবমনীষার আদিগুরু অ্যারিস্টোটলও বেশ জোর দিয়েই বলেছেন শুধু মানুষ নয়—বিশ্বচরাচরের প্রতিটি প্রাণী এবং উদ্ভিদের প্রাণশক্তিই হল—আত্মা—Soul—substantial form of all living organism···

দিলীপবাবু লক্ষ্য করুন, পৃথিবীর বাঘা বাঘা পণ্ডিত এবং দার্শনিকেরা কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু soul যে একটি বাস্তব সত্য এবং তাকে সময় সময় দেখাও যেতে পারে তার এক চমকপ্রদ সত্যি ঘটনা বলেছেন আত্মা বা সোলের একনিষ্ঠ গবেষক এবং তত্ত্বানুসন্ধানী পরলোকবিদ জর্জ

ওয়েল্ড (George walde) ।

মা আর মেয়ে।

মিস জ্যাকসন ও মিসেস জ্যাকসন। দুইজনের সঙ্গেই আমার যথেষ্ঠ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাই তাদের ঘরের কথা দুজনেই বেশ মন খুলে বলতো।

মিস জ্যাকসন তরুণী। অসামান্য সুন্দরী। আর তারই জীবনে ঘটেছিল এই অলৌকিক ঘটনা। তিনি আমাকে যে বিশদ বিবরণ দিয়েছিলেন তা পুরোপুরি সমর্থন করেছিল তার দুই পুরানোও বিশ্বাসী পরিচারিকা। আর তারাই তো সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তাই তাদের জবানীতেই এবার ঘটনাটা বলি—

সেদিন আকাশের মুখ ছিল ভার। সকাল থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ ঝরছিল। কিন্তু তাহলে কি হবে সেই তুষারের একটানা বৃষ্টি, কনকনে ঠান্ডা বাতাস—সেই দারুণ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া মাথায় নিয়েই বেরিয়ে পড়লেন মিস জ্যাকসন।

বড়লোকের মেয়ে। অবিবাহিতা রূপসী। এদের কোন না কোন উদ্ভট খেয়াল থাকবেই থাকবে। থাকতেই হবে। আমাদের মালিকের হবি হল—লণ্ডনের বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে গরীবদুঃখীদের সেবা করা—কোন একটা ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির অর্গানাইজার কাম সেক্রেটারিরও তিনিই শুনেছি।

সেদিন আমরা করেছিলাম আমাদের কর্তব্য—বার বার নিষেধ করেছিলাম তাঁকে বাইরে যেতে। তিনি শুনলেন না। স্বভাবমত মিষ্টি হেসে বললেন, আমার ভলাণ্টিয়াররা অপেক্ষা করবে অ্যাগনিস না গেলে চলবে না ভাই—

তিনি আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেন বন্ধুর মত। এরকম মনিব ভাগ্য করে পেতে হয়। তাই তো তাঁর জন্য 'ফিল' করি। ঈশ্বর না করুন যদি একটা কিছু হয়ে যায়। তানাহলে আমরা দুজনেই এরকম অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম কেন?

শুনেছি আপনি নাকি মানুষের আত্মা বা সোল নিয়ে স্টাডি করে থাকেন। আপনাকে বলছি ঘটনাটা—যদি কিছু ইণ্টারপ্রিটেশান আপনি করতে পারেন!

বর্ষাতি আর ছাতা নিয়ে গরম ওভারকোট পরে যতদূর সম্ভব 'প্রিকশান' নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মিস জ্যাকসন। বললেন, আমার দেরি হতে পারে তোরা চিন্তা করিস না—

একটানা বরফ ঝরছে তো ঝরছেই। চারিদিকের বাড়িঘর গাছপালা যেন সাদা ধবধবে চাদর মুড়ি দিয়ে এক একটা প্রেতের মত দাঁড়িয়ে আছে তার ওপর আবার থেকে থেকে এক একটা মাথা পাগলা দমকা হাওয়ার ঝড়ে বরফের কুচি উড়ে এসে নাকে মুখে সূঁচের মত বিঁধছে। মিস জ্যাকসনের হাত পায়ের আঙ্গুলের ডগাগুলো সিটিয়ে-গিয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন। অসম্ভব এই ওয়েদারে কাজ করা যেতে পারে না। এখুনি—এই মুহূর্তে বাড়িতে ফিরে গিয়ে রান্নাঘরের স্টোভে হাত-পাগুলো সেঁকে নিতে হবে—

আমরা তাঁর অপেক্ষায় দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দরজার নব ঘুরে গেল। মিস জ্যাকসন এলেন। আর সোজা তরতর করে ওপরে উঠে গিয়ে রান্নাঘরের স্টোভে হাতদুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেঁকতে লাগলেন। হঠাৎ তাদের চোখের দৃষ্টি চমকে উঠল।

কী ব্যাপার?

মিস জ্যাকসনের হাতে চকচকে সবুজ দুটো গ্লাভস। আশ্চর্য ঘন সবুজ রঙের দস্তানায় তাঁর মোমের মত হাতদুটো মনোরম হয়ে উঠেছে। কিন্তু উনি তো কালোরঙের গ্লাভস পরে থাকেন। আর এসব জিনিস তো আমরাই ঠিকঠাক করে এগিয়ে দিয়ে থাকি। সবুজ গ্লাভস দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। কিন্তু যেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে গেলাম অমনি তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আমরা দারুণ ভয় পেয়ে ছুটে নেমে এসে মিসেস জ্যাকসনকে আগাগোড়া ব্যাপারটা বলতেই তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, সব তোদের চোখের ভুল। আর আমার মেয়ে কখনো সবুজ কালারের গ্লাভস পরেই না—

এইসব ঘটনার ঠিক আধঘণ্টা পরে আবার মেন গেটের দরজার 'নব' বাঁদিকে মোচড় খেল। মিস জ্যাকসন প্রচণ্ড শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ভেতরে এলেন। ছোট ছোট বরফের টুকরো মাখানো বর্ষাতিটা আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েই সোজা একসঙ্গে দু'তিনটি সিঁড়ি টপকে ওপরে রান্নাঘরে গিয়ে স্টোভে নিজের হাতদুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেঁকতে শুরু করলেন। হাতে সবুজ গ্লাভস। হয়ত হাতের কাছে কালো না পেয়ে সবুজ দস্তানাই পরেছিলেন।

১৮৮২ সালের 'লাইট' পত্রিকায় এই আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে দীর্ঘদিন গবেষণা করে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন ডক্টর জর্জ ওয়েল্ড এখানে তা সংক্ষেপে বলা হল—

মিস জ্যাকসন বাইরে শীতে প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছিলেন। ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছিলেন। আর তখুনি একবার—মাত্র একবার কি এক মুহূর্তের জন্য ভেবেছিলেন—বাড়িতে ফিরে স্টোভে হাত-পা সেঁকবেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তেই তাঁর সংকল্পটাই মূর্তি পরিগ্রহ করে তাঁর বাড়িতেই চলে গিয়েছিল। পরিচারিকারা তার স্পিরিটকেই দেখেছিল প্রথমবার। তাদের দেখা দেওয়াটা স্পিরিটের কাম্য ছিল না। কিন্তু তাঁর আবছায়া মূর্তির ভেতরে উজ্জ্বল সবুজ দস্তানাটার জন্যেই তারা মিস জ্যাকসনকে চিনতে পেরেছিল। কিন্তু—

স্পিরিটের তীব্র ইচ্ছার প্রতিচ্ছবি কি দেখা যেতে পারে; আর সেই ছবি কি তার ঈপ্সিত জায়গায় প্রতিফলিত হতে পারে? যদি পারে তাহলে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি? অনেক প্রশ্ন—অনেক কৌতূহল স্বভাবতই মনে ভিড় করে আসে।

তাহলে আবার 'Soul' সম্বন্ধে একটু বলতে হয়। পৃথিবীর অনেক যুগের প্রাচীন সভ্যজাতির মানুষের বিশ্বাস ছিল—মানুষের আত্মা একটি নয়—একাধিক। তার একটি আত্মা থাকে হৃদপিণ্ডে, আর একটি থাকে রক্তে, আর একটি যকৃতে বা দেহের যে কোন অংশে। শুধু তাই নয়—এইখানেই বলে রাখা দরকার, পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষেরই ধারণা ছিল—মানুষের ভেতরে থাকে একটি মাঝারি প্রকৃতির আত্মা—সেটাই মৃত্যুর পরে সাবেক জায়গায় ঘোরাফেরা করে। জীবিত মানুষের দেহে কখনো সখনো ভরও করতে পারে। আর একটি পবিশুদ্ধ আত্মা সোজা স্বর্গে চলে যায়। এইসব বিশ্বাস আর ধ্যানধারণা থেকেই প্রেতাত্মা বা ভূতের সৃষ্টি হয়েছে—

এই পর্যন্ত বলেই ওয়েল্ডসাহেব বেশ জোর দিয়েই বলেছেন—আত্মা প্রেতাত্মা হোক কি ভূত হোক, যাইহোক মনে রাখতে হবে যে কোন আত্মা থেকেই চিন্তার জন্ম হতে পারে। আর সেই উগ্র চিন্তা থেকে তার একটি প্রতিচ্ছবিও তৈরি হতে পারে। তাকে আপনারা Etheric body বলতে পারেন, বলতে পারেন প্রেতাত্মা—আরও অনেক আখ্যাই দিতে পারেন।

মানবদেহের এই আত্মা—এই soul এর কর্মকাণ্ড যে কি বিচিত্র সেই প্রসঙ্গেই জানিয়েছেন তিনি—আধুনিক পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মে আত্মার সম্বন্ধে কনসেপশানটাও বা ধারণাটাও একবার সরভে করলে দেখা যায়—ইসলাম ধর্মে বলে, প্রতিটি মানুষের ভেতরে অনেক—অনেকগুলি আত্মা নিয়ে থাকে একটি খুব জ্ঞানী এবং বিবেচক আত্মা। এই আত্মারই নির্দেশে অন্যান্য soul তাদের যার যার কাজ করে যায়। পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতি ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের দৃঢ় বিশ্বাস—মানব দেহে শুধু যে আত্মার অস্তিত্ব আছে—তা নয়, মানুষের মৃত্যুর পর সেই আত্মা পুনর্জীবিত হয় যেমন যীশুখ্রীষ্টের Ressurection বা পুনরুত্থান হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হল, মিস স্যাকসনের কোন ধরনের আত্মা থেকে তার স্পিরিটের ছায়ামূর্তি তৈরি হয়েছিল? এই Soul এর আলোচনা পরে করছি। আপাতত আমার মনে হয়, অস্বাভাবিক শীত, একটানা তুষারের ঝড়ে বৃষ্টিতে তিনি যখন বিপর্যস্ত তখুনি তার চিন্তাক্লিষ্ট ও যন্ত্রণাকাতর মনের ভেতরে ভেসে উঠেছিল—তার বাড়ির রান্নাঘরের স্টোভের আগুনে উওপ্ত করোঞ্চ মধুর পরিবেশ। তখুনি সবুজ দস্তানা পরে আগুনে হাত সেঁকার চিন্তাতেই যে টেলিপ্যাথি তৈরি হয়েছিল, সেই টেলিপ্যাথির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল তার ছায়ামূর্তি।

আর একটা ব্যাখ্যা হল, এই অলৌকিক ঘটনাটি পরিষ্কার একটা phantasm (ফ্যাণ্টাজম) বা অপচ্ছায়া। ফ্যাণ্টাজমে সাধারণত যে মুহূর্তে চিন্তা করছে, যেসব চিন্তা করছে তার ছবি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আর মনোবিজ্ঞানীরাও বলে থাকেন তীব্র ও আকুল চিন্তা থেকে যে মূর্তি তৈরি হয়, তা দূরে (যে জায়গাকে নিয়ে ভাবছে) প্রতিফলিত হতে পারে। তাকে বলে optical

projection—এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছেন পরলোকবিদ এবং আত্মার তত্ত্ববিশেষজ্ঞ জর্জ ওয়েল্ড।

তারপরে শুধু জানিয়েছেন মানুষের কোন রকমের soul থেকে ছায়াদেহ তৈরি হতে পারে জানতে হলে বলতে হয় লণ্ডনের হাউস অফ কমনসের কেয়ারটেকারের স্ত্রী মিসেস মিলম্যানের জীবনেরও সেই আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনাটি—

হাউস অফ কমনসের বিল্ডিং-এর বড় উঠোনটির ঠিক মুখোমুখি যে স্যুটটা (একসঙ্গে কয়েকজন থাকার মত বড় ঘর) তাতে না কি ভূত আছে। অমন সুন্দর স্যুট—কিন্তু ঘোস্টহণ্টেড। প্রেত অধ্যুষিত। কমনসের মেম্বররা কেউ সেদিকের ছায়াও মাড়ায় না। দিনের বেলাতেও কেউ সে-ঘরে যায় না।

কিন্তু কার স্পিরিট—কেনই বা এখানে আনাগোনা করে—সেসব কেউ বলতে পারে না। শুধু তাই নয়। সেই প্রেতাত্মাকে কেউ কখনো ঘর ছেড়ে লবিতে আসতেও দেখেনি। কেউ বলে পিছনের ঘোরানো সিঁড়ির বাঁকে না কি তাকে একবার একপলকের জন্য দেখা গিয়েছিল আবার কেউ বলে প্রায়ই দোতালার অন্ধকার করিডোরের পিলারটার পাশে তার ছায়াদেহ দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়—

ব্রিটিশ হাউস অফ কমনসের মেম্বাররা এক একজন বাঘা পলিটিশিয়ান হলে কি হয়, তারাও অস্বস্তিবোধ করে। ভয় পায়। কিন্তু কার প্রেতাত্মা, কেন সেই স্যুটটাতেই ঘুরঘুর করে সেই রহস্যের কিনারা কেউ করতে পারে না। কিন্তু—

একদিন হঠাৎই একেবারে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল সব। সেদিনটা ছিল ৩রা জানুয়ারী, ১৮৯৯ সাল।

সকাল সাড়ে আটটা নয়টা হবে। চারিদিকে ঘন কুয়াশা। রাস্তায় লোক চলাচল খুব কম। কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে ভূতের মতই দাঁড়িয়ে আছে কমন্সের বাড়িটা।

আমি—ভূত দেখেছি—ভূত—ভূত—হঠাৎ সেই ঘোরানো সিঁড়ির দিক থেকে একটা করুণ আর্তনাদ ভেসে এল। নিস্তব্ধ সেই বিশাল বাড়িটা যেন শিউরে উঠল। লোকজন ছুটে এসে দেখল—মিসেস ম্যাকলিনের ভিজিটার। লণ্ডনের বিখ্যাত বাইণ্ডার বুক্স অ্যাণ্ড বুকসের ছোকরা এক কর্মী। তার মুখ ভয়ে ছাইয়ের মত সাদা। সে তখনো একটা ঘোরের ভেতর থেকে শুধু বিড় বিড় করে বলল, মিসেস ম্যাকলিনকে এই মাত্র ঘরে দেখে এলাম—তিনি সিঁড়িতে এলেনকি করে?

মিসেস ম্যাকলিন। হাউস অফ কমনসের কেয়ারটেকার ঝানু অফিসার আর্চিবল্ড ম্যাকলিনের তরুণী স্ত্রী। তিনি নিজেই তাঁর নিজের প্রেতাত্মার কথা বলে এক অদ্ভুত বিবৃতি দিলেন সাংবাদিকদের কাছে—

"আপনারা কি বিশ্বাস করবেন, কি বলব, আমারই স্পিরিট আমাকে

মাসের পর মাস হণ্ট করছে—তাড়া করে বেড়াচ্ছে। বাজারে, রাস্তায়, পোষ্ট অফিসে রেষ্টুরেণ্টে নাকি লোকে আমাকে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু যখন দেখছে তখন আমি সেখানে আদৌ যাই-ই-নি। আমি রইলাম বাড়িতে। লোকে আমাকে দেখছে বাজারে কি আর কোথাও। কি যন্ত্রণা বলুন তো। বলব কি এমনও হয়েছে, হয়ত বইয়ের দোকানে গিয়েছি। বই দেখছি—কোনটা নেব ভাবছি। কিন্তু তাকিয়ে দেখি সেলসম্যান কেমন করে যেন তাকাচ্ছে আমার দিকে। বলল, ম্যাডাম—আপনি খানিক আগেই বই কিনে নিয়ে গেলেন না ?

একটু থেমে একটা ভারি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব—

তাঁর সঙ্গে কথায় কথায় জানা গেল তাঁর অনেকরকম হবির ভেতরে একটা হল—বাড়িতে বসে বই বাঁধানো। এই সূত্রেই বুকস অ্যাণ্ড বুকস দপ্তরীর লোকজন তাঁর কাছে যাতায়াত করে থাকে।

দিলীপবাবু! ওয়েল্ডসাহেব জানিয়েছেন এই ঘটনাটির শুধু বিবরণ নয়, রীতিমত সায়েণ্টিকফিক এক্সপ্ল্যানেশান বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ফ্রান্সের বিখ্যাত সাময়িকপত্র লে টেমপসে প্রখ্যাত পরলোকবিদ ডক্টর ফ্ল্যামারিয়ণ—

একই লোকের দ্বৈত্য আকৃতি বা Double version-এর কারণ—জানা গিয়েছে মিসেস ম্যাকলিনের দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। ম্যাকলিনসাহেব হয়ত খুব বেশি কাজ পাগলা এবং স্ত্রীর দিকে যথেষ্ঠ মনযোগ দিতে পারত না। এছাড়া আরো কিছু কারণ থাকতে পারে। এদিকে মিসেস ম্যাকলিন অপরূপ সুন্দরী। যেমন সাংঘাতিক এমোশানাল, সব সময় তীব্র আবেগে যেন ভাসছে তেমনি 'সেনসিটিভ'। আর তার এইসব স্বভাবই তাকে করে তুলেছিল এক্সসেণ্ট্রিক। এই ছিটগ্রস্ত বা মাথাপাগলা টাইপের লোকদের মন প্রায় সবসময় কোন না কোন তীব্র দুশ্চিন্তা কি উদ্বেগে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। আর তার ফলে যখুনি চিন্তার ইণ্টেনসিটি বাড়ে তখুনি তাদের বাসনাময় আত্মা (Desired Soul) জড় দেহের সঙ্গে যুক্ত physical plane থেকে সূক্ষ্মলোকে বা Astral plane-এ চলে যায়। তখুনি সূক্ষ্মলোকে তাদের ছায়াশরীরের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। বলা দরকার, মানুষের আত্মা সাধারণত দুইরকমের—Material soul—জড়দেহের আত্মা এবং Desired soul.

তারপরেই জর্জ ওয়েল্ড আবার বলেছেন ডক্টর ফ্ল্যামারিয়ণের এই সিদ্ধান্তটির সমর্থনও পাওয়া যায় আর এক প্রেততত্ত্ববিদ এবং আত্মা বিশেষজ্ঞ ডক্টর কাণ্টের এই উক্তিতে—আমাদের স্মরণ রাখা উচিত মানুষের আত্মা একই সঙ্গে একই কালে বর্তমান জীবনেই দুইটি লোকের সঙ্গে যুক্ত—We should remember that human soul as being joined in present with two worlds at a time…

দিলীপবাবু! এরপরে আত্মা বা soul কি এ সম্বন্ধে আমার মত সামান্য মানুষ আর কি বলতে পারে? আত্মার আলোচনা করতে করতেই মনে পড়ে গেল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁর এক শিষ্যকে বলেছিলেন, "জানো, ঠিক আমারই মত দেখতে এক যুবক সন্ন্যাসী মূর্তি যখন তখন বেরিয়ে আসত। নানা বিষয়ে উপদেশ দিত। সে ঐরূপে বাইরে এলে কখনো আমার সামান্য বাহ্যজ্ঞান থাকত কখনো-বা জড়বৎ পড়ে থেকে তারই চেষ্টায় সকল দেখতে পেতুম তারই কথা শুনতে পেতুম।"

আরও একটি সত্য ঘটনা বলি—

১৯০১ সাল। মে মাস। গুরুদেব বসে আছেন। চারিদিকে গোল হয়ে বসে রয়েছে তাঁর শিষ্যরা। গুরুর মুখে আশ্চর্য একটা জ্যোতি। দুটো বড় বড় চোখে কেমন গম্ভীর প্রশান্ত দৃষ্টি। শিষ্যরা মুগ্ধ আর অপলক চোখে তাকিয়ে তাঁর দিকে।

শিষ্য। গুরুদেব আপনার মুখে ক্লান্তির ছাপ দেখছি। (একটু থেমে) খুলনা চট্টগ্রাম ঘুরে এলেন—এবার কিছুদিন বিশ্রাম—

গুরু। বিশ্রাম! তুই জানিস না মা-কালী আমার এই দেহের ভেতরে ঢুকে গিয়েছে রে—সেইটে আমাকে ওদিকে কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়—

শিষ্য। এই শক্তিপ্রবেশের কথাটা কি রূপকচ্ছলে বলছেন?

গুরু। না রে না—ঠাকুরের দেহ যাবার তিন চারদিন আগে আমাকে তিনি একাকী কাছে ডেকে পাঠালেন। আর সামনে বসিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তখন অনুভব করতে লাগলুম তাঁর শরীর থেকে একটা সূক্ষ্ম তেজ Electric-shock (তাড়িৎ কম্পন) এর মত আমার শরীরে ঢুকছে। আমি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে আড়ষ্ঠ হয়ে গেলুম। কতক্ষণ এরূপভাবে ছিলুম কিছু মনে পড়ে না? যখন বাহ্যচেতনা হল—দেখি ঠাকুর কাঁদছেন। জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর সস্নেহে বললেন, আজ যথাসর্বস্ব দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করে ফিরে যাবি—

হয়ত অনুমান করছেন এই গুরুদেবটি হলেন—স্বামী বিবেকানন্দ আর তাঁর ঠাকুর—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। হয়ত বলা যেতে পারে, শিষ্য নরেণের ভেতরে শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে—ঠাকুরের সেই তীব্র ইচ্ছাশক্তিই তাঁর আত্মা অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিতে রূপান্তরিত হয়ে বিদ্যুত তরঙ্গের মত সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল নরেণের দেহে।

না। এই ব্যাখ্যা কোথাও নেই। মহাপুরুষদের এইসব অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কারণ সেরে দেওয়া হয়েছে একটি—একটি মাত্র ছোট্ট কথায়—

বিভূতি!

এসব হল সাধক যোগীদের 'বিভূতি'। কিন্তু বিভূতির জন্ম হয় কোথায় থেকে? তার কোনো উত্তর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

যেমন পাইনি আজও আমাদেরই পরিবারের সেই আশ্চর্য ঘটনার কোন ব্যাখ্যা। ভাই দিলীপবাবু, আমার অপরাধ নেবেন না, আমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ একটু বলতেই হচ্ছে।

আমার প্রপিতামহ রত্নকান্ত ছিলেন সাধক যোগী ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি তার নাকি সমাধি হয়েছিল ধ্যানের আসনে-ই। আর তাঁর ধ্যানস্থ মূর্তির চারিদিকে আগুন জ্বলছিল। তখন তেমন কিছু বুঝতাম না। পরে পরিণত বয়সে কর্ণেল ইলিয়ট, ফ্লামেরিয়ণ ইত্যাদি সাহেবদের লেখা প্রেততত্ত্বের বই পড়তে পড়তে আমাদের ফ্যামিলির অলৌকিক ঘটনাটি নিয়ে খোঁজখবর করতে শুরু করলাম। শুনলাম সেই ঘটনার এক 'আইডইটনেস' এখনও আছেন আমার সম্পর্কে এক পিসীমা। নব্বই ছুঁই ছুঁই বৃদ্ধা থাকেন বালুরঘাট টাউন থেকে বারো মাইল দূরে এক গণ্ডগ্রাম পোড়ামাথলে। সাইকেল ঠেলে গেলাম তাঁর কাছে।

বৃদ্ধা কানে কম শোনে। চোখে দেখে না। বহুকষ্টে নিজের পরিচয় সাতকাহন বলে তাঁকে চিনিয়ে যেই আমার কথাটা পাড়লাম। অমনি পিসীমা যেন একেবারে চনমন করে উঠল। আর বুড়ির জটপাকানো গুলীসুতোর রেখা আঁকা মুখের ভাঁজে ভাঁজে সাবেকদিনের স্মৃতির ঝিলিমিলি ফুটে উঠল। খলবল করে এলোপাথাড়ি যেসব কথা বলেছিল তার সারাংশ হল—

আত্মীয় পোষ্য নিয়ে রত্নকান্তের ছিল বিশাল পরিবার। একদিন বাড়ির সবাইকে ডেকে পাঠালেন তাঁর পুজোর ঘরে। আর অদ্ভুত একটা ঘোষণা করলেন। বললেন, দেখ, সামনের পূর্ণিমার রাত্রে আকাশে ফুটফুট করবে জোৎস্না, চারিদিক দিনমানের মত মনে হবে, তখন উঠোনে দেখতে পাবে আমার ছায়ামূর্তি। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি ধ্যানে বসে দেহ রাখব—

আশ্চর্য ব্যাপার বাবু, পিসীমা বলেছিল পুন্নিমের চাঁদ উঠেছিল। চাদ্দিক একেরে থৈ থৈ করছিল জোছনার আলো। আমরা সব বৌ বেটিরা বারান্দাত আঁধারোত চুপটি করে বসে আছি দেখি কি উঠানোত গোরো ফটফট অত্নকান্তের আবছা মূর্তিটা ঘুরবুর করছে—এই পর্যন্ত বলেই হাঁফিয়ে উঠেছিল বৃদ্ধা। বড় বড় নিশ্বাস ফেলেছিল। পুরানোদিনের স্মৃতি তাকে দাবড়াচ্ছিল। অনেক-অনেক কথাই বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু পারছিল না। কিম্বা যোগীপুরুষ রত্নাকান্তের আরো অনেক অদ্ভুত ঘটনার সঙ্গে তাল গোল পাকিয়ে ফেলেছিল। আমি খেই ধরিয়ে দিলাম—

তারপর কি হল?

—কি—কি করছো—কানে হাত দিয়ে চিৎকার করে উঠল বৃদ্ধা।

—ওই যে উঠোনে রত্নাকান্তের ছায়ামূর্তিটা দেখলেন।

তারপরে—

ও: বুড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল মুখে। দুহাতে বুক চেপে ধরে বলল, আমরা সব ছুটি গেনু পুজোর ঘরে। গিয়ে দেখি কি ধ্যান করছেন। কিন্তুক তার আসনের চান্দিকে বাপু লকলক করছে আগুনের শিখা। হৈ হৈ করি বাড়ির মরদরা আগুন—আগুন, বলি ছুটি আল। অন্নকান্তের গায়ে হাত দিতেই টলে পড়ে গেলেন। গা—টা হিম ঠান্ডা—থামল পিসীমা। আবার অস্ফুট ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছিল—আমরা যখন উঠানে তাকে দেখেছিলাম—তখুনি পাণটা (প্রাণ) বেরিয়ে গিয়েছিল—

দিলীপবাবু, কেন,—কেমন করে মৃত্যুর আগেই রত্নকান্তের স্পিরিটকে উঠোনে দেখা গিয়েছিল, কেন তাঁর ধ্যানের আসনের চারিদিকে আগুনের আভা দেখা গিয়েছিল—এসবের কোন কারণ আজও পাইনি। কোন অলৌকিক ঘটনারই কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না দিলীপবাবু! অলৌকিক—অলৌকিক সেটাই শেষ কথা। কিন্তু—

মানুষের সভ্যতার একেবারে গোড়া থেকে আত্মা বা Soul নিয়ে, স্পিরিটকে কেন্দ্র করে কত গবেষণা, কত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। দেশী বিদেশী পরলোকবিদ অধ্যাত্মবাদীরা বলেছেন মানুষের স্থূলদেহের সঙ্গে থাকে আর একটি সূক্ষ্মদেহ (Etheric body) বা প্রাণময় দেহ। থিয়সফির ভাষায় একে বলে Etheric Double. মৃত্যুর অনেক আগে-ই না কি ইথারিক বডি জড় দেহ থেকে বেরিয়ে চলে যায়—আরও কত জটিল তথ্য কত থিয়োরী নিয়ে রাশি রাশি বই লিখেছেন তাঁরা। কিন্তু সেসব তথ্যের কোন প্রামাণিক ভিত্তি আছে বলে এখনও জানা যায়নি। তাই—

সবশেষে বলতে হয় সেই ওয়েল্ডসাহেবের কথা—এক্সরে বা রঞ্জন রশ্মি দিয়ে জামা কাপড়ে মোড়া দেহের ভেতরের কলকব্জা সব কেন দেখা যায় তা বৈজ্ঞানিকরা বিশদ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তেমনি হয়ত এইসব Miracle বা অলৌকিক ঘটনার কারণ একদিন বলতে পারবেন অনাগত কালের বিজ্ঞানীরা।

———